মুকুল

—বৈশাখ, ১৩৩৭—

বালকবালিকাদের সচিত্র মাসিকপ

শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী বি-এ, কর্ত্তৃক

সম্পাদিত

মুকুলের লেখক-লেখিকাগণ

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, শ্রী

[illegible] দেবী, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু, রায় বাহাদুর জলধর

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

[illegible]কুমার মিত্র, ডাঃ বনোয়ারীলাল চৌধুরী প্রমুখ।

— বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র —

—ঠিকানা—

২৯৪নং দর্গা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা

বিষয়-সূচী

বৈশাখ—১৩৩৭

মুকুলের নিয়মাবলী

১। মুকুল বাংলা মাসের ৭ই তারিখে বাহির হয়।

২। মুকুলের বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। ভি-পিতে দুই টাকা চারি আনা। প্রতি সংখ্যা তিন আনা। বৎসরের মধ্যে যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু বৈশাখ মাস হইতেই কাগজ লইতে হইবে।

৩। ছেলে-মেয়েদের লেখা মুকুলে বাহির হইবে। লেখা মনোনীত না হইলে তাহা ফেরত দেওয়ার জন্য ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। ধাঁধাঁর সঙ্গে উত্তর লিখিয়া না দিলে তাহা প্রকাশিত হয় না।

৪। পত্র লিখিলে বিজ্ঞাপনের হার জানান হয়।

পুরাতন গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

বৈশাখ মাসের মধ্যে মুকুলের বার্ষিক মূল্য না পাইলে, জ্যৈষ্ঠ মাসের কাগজ ভি-পিতে প্রেরিত হইবে। ভি-পি ডাকে ২।০ আনা পড়িবে। সত্বর নীচের ঠিকানায় গ্রাহক-নম্বর লিখিয়া মূল্য পাঠাইয়া দিন।

মুকুল কার্য্যালয়—২৯৪নং দর্গা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা

হলায়ুধ

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

মুকুলের বিষয়-সূচী

(১৩৩৭)

(বর্ণমালা অনুসারে)

৩য় বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৩৭ [১ম সংখ্যা

নব বর্ষ

১

মাগো বিশ্ব-জননী!
নূতন বর্ষে, নবীন হর্ষে,
আমরা বোন ভাই;
এসেছি আজি, নূতন সাজি,
নূতন হতে চাই।

২

আজি জননী! স্নেহ-রূপিণী
কর মা, আশীর্ব্বাদ;
করি যে ভিক্ষা—নূতন শিক্ষা;
পুরাও মনোসাধ।

৩

উদ্যম নব, সন্তানে তব,
দাও নূতন শক্তি;
লও মা, সাথে, ধরিয়ে হাতে,
দাও তোমাতে ভক্তি।

৪

বাসিব ভালো, জীবন আলো—
—মহত্ত্বের আশ্রয়,
সাধুর প্রাণ, কর মা, দান,
হোক, তোমারি জয়।

শ্রীনগেন্দ্রবালা রায়

বৈশাখ মাস

সত্যপ্রিয়া মৈত্র এম,এ, কলিকাতার কোন কলেজের শিক্ষয়িত্রী। বৈশাখ মাসে কলেজ বন্ধ হওয়াতে তিনি তাঁহার পুত্র বুদ্ধ ও কন্যা করুণাকে লইয়া তাঁহার পল্লী-ভবনে দেবগ্রামে গমন করিয়াছিলেন। আট বৎসর হইল সত্যপ্রিয়া দেবী বিধবা হইয়াছেন। বুদ্ধের বয়স কুড়ি বৎসর, সে এম-এস্-সি পড়িতেছে। করুণার বয়স চৌদ্দ, সে কলিকাতার এক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

সত্যপ্রিয়া দেবগ্রামে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, গ্রামের এক বউ ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে পড়ান। সত্যপ্রিয়ার অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট ঐ বিদ্যালয়ের মাসিক সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। সত্যপ্রিয়া প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাইয়া ছাত্রীদিগের সহিত নানা বিষয়ে কথা কহেন। চন্দ্র, তারা, গাছ-গাছড়া, নদী, পর্ব্বত পৃথিবীর নানা দেশের লোকের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে এমন মনোহর গল্প করেন, যে তাহাদের মনে আরও জানিবার জন্য আগ্রহ জন্মে।

মা, বুদ্ধ ও করুণাকে সৎকাজে দান করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে যে পয়সা দিতেন, তাহারা তদ্দারা ছবির পুস্তক, খেলানা, ইত্যাদি কলিকাতা হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত ও বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে পুরস্কার দিত। তাহারা ছাত্রীদের সহিত মিশিয়া কলিকাতার ভাল ভাল গল্প করিত। ছাত্রীরা তাহাদিগকে বড় ভালবাসিত। তাহাদের মত লেখা পড়া শিখিতে ও ভাল হইতে ব্যাকুল হইত।

সত্যপ্রিয়া বৈশাখ মাসে বাড়ী যাইবার সময় সম্বৎসরের সমস্ত পুরাতন শাড়ী, ধুতি, ছেলে-মেয়ের ছোট শার্ট, পাজামা, ধোলাই করিয়া লইয়া আসিতেন ও দেবগ্রামের গরীব-দুঃখী বালক-বালিকা ও স্ত্রী-পুরুষদিগকে দান করিতেন। বুদ্ধ ও করুণা দেবগ্রামে গিয়া সকলকে বস্ত্র দান করিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিত।

বৈশাখ মাসে গ্রামের পুষ্করিণী ও কূপ শুকাইয়া যাইত। স্ত্রীলোকেরা ২।৩ মাইল দূর হইতে জল আনিয়া গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। বুদ্ধ ও করুণা তাহাদের মনকষ্ট দেখিয়া কলসী লইয়া জল আনিতে যাইত এবং যাহারা জল আনিতে পারিত না তাহাদের সেই জল দিত। সত্যপ্রিয়া নারীদের ক্লেশ দেখিয়া গ্রামে একটী পুষ্করিণী ও দুইটী কূপ খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। যে দিন কূপ ও পুষ্করিণী হইতে জলের প্রস্রবণ বহির্গত হইয়াছিল সে দিন বুদ্ধ ও করুণার অপরিসীম আনন্দ হইয়াছিল।

গ্রামে কতকগুলি বট-অশ্বত্থ গাছ ছিল। তাহার ছায়ায় পথিক ও পশুগণ বিশ্রাম করিত ও গ্রামস্থ বালকবালিকারা খেলা করিত। বৈশাখ মাসের উত্তাপে গাছগুলি শুকাইয়া যাইতেছিল। সত্যপ্রিয়া গাছের মূলে হাঁড়ি বাঁধিয়া জলের ঝরণা দিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ও করুণা প্রতিদিন সেই সকল হাঁড়ি জলে পূর্ণ করিয়া দিত। পাড়ার বালকবালিকারাও এই কার্য্যে তাহাদের সঙ্গী হইয়াছিল।

পথিকেরা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া গাছের তলায়

পড়িয়া থাকিত। বুদ্ধ ও করুণা মাকে বলিল, "ইহাদের জন্য পথের ধারে ঠাণ্ডা জল রাখিয়া দিলে কেমন হয়?" মা আনন্দের সহিত বলিলেন, "তোমরা প্রতিদিন কলসী করিয়া কূয়ার ঠাণ্ডা জল ও ছোলাভিজা এবং গুড় গাছ তলায় লইয়া যাইও, সকলকে তাহা দিও।" তাহারা পাড়ার বালকবালিকাদিগকে লইয়া প্রতিদিন তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান করিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিত।

সত্যপ্রিয়া ও তাঁহার পুত্র-কন্যা সুন্দর গান করিতে পারিতেন। তাঁহারা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত করিতেন। পল্লীর নারীগণ তাহা শুনিয়া বলিতেন, "দুঃখীর চক্ষের জল থামিয়া যাইতেছে, শোকার্ত্তের প্রাণের আগুন নিবিয়া যাইতেছে, ভগবানকে ডাকিয়া হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইতেছে, দেবগ্রাম শান্তিভূমি হইয়াছে।"

পাড়ার স্ত্রীলোকগণ সত্যপ্রিয়াকে আদর্শ নারী এবং বালকবালিকাগণ বুদ্ধ ও করুণাকে আদর্শ পুত্র কন্যা ও বন্ধু বলিয়া মনে করিত। পল্লীর নারীরা আর ঘোমটা দিয়া ঘরের কোণে থাকা ভাল মনে করিতেন না। তাঁহারা সত্যপ্রিয়ার সহিত মাঠে যাইতেন ও নানা প্রকার সৎপ্রসঙ্গ করিতেন।

দেবগ্রামে অনেকগুলি অবনত শ্রেণীর লোকের বাস ছিল। ভদ্রশ্রেণীর দরিদ্র নর-নারীর সংখ্যাও কম নয়। প্রতিমাসে টাকা পয়সা দিয়া তাহাদের অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ দূর করিতে পারেন, সত্যপ্রিয়ার তেমন সচ্ছল অবস্থা ছিল না। তিনি কলিকাতা হইতে তাঁত ও সূতা কিনিয়া আনিয়াছিলেন। নিজে ধুতি, চাদর, গামছা ইত্যাদি বুনিতে পারিতেন। নারীদিগকে অল্প দিনেই বুনন কার্য্য শিখাইয়া দিলেন। তাহারা গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া মাসে ২১ খানা ধুতি সাড়ী তৈয়ার করিতে সক্ষম হইল। তাহারা ছেঁড়া কাপড় ছাড়িয়া ফেলিয়া যে দিন হাতের তৈয়ারী নূতন ধুতি ও সাড়ী পরিয়া আসিল, সেদিন সত্যপ্রিয়ার আনন্দ জোয়ারের স্রোতের মত সব ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধ ও করুণা মার আনন্দ দেখিয়া বলিয়াছিল, "যাহাদের কেহ নাই, আমরাও তাহাদের হইব।"

সত্যপ্রিয়ার কলিকাতায় যাওয়ার দিন আসিল। সেদিন পাড়ার ছেলে মেয়েরা বুদ্ধ ও করুণার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইল। বুদ্ধ ও করুণা চোখের জলে ভাসিয়া গেল। নারীরা সত্যপ্রিয়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, সত্যপ্রিয়ার হৃদয় শোকে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বুদ্ধ ও করুণা হাত জোড় করিয়া ভগবানকে বলিল, "আমরা যেন সকলের সুখে সুখী, সকলের দুঃখে দুঃখী হইতে পারি।"

শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, বি, এ

মায়ের প্রভাত

রাত্রি শেষে
পূর্ব্বাকাশে সূর্য্য যবে
দাঁড়ান এসে
গগন্ ভাল্
রঙিন করি রং এর খেলায়
লালে লাল্—
ধরার তখন প্রভাত হয়
মায়ের প্রভাত তখন নয়।

সুপ্ত খোকন্
স্বপ্ন রাজ্যে পরির রাজ্যে
ভ্রমেন যখন
কোন্ সে দূরে
ঘুম-পাড়ানী-মাসী পিসীর
নিদ্রাপুরে,
মায়ের গৃহে মধ্যি রাত—
হয় কি কভু সূর্য্যে প্রভাত?
শুভক্ষণে
দুষ্টু আঁখির
উন্মীলনে
লক্ষ্মী খোকন্
হাস্যে ফুটান
পদ্মানন,
সেই তো মায়ের প্রভাত উদয়
আঁধার অন্তে আলোর জয়।

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়

কৃষক

এক ছিল কৃষক। সে এক দিন এইরূপে আর্ত্তনাদ করিতেছে, "হে ভগবান! তুমি আমাকে কি অপরাধে এমন দুর্ভাগ্য করিয়াছ? দেখ, আমি কি কষ্টে দিন কাটাইতেছি। আমার এক একটি দিন যেন এক একটি বৎসরের মত বোধ হইতেছে।"

ঈশ্বর তার আর্ত্তনাদ শুনিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি কি বিপদে পড়িয়াছ? কেন এত দুঃখ করিতেছ? আমি নিয়মে কাজ করিয়া থাকি। বল, আমার কোন নিয়ম তোমার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে?"

কৃষক উত্তর করিল, "পরমেশ্বর! তোমার নিয়ম অনুসারে জমি চাষ, বীজ বপন, জল সেচন প্রভৃতি কাজে কঠিন শ্রম না করিলে মানুষের খাবার জোটে না। কি করি আমি বাধ্য হইয়া সকলই করিতেছি; কিছুতেই ত্রুটী করি নাই। কিন্তু দেখ, আমি জমিতে কাজ করিতেছিলাম, এমন সময় ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি আসিল। চাষের পক্ষে ভালই হইল বটে; কিন্তু আমার সমস্ত শরীর ভিজিয়া গেল। অনেকক্ষণ জলে ভিজিয়া ও ভিজা কাপড়ে থাকিয়া যে ঠাণ্ডা লাগিল, তাতে আমার কঠিন জ্বর হইয়াছে। এখন বিছানায় পড়িয়া গায়ের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছি। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে। তুমি বড় নির্দ্দয়। তুমি সাধারণের উপকারের জন্য নিয়ম কর বটে; কিন্তু তাতে যে কত জনের কত কষ্ট হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখ না। সন্তানের প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র স্নেহ নাই!"

বিধাতা বলিলেন, "বৎস! আমি তোমার ও প্রত্যেক মানুষের মঙ্গলের জন্যই নিয়ম অনুসারে কাজ করি। তোমরা আমার নিয়ম ভঙ্গ করিলে যে কষ্ট দিই, তাও শিক্ষার জন্য; তোমাদিগকে নিয়মের অনুগত করিয়া সুখী করিবার জন্য। তোমাদিগকে যে শ্রম করিতে দিয়াছি, তাও তোমাদের সুখেরই জন্য। তুমি যদি আমার এ সকল ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে না পার, বল, কি চাই; আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব।"

কৃষক বলিল, "ভগবান! যে নিয়মের ফলে আমার এই কঠিন রোগ হইয়াছে, তা কখনও ভাল হইতে পারে না। তুমি আমাকে সেই কঠোর নিয়ম হইতে মুক্তি দাও।"

বিধাতা বলিলেন, "তথাস্তু। আমি তোমার রোগ শান্তি করিলাম। আর যে নিয়মের ফলে তুমি এত কষ্ট পাইলে, তাও তোমার পক্ষে স্থগিত করিলাম। আজ হইতে তোমার শরীর ও কাপড় জলে ভিজিবে না। তুমি শীত-উষ্ণ বোধ করিবে না। আর তোমার গায়ে কখনও কোনও বেদনা হইবে না। এখন খুসি হইলে ত?"

কৃষক অতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিল, "দয়াময় ঈশ্বর! আমি তোমার দয়ায় কৃতার্থ হইলাম। এইরূপে প্রার্থনা পূর্ণ করিলে, কে তোমার চরণে কৃতজ্ঞ না হয়? আজ আমি ভক্তির সহিত তোমার আরাধনা করিব; কখনও তোমাকে কোন বিষয়ে দোষ দিব না।"

কথা শেষ হইতে না হইতে, কৃষক সুস্থ ও সবল হইল; এবং বিধাতাকে মনে মনে ধন্যবাদ

দিতে দিতে জমিতে গিয়া চাষ আরম্ভ করিল। তখন শরৎকাল; বার বার পালাক্রমে বৃষ্টি ও রোদ হইতে লাগিল। কিন্তু জলে তাহার শরীর কাপড় ভিজিল না; রোদেও সে গরম বোধ করিল না। ঈশ্বর তাহার পক্ষে ঐ সকল নিয়ম রহিত করিয়া দিয়াছেন।

কৃষক বিধাতার এই বিশেষ দয়া দেখিয়া আনন্দিত মনে আপনার কাজ শেষ করিয়া বাড়ী আসিল। আসিয়া এক ঘটী জল লইয়া হাত-পা ধুইতে গেল। সে হাতে পায়ে জল ঢালিল বটে, কিন্তু ভিজিল না; অন্য দিনের মত আরামও বোধ হইল না। কারণ বিধাতার বরে তার শীত-উষ্ণবোধ চলিয়া গিয়াছে।

তার পর সে নদীতে স্নান করিতে গেল। সেখানেও স্নানের সুখ কিছু মাত্র অনুভব করিল না। শরীর ও কাপড় জলে না ভিজাতে ময়লা দূর হইল না। অদ্ভুত রকমের স্নান হইল!

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া কৃষক অতিশয় চিন্তিত হইল, মনে সন্দেহ জাগিল, "আমি নিজের ইচ্ছায় বর চাহিয়া লইয়া হয়ত-বা চিরজীবনের মত সকল সুখ হারাইলাম"।

ঐরূপ অদ্ভুত স্নান করিয়া, চিন্তিত মনে বাড়ী আসিয়া কৃষক দেখিল তার ছোট ছেলেটি উঠানে খেলা করিতেছে। ভাবিল, "ইহাকে কোলে লইয়া অঙ্গ শীতল করি"। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য শিশুটিকে আদর করিয়া কোলে লইল, মুখ চুম্বন করিল, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় সুখ বোধ হইল না! তাহাকে দেখিল, তাহার কথা শুনিল; কিন্তু তাহার কোমল শরীরে শীতল স্পর্শ একটুও অনুভব করিল না! শিশুকে যে ছুঁইতেছে এমন বোধই হইল না। তখন সে স্নেহের সহিত পুত্রকে খুব জোরে বুকে চাপিয়া ধরিল; তবুও কিছু মাত্র সুখ পাইল না। বরং শিশুটি তাহার কঠিন বুকের চাপে ব্যথা পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কৃষক তখন মনে মনে এইরূপ দুঃখ করিতে লাগিল, "হায়! আমি না বুঝিয়া কি অন্যায় প্রার্থনাই করিয়াছি! আমার পক্ষে যে শরীরের নিয়ম একেবারেই রহিত হইয়া গেল!"

কৃষক অনেকক্ষণ রোদে থাকে, যত খুসি হিম লাগায়, তাতে কষ্ট বোধ করে না; কিন্তু তাতে স্বাস্থ্যের অনিষ্ট যা হইবার, তা হয়। কষ্ট বোধ করে না বলিয়া সে সময়মত সাবধান হইতে পারে না। কাজেই জানিতে না জানিতে তার শরীর ভগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল। সে হঠাৎ দেখিল যে, সে মরণদশায় উপস্থিত। তখন ভাবিল, "কি আশ্চর্য্য! আমার স্বাস্থ্য এত দূর ভগ্ন হইয়াছে, আমার কষ্ট অনুভবের শক্তি না থাকায় আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই! সময়ে সাবধান হইতেও পারি নাই; কোনও প্রতিকারও করিতে পারি নাই! হঠাৎ কোন্ দিন হয়ত মরিয়া যাইব, বুঝিতেও পারিব না যে মরিতেছি!"

তখন সে দুঃখে ও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ব্যাকুল হইয়া বলিল, "হে ভগবন্! আমার মত হতভাগ্য পৃথিবীতে আর নাই। আমি সকল সুখে বঞ্চিত হইয়াছি। আমার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল; অথচ রোগ অনুভব করিতে না পারিয়া ঠিক সময়ে চিকিৎসা করাইতে পারিলাম না। হে ঈশ্বর! তুমি আমাকে এ কি অবস্থায় ফেলিলে?"

পরমেশ্বর তার কান্না শুনিয়া বলিলেন, "বাছা! যে সব নিয়মের ফলে তোমার জ্বরের কষ্ট হইয়াছে বলিয়াছিলে, আমি সে সব নিয়ম স্থগিত করিয়া দিয়াছি। তোমার শরীরে আর

বেদনা-বোধ নাই। শীত-উষ্ণের কষ্টও নাই। এখন তুমি অসুখী কেন ?”

কৃষক কহিল, “প্রভু! আমার বোধ-শক্তি হরণ করিয়া তুমি আমাকে নিতান্ত হতভাগ্য করিয়াছ। পূর্ব্বে ক্ষেতে কাজ করিতে গেলে নির্ম্মল বাতাসে আমার গা কেমন ঠাণ্ডা হইত। এখন আর আমার সেই সুখ বুঝিবার ক্ষমতা নাই। এমন কি, নিজের সন্তানকে কোলে লইয়াও আমার সুখ বোধ হয় না। আমি কি দুর্ভাগ্য! আর দেখ, এ দিকে রোগে মরণাপন্ন হইয়াছি; কিন্তু রোগ বুঝি নাই বলিয়া প্রতিকার করিতে পারি নাই! আমার মত দুরবস্থায় কে কবে পড়িয়াছে ?”

বিধাতা বলিলেন, “আমি তোমাকে কিরূপে সুখী করিব, বল ? যখন তোমাকে নানা রকম সুখে সুখী করিবার জন্য তোমার চর্ম্মে স্পর্শশক্তি দিয়াছিলাম, এবং শরীরে নিয়মভঙ্গ করিলে যাহাতে প্রথমেই জানিতে পারিয়া সাবধান হইতে পার ও প্রতিকার করিতে পার এ জন্য শরীরে কষ্ট-বোধ দিয়াছিলাম, তখনও তুমি অসন্তুষ্ট ছিলে। এখন যে স্পর্শশক্তি ও কষ্টবোধ তুলিয়া লইলাম, এখনও তুমি অসন্তুষ্ট! দেখ, পৃথিবীকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য ও ফল শস্য জন্মাইবার জন্য আমি বৃষ্টির ব্যবস্থা করিয়াছি, তোমাদের রোগ জন্মাইবার জন্য নয়। কিন্তু তুমি বৃষ্টির সহিত শরীরের সম্বন্ধ না বুঝিয়া, অতিরিক্ত ভিজিয়া জ্বর আনিলে। জলে ভিজিয়া শরীরের নিয়ম যতদূর ভঙ্গ করিলে, তার বেশী আর না কর, এই জন্য জ্বরের কষ্ট দিয়া সাবধান করিলাম; কারণ ক্রমাগত ঐরূপে ভিজিলে তুমি মরিয়া যাইতে। কিন্তু তুমি জ্বরকেও অমঙ্গল ভাবিলে! এখন দেখ, আমি যদি তোমাকে আগের মত আমার নিয়মসকলের অধীন করি, তুমি হয়ত আবার আমাকে অনিষ্ট-কারী বলিয়া নিন্দা করিবে।”

এই কথা শুনিয়া কৃষক ব্যগ্র হইয়া বলিল, “হে দয়াময় পরমেশ্বর! এখন আমি তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমি অত্যন্ত অজ্ঞান; তাই তোমাকে দোষ দিয়া-ছিলাম। তোমার নিয়মসকল অমান্য করিলে যে শাস্তি পাওয়া যায়, তাহাতেও উপকার হয়। আমাকে আবার তোমার নিয়মের অধীন কর। আমার চর্ম্ম ও মাংস-পেশীসকলকে আবার আগের মত সুখদুঃখ অনুভব করিবার শক্তি দাও। সে গুলিকে নিয়মিত ব্যবহার না করিলে যে শাস্তি পাইতে হয়, তাহা আমি মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত আছি।”

বিধাতা কৃষকের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ আবার জ্বরে শয্যাগত হইয়া কষ্ট পাইতে লাগিল। কিন্তু এবার জ্বরের কষ্টে বিরক্ত না হইয়া, রীতিমত ঔষধ খাইতে লাগিল, ও ক্রমে সারিয়া উঠিল। তার ইন্দ্রিয়সকল আবার আগের মত সতেজ ও সবল হইল। এখন সে আর একদিনও বিধাতাকে ভক্তির সহিত প্রণাম না করিয়া অন্নজল গ্রহণ করে না। সন্তানকে কোলে লইলে যে সুখ হয়, সেই সুখে সে পর-মেশ্বরকে স্মরণ করে। বিধাতার নিয়ম সকল পালন করিয়া সুখী হইলে, সে ত তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ হয়ই; তাঁর নিয়মভঙ্গ করিয়া দুঃখ পাইলেও কৃতজ্ঞ হয়। ভাবে, এই দুঃখের দ্বারা বিধাতা আমাকে সাবধান করিয়াছেন, যাহাতে আরও অধিক দুঃখে না পড়ি।

মশা

পরম রক্তপিপাসু

অযুত মশকসম্প্রদায়-

বহুল হুলধরেষু

ক্ষুদ্র তুমি, রুদ্র তুমি মশা মহাশয়,
শোন গো আমার নিবেদন সবিনয়,
বল গো তোমার কাছে কি করেছি দোষ,
মানব জাতির প্রতি কেন এত রোষ ?
পুকুরে তোমার জন্ম শুনিবারে পাই,
সেখানে কি পানাহার মেলে না কো ভাই !
ডাঙ্গার জীবেরে কেন কর আক্রমণ ?
গায়ে প'ড়ে কর কেন শোণিত শোষণ ?
আমাদের রক্ত যদি এতই সুখাদ্য,
না হয় করিয়া দিব তোমার বরাদ্দ,
দিনান্তে ছটাক লহ,—কিন্তু অত্যাচার
কর'না রাতের বেলা, দোহাই তোমার !
ভন্ ভন্ রবে যবে আসি দলে দলে,
কামড় ফুটাও তুমি, অঙ্গ যায় জ্বলে,
তীক্ষ্ণ তব হুল তার চিহ্ন রাখি যায়,
রক্ত চন্দনের ফোটা মম সর্ব্ব গায় ।
অতি সূক্ষ্ম মশারি যে, সেও মানে হার,
ছিদ্রান্বেষী তোমা হেন আছে কেবা আর ?
ঘুমন্ত শত্রুরে একা পেয়ে অন্ধকারে,
সসৈন্যে যে ঘাড়ে পড়ে,—ধিক ধিক তারে !

কেমনে মারিব তোরে ভাবিয়া না পাই,
কামান পাতিলে পরে কোন ফল নাই,
চাপড় মারিতে গেলে, গালে লাগে চড়,
অসম এ যুদ্ধে মোরা নিরুপায় বড় !
হায় হায়, কোন্ যুগে জন্মিবে সে জন
যে করিবে মশাহীন ভারতভুবন !
যাহার কৃপায় ঘুমপাড়ানিয়া মাসি
শিয়রে নিশ্চিন্ত মনে বসিবেন আসি ।

নিদ্রা বড় সুকুমার, নিদ্রা মধুভরা,
নিদ্রা শান্তিময়ী মাতা, ক্লান্তি দুঃখহরা,
সে নিদ্রার হন্তা তুমি,—ওরে রে জল্লাদ,
সবংশে নির্ব্বংশ হও,—করি আশীর্ব্বাদ !

শ্রীইন্দিরা দেবী, বি, এ

কাজের ছেলে

(ফরাসী হইতে)

এক গরীব কৃষকের ছিল একটী মাত্র ছেলে। মা আদর করে নাম রেখেছিলেন জোসেফ। তাকে নিয়ে বাপ-মা বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। ছেলেটীর বুদ্ধিসুদ্ধি প্রখর ছিল না। তার উপর সে ছিল বেজায় কুঁড়ে। ভালো ভালো খাবার দাও, মিঠাই দাও, সুন্দর সুন্দর কোট, রঙিন মোজা দাও, এই বলে সে সর্ব্বদা মাকে বিরক্ত করত। ছেলেটী পেট ভরে খেয়ে, দিনের বেলায় রোদ পোহাতে, আর রাতে আগুনে হাত-পা গরম করতে ভাল বাসত। মা এক পয়সার বাজার আন্‌তে বললে অমনি ছেলের বেজায় মাথা ধরত। বাপের সাথে ক্ষেতে কাজ করতে বললে, ছেলেটী কোমরের ব্যথায় দাঁড়াতে পারত না। একটু লিখতে পড়্‌তে বল্‌লে ছেলের বই আর কলম খুঁজেই পাওয়া যেত না। ছেলেটীর গুণের মধ্যে স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। তার হৃষ্ট পুষ্ট দেহ সবল মাংসপেশী রক্তিম গণ্ডদেশ ও উজ্জ্বল চক্ষু দুটি দেখলে কেহই তাকে অলসতার প্রতিমূর্ত্তি মনে করতে পারত না।

মা বাপ প্রথমতঃ ছেলেকে শোধরাবার জন্য রাগ করতেন-ও ধমক দিতেন। তাতে কোন ফল হল না। ছেলের কুঁড়েমি একটুও কমল না। তখন কৃষক একটু কড়া শাসন সুরু করলো। মাঝে মাঝে ছেলের পিঠে চড় চাপড়, কিল ঘুসি পড়তে লাগল। ছেলেটি বেগতিক দেখে একদিন ভোরে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেল। সে ভেবেছিল কোন গৃহস্থের বাড়ীতে কিম্বা পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট কারখানায় চাকুরী খুঁজে নেবে, তাহ'লে খাওয়া-পরার ভাবনা থাকবে না, আর মায়ের বকুনি এবং বাবার কিল ঘুসি সইতে হবে না।

বাড়ী ছেড়ে চোখের সামনে যে পথ পাওয়া গেল, ছেলেটী সেই পথ ধরেই চলতে লাগলো সে কখন নিজের গ্রাম ছেড়ে বাইরে যায় নাই। কাজেই পথ ঘাট তার আদবেই জানা ছিল না। যা হোক, তবু সে সম্মুখের দিকেই ক্রমশঃ এগিয়ে গেল। অজানা অচেনা পথে তার একটু একটু ভয় হচ্ছিল বটে কিন্তু প্রভাতে মধুর স্নিগ্ধ বায়ুতে বেড়াতে তার খুব ভাল লাগছিল, কাজেই মনের উৎসাহে ও আনন্দে সে দ্রুতগতিতে চলতে লাগলো। এদিকে যতই বেলা বাড়তে লাগলো, ততই তার উৎসাহ কমতে লাগলো। তখন ক্ষিদেতে তার পেট জ্বলছে, পথ চলার পরিশ্রমে শরীরও ক্লান্ত হয়ে আসছে। দুঃখে কষ্টে এতক্ষণ পরে তার মায়ের স্নেহ ও আদরের কথা মনে এলো, আবার সেই সঙ্গে বাবার কিল ঘুসির ব্যথা স্মরণ হওয়াতে সে আরও তাড়াতাড়ি ছুটে চললো।

চলতে চলতে পথের ধারে রুটিওয়ালার ছোট্ট একটি দোকান দেখতে পেল। অমনি ঘরের মধ্যে ঢুকে জোসেফ রুটিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল—"এখানে কোন কাজ খালি আছে কি?"

রুটিওয়ালা—"হাঁ, পাঁউরুটি তৈয়ার করবার জন্য একজন মজুর চাই।"

জোসেফ—"আমায় ঐ কাজটি দেবেন কি?"

রুটিওয়ালা—"তুমি কি মেহনত করতে পার? বোঝা বইতে পারবে?"

জোসেফ—"হাঁ বেশ পারবো; আমার গায়ে খুব জোর আছে।"

রুটিওয়ালা তখন জোসেফের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত বেশ ক'রে দেখে বল্লে, "আচ্ছা, দু' একদিন কাজ কর, তোমার কাজ কর্ম্ম দেখে মাইনে ঠিক করে দেবো।"

জোসেফ তাতেই রাজি হলো।

রুটিওয়ালা তখন জোসেফকে খাবার-ঘর দেখিয়ে বললে, "ওই টেবিলের উপর রুটি, মাখন চা আছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে কাজে লাগো।"

জোসেফ রুটি মাখন খেয়ে ও চা পান করে তখনি মনিবের সম্মুখে উপস্থিত হলো।

রুটিওয়ালা জোসেফের হাতে একটা চাবি দিয়ে বল্লে, "উঠানের পাশে ঐ যে তালা দেওয়া গুদাম ঘরটা দেখছ, ওতে বস্তা ভরা ময়দা আছে। বস্তার মুখ কেটে বস্তাগুলি বয়ে আনবে। ওর থেকে ময়দা বার করে ময়দা মাখো, পরে অনেক ক্ষণ ধ'রে ময়দা ঠেসে পাঁউরুটির জন্য বড় বড় লেচি তৈয়ার করবে। এই কাজগুলি কর, আমি ততক্ষণ বাজার থেকে তাগাদা ক'রে আসছি।" এই বলে রুটিওয়ালা বেতের লাঠি গাছি হাতে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরুল।

ভাঁড়ার ঘর খুলে জোসেফ দেখতে পেল ময়দার বস্তাগুলি সাজান আছে। উঠানের মাঝখানে একটা লম্বা চৌবাচ্চা ছিল। গৃহপালিত মুরগী, ভেড়া ও গরুগুলি এই চৌবাচ্চার জল খেত। জোসেফ মনে মনে ভাবলো, ময়দা মাখতে জলের দরকার হবে; সেই জল আবার আমাকেই বয়ে আনতে হবে। তা অত হাঙ্গামা করবার কাজ কি? আগে ময়দার বস্তাগুলি চৌবাচ্চায় জলে ঢেলে দিই, তারপর সেখানে বেশ করে মেখে নেব। এই ঠিক করে জোসেফ ময়দার বস্তার মুখের সেলাই কেটে বস্তাটি পিঠে তুলে নিল। পিঠে তোলবার সময় বস্তার খোলা মুখ হতে কতকটা ময়দা ভাঁড়ার ঘরের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল, আবার উঠানের পথেও ময়দা পড়তে পড়তে গেল। জোসেফ এই ভাবে বস্তার পর পর বস্তা পিঠে করে নিয়ে চৌবাচ্চায় ফেলতে লাগলো। ময়দা পড়ে যাওয়াতে উঠান সাদা হয়ে উঠল। জোসফের সর্ব্বাঙ্গ ময়দা-মাখা হলো। ছড়ান ময়দা পেয়ে মুরগী, হাঁস, ছাগল, ভেড়া গরু বাছুরের দল এসে কলরব করতে করতে আনন্দে ভোজন করতে লাগল।

ঠিক এই সময়ে রুটিওয়ালা বাহির থেকে এসে ঘরে ঢুকলো। তখন জোসেফ শেষ বস্তাটা পিঠে নিয়ে উঠানে সবে পা দিয়েছে। রুটিওয়ালা জানোয়ারদের ভোজন-উৎসব দেখে এক মুহূর্ত্ত হতভম্ভ হয়ে রইল। পরে রাগে লাল হয়ে—"বোকা, আনাড়ি, আমার সর্ব্বনাশ করলি?" বলতে বলতে তেড়ে গিয়ে হাতের লাঠি দিয়ে জোসেফের পিঠে এক ঘা বসিয়ে দিল। ধুম করে বস্তাটা উঠানে ফেলে দিয়ে "বাবাগো মাগো" বলতে বলতে জোসেফ দৌড়ে পালাল। রুটিওয়ালা বেতহাতে তার পেছনে তাড়া করল। জোসেফ এক দৌড়ে রুটিওয়ালার বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় গেল, আর প্রাণপণে ছুটতে লাগল। রুটিওয়ালা জোসেফকে ধরতে না পেরে পাগলের মত হয়ে, "বোকাটা আমার সর্ব্বনাশ করেছে" বলতে বলতে এঘর ওঘর করতে লাগলো।

জোসেফ রুটিওয়ালার ভয়ে পথের ধারে একটা খড়ের গাদায় লুকিয়ে রইল। শীতের

ঠাণ্ডা রাতটা খড়ের মধ্যে আরামেই কেটে গেল। কিন্তু যতই রাত বেশী হ'ল ক্ষিধেতে ততই তার পেট জ্বলতে লাগল। তার উপর আবার বোঝা বয়ে সমস্ত শরীরে ব্যথা হয়েছে আর রুটিওয়ালার লাঠির চোটে পিঠটাও একটু ফুলেছে। ক্ষুধায় ও যন্ত্রণায় জোসেফের দুই চক্ষে জল এলো। তখন স্নেহময়ী মায়ের কথা মনে হল! সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে ফিরবার ইচ্ছাও জোসেফের মনে জাগল, কিন্তু বাবার কড়া শাসনের ভয়ে সে একটু দমে গেল। অবশেষে ভাবতে ভাবতে ঘুমের কোলে ঢুলে পড়লো।

পরদিন ভোরে উঠে জোসেফ আবার চলতে লাগলো। চলতে চলতে পথের ধারে মুচির দোকানে ঢুকে সে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের দোকানে কোন কাজ খালি আছে কি?"

মুচি—"হাঁ আছে।"

জোসেফ—"আমাকে সেই কাজটা দেবে কি?"

মুচি—"তুমি কি এ কাজ করতে পারবে?"

জোসেফ—"কেন পারবো না, এ তো খুব মেহনতের কাজ নয়। শুধু চামড়া কাটা আর সেলাই করা—এই তো কাজ?"

মুচি—"তা বেশ; প্রথমে কিন্তু মাইনে পাবে না, খেতে পরতে ও থাকতে পাবে। পরে কাজ দেখে তোমার মাইনে ঠিক হবে।"

জোসেফ তাতেই রাজি হ'ল। মুচি জোসেফকে সঙ্গে নিয়ে প্রাতর্ভোজন করবার পর বললে—"এই বড় চামড়াখানা তক্তার উপর রেখে কতগুলি চটিজুতার তলা কাট।" এই কথা বলে মুচি অন্য ঘরে ব'সে জুতা সেলাই করতে লাগল। ঘণ্টাখানেক পরে এসে মুচি অবাক হয়ে দেখতে পেল, জোসেফ নানা আকারের চটির তলা কেটেছে; কোন টুকরা লম্বা, কোনটা বা গোল, কোনটা বাদামি আকার। জোসেফের কাণ্ড দেখে মুচি রাগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে "গাধা, দামী চামড়াটা কেটে কুচি কুচি করে নষ্ট করলি!" এই কথা বলেই জোরে এক থাপ্পর বসিয়ে দিল। জোসেফ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চামড়া কাটা বাটালি হাতে নিয়েই দৌড়ে পালাল। মুচি জোসেফকে ধরতে না পেরে রেগে গালাগালি দিতে লাগল।

জোসেফ এবার বাড়ীর দিকে ফিরতে লাগল। সে বারবার লোকের হাতে মার খেয়ে মায়ের কাছে যাবার জন্য ব্যাকুল হ'ল। সে মনে মনে ভাবলো বিদেশে লোকের হাতে নিষ্ঠুর প্রহার পাওয়ার চেয়ে মাঝে মাঝে বাড়ীতে নিজের পিতার হাতের কিল চাপড়টা সয়ে থাকাও সুখকর হবে।

এইরূপ ভাবতে ভাবতে জোসেফ তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চলতে লাগলো। কিন্তু নিজের গ্রাম থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল, কাজেই পথের মাঝে সন্ধ্যা হলো। ঘুটঘুটে আঁধার রাতে চলতে না পেরে সে পথের একটু দূরে একটা বড় গাছের তলায়, সমস্ত শরীর লম্বাকোট দিয়ে ঢেকে শুয়ে পড়ল। সেই গাছটাতে প্রকাণ্ড একটা মৌমাছির চাক ছিল। গভীর রাতে কয়েকজন চোর মধু চুরি করতে এলো। তারা অতি সন্তর্পণে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছিগুলিকে চাক হতে তাড়িয়ে দিল। একজন চোর তখন গাছে উঠে কাঁচি দিয়ে চাকটাকে কেটে মাটিতে ফেলে দিল। দৈবক্রমে মৌচাকটা জোসেফের উপরেই পড়ল কিন্তু তাতে তার ঘুম ভাঙ্গল না।

চোরেরা তাড়াতাড়ি মধু ও মোম সহ মৌচাকটাকে বস্তার ভিতর পুরে বস্তার মুখ বন্ধ করে

পিঠের উপর উঠিয়ে নিল। বস্তাটা খুব ভারী বোধ হওয়াতে তারা মনে করল, এবার অনেক মধু পাওয়া যাবে। তাদের আনন্দ আর ধরে না।

এদিকে বস্তার মধ্যে জোসেফের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার কষ্টের সীমা নাই। আঠার মত কি একটা জিনিষে তার সর্ব্বাঙ্গ চট্‌চটে হয়েছে। মাঝে মাঝে কিসে যেন হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। জোসেফ তাড়াতাড়ি পকেট থেকে চামড়া কাটা বাটালি বার করে বস্তা কাটবার চেষ্টা করলো। চোর বুঝতে পারল, কি যেন একটা অদ্ভুত পদার্থ বস্তার মধ্যে খচমচ করছে ও তার কাঁধ কেটে দিচ্ছে। দুই একবার কাঁধ বদল করে সে আর সইতে না পেরে, দুম করে মাটীতে বস্তা ফেলে দিয়ে ভূতের ভয়ে পালিয়ে গেল।

তারপর জোসেফ অনেক কষ্টে বস্তা কেটে বাইরে এলো। তখন প্রভাত হয়েছে। জোসেফ সেই মধু-মাখা দেহে, অদ্ভুত বেশে বাড়ীতে পৌঁছল। তার স্নেহময়ী মাতা সাবান মাখিয়ে বেশ করে তার সর্ব্বাঙ্গ গরম জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলেন। পরিষ্কার পোষাক পরে, মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে জোসেফ বলল মা, আমি আর কখনও তোমাদের ছেড়ে যাব না।"

সেই দিন হতেই জোসেফ মায়ের কথামত চলতে লাগল। আর বাপের সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করতে সুরু করল। সে এত পরিশ্রম ও মনোযোগ দিয়ে চাষ করতে লাগল যে, এক বৎসরেই কৃষকের সাংসারিক অবস্থা ভাল হয়ে উঠল।

জোসেফ পরে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে ফরাসী দেশে একজন ধনী ও সুখী গৃহস্থ হয়েছিল।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ

কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণ

আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় যে বিশাল হিমালয় পর্ব্বত আছে তা তোমরা সকলেই বোধ হয় জান। পৃথিবীর সকল পর্ব্বতের মধ্যে এই হিমালয়ই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। হিমালয়ের শতাধিক বড় বড় চূড়া আছে। তার মধ্যে তিনটী চূড়াই খুব উঁচু গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ধবলগিরি। গৌরীশঙ্কর ২৯ হাজার ফিট উঁচু। তার নীচেই কাঞ্চনজঙ্ঘা ২৮২০০ ফিট উঁচু। কাঞ্চনজঙ্ঘা উচ্চতায় পৃথিবীর সকল পর্ব্বতের মধ্যে তৃতীয় কিম্বা (কাহারও মতে) দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

তোমাদের মধ্যে যারা দার্জ্জিলিঙ্গে বেড়াতে গিয়েছ, তারা বরফে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে থাকবে। দার্জ্জিলিঙ্গে গেলে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবার জন্য সকলেই উৎসুক হন। সেখানকার দৃশ্যগুলির মধ্যে এই কাঞ্চনজঙ্ঘাই অতিশয় মনোরম। সে দৃশ্য একবার দেখলে কেহ জীবনে ভুলতে পারবে না। প্রত্যূষে যখন সূর্য্যের রাঙ্গা কিরণ সাদা বরফের পাহাড়ের উপর পড়ে, তখন পাহাড়টী কি সুন্দর দেখায়! সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন সূর্য্যের গাঢ় লাল আভা তুষারে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর পড়ে তখন মনে হয় কে যেন আকাশ থেকে সোনা ঢেলে দিয়েছে, আর সোনা যেন গলে গলে নীচে ছড়িয়ে পড়ছে। আবার রাত্রে চাঁদের স্নিগ্ধ আলোকে যখন সাদা পাহাড়টী উজ্জ্বল হয়ে উঠে, তখন মনে হয় এ যেন এক স্বপ্নের রাজ্য—শান্ত, শুভ্র, মধুর!

কাঞ্চনজঙ্ঘা

কাঞ্চনজঙ্ঘা একে অতি উঁচু, তাতে আবার

শীত গ্রীষ্মে দিন রাতই "বরফের টুপি" মাথায় পরে বসে আছে। মানুষ এ পর্য্যন্ত এর মাথায় পা ফেলতে পারে নাই। ইউরোপের তিন দল লোক পূর্ব্বে দুই তিনবার এই দুর্গম পর্ব্বতে উঠবার চেষ্টা করে ছিল। কিন্তু কেহই অত উঁচুতে উঠতে পারে নাই। সকলেই হার মেনেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা উঠবার চেষ্টা করে এরা অশেষ ক্লেশ সহ্য করেছে, এমন কি অনেকে প্রাণ দিয়েছে। তবু এদের চেষ্টার বিরাম নাই। সম্প্রতি একদল জার্ম্মান নির্ভিক চিত্তে বিপুল আয়োজনে কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণ করতে এসেছেন।

এই দলে যাহারা আছে, তাহারা পর্ব্বত-আরোহণে অভ্যস্ত ওস্তাদ লোক, ইহারা যুবক ও খেলাধূলায় পটু। এদের বেছে বেছে নেওয়া হয়েছে। দলের অধিকাংশই জার্ম্মান আলপাইন ক্লাবের সভ্য। তোমরা জান কলিকাতায় ফুটবল ক্লাব, টেনিস ক্লাব আছে। এই সকল ক্লাবের সভ্যরা মিলে এক সঙ্গে ফুটবল ও টেনিস খেলে থাকে। সেইরূপ ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ও জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশে "আলপাইন ক্লাব" আছে। ইহার সভ্যগণ মিলে আল্পস প্রভৃতি পাহাড়ের উপর উঠে থাকে। এই সকল দেশে পাহাড়ে উঠাও ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতির মত একটা খেলার মধ্যে ধরা হয়। যাহারা কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী সেইরূপ যুবক যুবতীরাই পাহাড়ে উঠতে এবং বরফের উপর পায়ে 'স্কি" পরে চলতে ভাল বাসে।

এই কাঞ্চনজঙ্ঘা-যাত্রীদলের নেতা হয়েছেন অধ্যাপক ডাইরেনফর্থ। ইনি জুরিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক। বয়স ৪৪ বৎসর। ইনি ৯ বৎসর বয়সেই পাহাড়ে উঠতে অভ্যাস করেন এবং তের বৎসর বয়সেই একটী উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠেন। এ পর্য্যন্ত ইনি সাত শত পর্ব্বতের চূড়ায় উঠেছেন। একবার পাহাড়ে উঠতে দড়ি ছিঁড়ে পড়ে গিয়ে খুব আঘাত পেয়েছিলেন, তবুও পাহাড়ে উঠতে ছাড়েন নাই। গত মহাযুদ্ধের সময় একদল পাহাড়ী পথ-

প্রদর্শেকের নেতা হয়ে ইতালীর সীমায় কয়েক মাস পাহাড়ের উপর বরফের মধ্যে বাস করে ছিলেন। ইনি যেমন কর্ম্মঠ, তেমনি নানা প্রকারের খেলাতেও পটু, কিন্তু তাই ব'লে মনে করবে না ইনি কেবল খেলা আমোদ নিয়েই থাকেন। ইনি ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকগুলি বই লিখেছেন। আর আলপ্স পর্ব্বতে আরোহণ সম্বন্ধেও অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। আবার নিজে নিজে ফটো তুলতেও খুব দক্ষ।
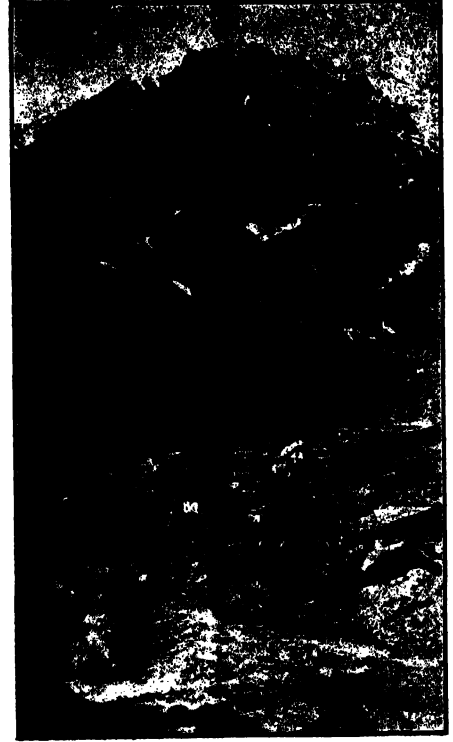
এই অধ্যাপকের বৃদ্ধ পিতার বয়স এখন ৮০ বৎসর। ইনিও পর্ব্বত-আরাহণে খুব পারদর্শী। ৭৪ বৎসর বয়সে একাকী খুব উঁচু একটী পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলেন!

পাহাড়ে উঠতে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। আর একজন আছেন তিনি সিনেমাটোগ্রাফে পাহাড়ে উঠবার পথের ছবি তুলতে পারেন। এইরূপে দলের প্রত্যেক যাত্রীই পর্ব্বত আরোহণের
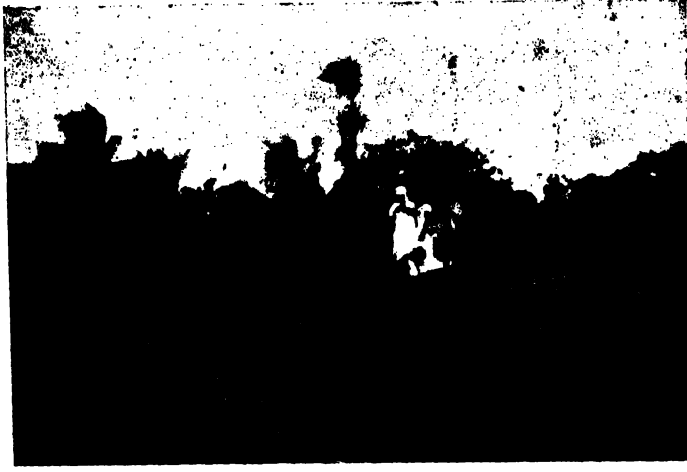
অধ্যাপক ডাইরেনকর্থের স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গে অনেকবার পাহাড়ে উঠেছেন। তিনিও এই যাত্রীদলের সঙ্গে এসেছেন। এই মহিলা জার্ম্মানি, অষ্ট্রিয়া এবং সুইজারল্যাণ্ড দেশের টেনিস খেলোয়ারদের মধ্যে বিখ্যাত।

কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্ব্বতে উঠতে যেরূপ অভিজ্ঞ লোকের দরকার, অধ্যাপক ডাইরেনকর্থ সেইরূপ লোকই দলভুক্ত করেছেন। এমন একজন ডাক্তার সঙ্গে এনেছেন, যিনি খুব উঁচু পাহাড়ে উঠলে মানুষের শরীর কিরূপ পরিবর্ত্তন হতে পারে তাহা বিশেষরূপে আয়ত্ত করেছেন। এই দলে এমন দুইটী যুবক "পথ-প্রদর্শক" এসেছে যাহারা এক হাজার পর্ব্বতের চূড়ায় উঠে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। আবার এদের সঙ্গে এমন একজন যাত্রী আছেন যাঁহার শীতকালে

প্রয়োজনীয় কাজে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করে এসেছেন।

জার্ম্মানি থেকে যে সকল যাত্রী এসেছেন, আমাদের দেশীয় লোকের সাহায্য না ল'য়ে তারা কিছুতেই পাহাড়ে উঠতে পারবেন না। খাদ্য-সামগ্রী, নানাবিধ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ইত্যাদি বয়ে নেবার জন্য অনেকগুলি কর্ম্মঠ মুটে চাই। কারণ পথে গরুর গাড়ী কিম্বা মোটরলরী চলবে না। পূর্ব্বে যে সমস্ত নেপালী কিম্বা পাহাড়ী কুলি পর্ব্বত যাত্রীদের সঙ্গে গিয়েছিল এবারেও তারাই মোট ব'য়ে নেবে। এই সকল কুলি বন্দোবস্তের ভার নিয়েছেন এই দলের একজন ইংরেজ যাত্রী। তিনি আসামের এক চা বাগানের অধ্যক্ষ। চাকরী থেকে বিদায় নিয়ে পাহাড়ে উঠতে যাচ্ছেন। দার্জ্জিলিঙ্গ থেকে

কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্ব্বতে উঠবার ছুইটী পথ আছে। একটা পথ গেছে সিকিম রাজ্যের ভিতর দিয়ে আর একটা গেছে নেপালের দিক দিয়ে। জার্ম্মান যাত্রীরা নেপালের পথেই যাচ্ছেন। নেপালের মহারাজা তাঁর রাজ্যের ভিতর দিয়ে যেতে বিদেশী যাত্রীদিগকে অনুমতি দিয়েছেন।

প্রায় ১৭ হাজার ফিট উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে যাত্রীগণের প্রধান আড্ডা বসবে। এখানে খাদ্যাদি সকল প্রকার দ্রব্যই মজুত রাখা হবে। এখান হতে উপরের দিকে আরো পাঁচ ছয়টা ছোট ছোট বিশ্রাম-তাঁবু পড়বে। প্রধান আড্ডায় পঁহুছিবার জন্য তিনটা সাময়িক বিশ্রাম-তাঁবু খাটাতে হবে। কুলিরা দলে দলে মোট নিয়ে এসে এক বিশ্রাম তাবু থেকে অপর তাবুতে মোট পঁহুছিয়ে দেবে। এইরূপে ক্রমশঃ সমস্ত মোট প্রধান আড্ডাতে মজুত হবে।

(ক্রমশঃ)

সুখী যুবরাজ

সহরের প্রান্তভাগে একটী খুব উচ্চ স্তম্ভের উপর সুখী যুবরাজের মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ টক্‌টকে সোনার পাতলা পাত দিয়া মোড়া ছিল। তাহার দুটি চক্ষে দুটি উজ্জ্বল হীরকখণ্ড এবং তাহার হাতে যে তরবারি ছিল তাহাতে একটী খুব বড় রক্তবর্ণের চুণী ছিল।

সহরের সকলেই যুবরাজের এই মূর্ত্তিটির কারুকার্য্যের প্রশংসা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিত। ইহা সহরের সৌন্দর্য্য শতগুণে বাড়াইয়া দিয়াছিল।

একটী ছোট ছেলে "চাঁদ নেব চাঁদ নেব," বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার মাকে বিরক্ত করিতেছিল। মা রাগিয়া বলিলেন, "তুই সুখী যুবরাজের মত হতে পারিস না? দেখত, সুখী যুবরাজ কখনো কোন জিনিষ চেয়ে কাঁদে না।'

বিদ্যালয় হইতে এক দল বালক বালিকা বাহির হইয়া মূর্ত্তিটি দেখিয়া বলিল "ঠিক দেবদূতের মত দেখতে, না ভাই?"

তাহাদের গণিতের শিক্ষক বলিলেন, "কি করে তোমরা জানলে? তোমরা ত তাদের কখনো দেখনি?

শিশুরা তাহাদের স্বাভাবিক সুমিষ্ট স্বরে বলিল, "বাঃ আমাদের স্বপ্নেতে তাদের দেখি যে।"

এই কথা শুনিয়া গণিতের শিক্ষক ভ্রূ সঙ্কুচিত করিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন। শিশুরা যে স্বপ্ন দেখে তাহা তিনি পছন্দ করেন না।

শীত আসিতেছে বলিয়া দলে দলে সোয়ালো পাখী মিশর দেশে চলিয়া গেল। একটী ছোট পাখী তাহাদের সহিত যাইতে না পারিয়া রহিয়া গেল।

তারপর শীত বেশী করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলে সেই ছোট পাখীটী মিশরে যাইবে বলিয়া একদিন রাত্রিতে সেই সহরে উড়িয়া আসিল। উচ্চ স্তম্ভের উপর সুখী যুবরাজের সুন্দর মূর্ত্তিটি দেখিয়া সেই রাত্রের মত তাহার দুই পায়ের মাঝখানে ঘুমাইবার জন্য শুইল।

চারিদিক দেখিয়া লইয়া পাখীটি বলিল "কি সুন্দর সোণার শোবার ঘর পেয়েছি। এখানে কেমন নির্ম্মল বাতাস।"

এই বলিয়া ডানার নীচে তাহার মাথাটি গুঁজিয়া দিল। তখনি এক ফোঁটা জল তাহার উপর পড়িল। সে অবাক হইয়া বলিল "কি আশ্চর্য্য। আকাশে এক টুকরাও মেঘ নাই, নীল আকাশে তারারা সব জ্বল জ্বল করছে, আর এর মধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে কি করে? এ দেশের জলবায়ু বড় খারাপ দেখছি।"

তারপর আর এক ফোঁটা জল পড়িল।

"বৃষ্টিতে যদি আমার গা-ই ভিজে গেল তবে আর এই এত বড় মূর্ত্তির নীচে শুতে এলাম কেন? এখান থেকে চলে যাই। দেখি কোনো বাড়ীর আল্‌সের কোণে গিয়ে শোব।"

এই বলিয়া সে যখন ডানা মেলিয়া উড়িতে যাইতেছে তখন আর এক ফোঁটা জল পড়িল।

তখন সে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল। আহা, উপরের দিকে চাহিয়া কি দেখিল?

সুখী যুবরাজের বড় বড় চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া টলটল করিতেছে আর তাহার সোণার গাল বাহিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। চাঁদের আলোতে তাহার মুখখানি এমন সুন্দর দেখাইতেছে যে তাহার ব্যথিত মুখের দিকে চাহিয়া সোয়ালো পাখীটির দয়া হইল।

সোয়ালো জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ভাই?"

"আমি সুখী যুবরাজ।"

সোয়ালো আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তাহ'লে কাঁদছ কেন ভাই? তুমি একেবারে আমাকে ভিজিয়ে দিয়েছ যে।"

মর্ম্মর-মূর্ত্তিটি বলিল, "আমি যখন বেঁচে ছিলাম আর আমার যখন মানুষের মত হৃৎপিণ্ড ছিল তখন আমি দুঃখ কাকে বলে জানতাম না, চোখের জল আমার অজানিত ছিল। কারণ আমি এক প্রাসাদে বাস করতাম, সেখানে দুঃখের প্রবেশ নিষেধ ছিল। সারাদিন আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে বাগানে আমোদ করে খেলে বেড়াতাম, আর সন্ধ্যাকালে প্রাসাদের প্রকাণ্ড মর্ম্মর মণ্ডিত সুসজ্জিত ঘরে নিমন্ত্রিত বন্ধুদের নিয়ে গান বাজনায় কাটাতাম। আমার প্রাসাদের চারিদিক ঘেরে একটা উঁচু দেওয়াল ছিল। তার ভিতরটা এত সুন্দর ছিল যে তার বাইরে কি আছে তা জানতে আমার একদিনও ইচ্ছা হয় নাই। আমার পরিষদেরা আমাকে 'সুখী যুবরাজ' বলে ডাকতেন। আমোদ প্রমোদেই যদি জীবনের সুখ হয় তবে আমি সত্যই সুখী ছিলাম। এই রকম সুখেই আমার দিন কেটে গিয়েছিল এবং এই সুখের [illegible] থেকেই আমি মরণের কোলে ঢলে [illegible] কিন্তু আমার মৃত্যুর পর দেশের লোকেরা আমাকে এত উঁচুতে রেখেছে যে, আমি বেঁচে থাকতে যার অস্তিত্ব কল্পনাও করতে পারিনি, মানব জীবনের সেই সমস্ত দুঃখ, সমস্ত ব্যথা, দারিদ্র্যের ভীষণ যাতনা, সবই আমি দেখতে পাচ্ছি। আমার হৃৎপিণ্ড শিসা দিয়ে তৈরী হলেও আমি এ সব বেদনার দৃশ্য দেখে না কেঁদে থাকতে পারছি না।"

সোয়ালো মনে মনে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এই মূর্ত্তি না নীরেট পাথরের তৈরী! এর এত ব্যথা!"

মর্ম্মর মূর্ত্তিটি সুমধুর স্বরে বলিতে লাগিল "অনেক দূরে একটী ছোট রাস্তার ধারে, ঐ যে একটী ভাঙ্গা জীর্ণ বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ওর খোলা জানালা দিয়ে আমি একটি গরীব স্ত্রীলোককে দেখতে পাচ্ছি, তার মুখখানি শীর্ণ, বিবর্ণ, আর ভয়ানক চিন্তাকুল। আর খসখসে হাতের আঙ্গুল-গুলি সব ছুঁচের ফোঁটানিতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে, সেলায়ের কাজ করে সে দিন গুজরান করে। সে রাণীর সখীর জন্য আকাশের মত নীল একটী পাতলা সাড়ীতে জরির ফুল তুলছে। সেই ঘরের এক কোণে একটি মলিন বিছানায় তার ছোট্ট ছেলেটী রোগে পড়ে ছটফট্ করছে। প্রবল জ্বরে পিপাসায় কাতর হয়ে সে কমলা-নেবু খেতে চাইছে। হতভাগিনী মার তাকে জল ছাড়া আর কিছু দেবার নেই। তাই সে কেবল কাঁদছে। সোয়ালো, আমার ছোট্ট বন্ধু সোয়ালো, আমার একটী কথা শুনবে কি? তুমি কি দয়া করে আমার তরবারিতে যে লাল চুনিটি আছে তা তুলে নিয়ে ঐ দুঃখিনীকে দিয়ে আসবে? আমার পা দুটো এই বেদীতে বাঁধা রয়েছে, তাই আমি নড়তে পারি না।"

সোয়ালো বলিল, "মিশর দেশে আমার

বন্ধুরা যে আমার পথ চেয়ে রয়েছে! তারা কেমন আনন্দে নদীর উপর দিয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, আর পদ্মের মধু খেয়ে তাদের সঙ্গে গল্প করছে।"

যুবরাজ বলিল, "সোয়ালো, বন্ধু সোয়ালো, তুমি কি শুধু এক রাত্রি আমার কাছে থেকে আমার দূত হবে না? ছোট্ট ছেলেটী তৃষ্ণায় ছটফট করছে, আর তার মা বড় দুঃখিনী।"

সোয়ালো বলিল, "আমি ছোট ছেলেদের মোটেই ভালবাসি না। গত গ্রীষ্মকালে আমি একদিন নদীর উপর দিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, তখন কলওয়ালার দুটি ছেলে আমাকে ঢিল ছুঁড়ে মারতে চেষ্টা করেছিল। অবশ্য তাদের ঢিল আমার গায়ে লাগে নি, কেননা আমরা—পাখীরা মানুষের আঘাতের ঢের উপরে উড়ে যেতে পারি।"

এই কথা শুনিয়া যুবরাজ এত বিষন্ন হইয়া পড়িল যে ছোট সোয়ালো পাখীও তাহাতে দুঃখিত হইল। সে তখন বলিল, "এখানে যদিও বড় ঠাণ্ডা তবুও আমি তোমার জন্য এক রাত্রি থেকে তোমার কাজ করব।"

যুবরাজ আনন্দের সহিত বলিল, "বন্ধু সোয়ালো, তোমাকে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।"

যুবরাজের তরবারি হইতে লাল চুণিটি ঠোঁটে করিয়া তুলিয়া লইয়া সোয়ালো সহরের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে সে সহরের সব চেয়ে উঁচু মন্দিরের চূড়ার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। ঐ চূড়ার দুই পাশে শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত কেমন সুন্দর দেব-দূতের মূর্ত্তি ছিল। সে রাজপ্রাসাদের উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে সুমধুর গান বাজনার শব্দ শুনিতে পাইল। সে দেখিল একটী সুন্দরী তরুণী সুসজ্জিত বেশে হাসিতে হাসিতে প্রাসাদের মর্ম্মর মণ্ডিত বারাণ্ডায় আসিয়া তাহার বন্ধুর পাশে দাঁড়াইল। বন্ধু বলিল, "নীল আকাশের ঐ জ্বলজ্বলে তারাগুলি কি রহস্যময়। আর এই সুন্দর পৃথিবী কি সুখের যায়গা!"

তরুণী হাসিয়া বলিল, "রাজপুত্রের বিবাহের রাত্রিতে পরবার জন্য আমি ঐ আকাশের মত নীল সাড়ীতে ঐ জ্বলজ্বলে তারার মত জরির তারা বুনতে দিয়েছি। সময় মত তা পেলে হয়। যে স্ত্রীলোকগুলো সেলাইয়ের কাজ করে খায়, তারা এত কুঁড়ে যে সময়মত কোনো পোষাক দিতে পারে না!"

এই সব দেখিতে দেখিতে সোয়ালো পাখী আরো উড়িয়া চলিল। নদীর উপর দিয়া যাইতে যাইতে দেখিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজগুলি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের মাস্তুল হইতে লণ্ঠনগুলি ঝুলিতেছে। সুদখোর মহাজনেরা আড়তে বসিয়া দাঁড়িপাল্লায় টাকা ওজন করিতেছে।

ক্রমে সে সেই ভাঙ্গা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পৌছিল। খোলা জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিল, ছোট্ট ছেলেটী বিছানায় পড়িয়া জ্বরের ঘোরে ছটফট করিতেছে আর প্রলাপ বকিতেছে। তাহার পরিশ্রান্ত দুঃখিনী মা তাহারই বিছানার একধারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সোয়ালো আস্তে আস্তে লাফাইয়া লাফাইয়া ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীলোকটীর সেলাইয়ের সরঞ্জামের পাশে চুণিটি রাখিয়া দিল। তারপর ছেলেটির বিছানার চারিপাশে আস্তে আস্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার জ্বরতপ্ত কপালে ডানার বাতাস দিতে লাগিল। ছেলেটী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আমার কি আরাম,

কি ঠাণ্ডা লাগছে। আমার মনে হচ্ছে আমি ভাল হয়ে যাচ্ছি।" এই বলিয়া সে শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িল।

তারপর সোয়ালো পাখী সুখী যুবরাজের নিকট গিয়া সব কথা বলিল। সোয়ালো আপন মনে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! আমার এখন বেশ গরম বোধ হচ্ছে, যদিও চারিদিকে এত ঠাণ্ডা।"

রাজপুত্র বলিল, "তুমি একটি সৎকাজ করেছ কিনা, তাই তোমার ওরকম বোধ হচ্ছে।" এই কথা শুনিয়া সোয়ালো পাখী ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

সকাল হইলে সোয়ালো নদীতে উড়িয়া গিয়া স্নান করিতে লাগিল। পক্ষীবিদ্যায় পণ্ডিত এক জ্ঞানী লোক সেতুর উপর দিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "কি অদ্ভুত দৃশ্য! শীতকালে সোয়ালো পাখী কোথা হইতে আসিল! তারপর তিনি সংবাদ পত্রে এই আশ্চর্য্য ঘটনার কথা লিখিলেন আর দেশময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

"আজ রাত্রে আমি মিশরে যাইব," এই বলিয়া সোয়ালো সেই সুন্দর গরম দেশের সুখের কথা মনে করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তারপর আনন্দিত মনে সহরের সব মনুমেণ্ট, গির্জ্জার চূড়ার উপর উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইয়া সব দেখিতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে আকাশে চাঁদ উঠিলে সে সুখী যুবরাজের নিকট গিয়া বলিল, "তোমার যদি মিশরে কোন কাজ করবার থাকে, আমাকে বল। আমি সেখানে রওনা হচ্ছি।"

রাজপুত্র বলিল "সোয়ালো, সোয়ালো, তুমি কি আর এক রাত্রি আমার কাছে থাকবে না!"

সোয়ালো বলিল, "মিশরে আমার প্রিয়জনেরা আমার পথ চেয়ে আছে যে। তারা কাল সেই প্রকাণ্ড জলপ্রপাত দেখতে যাবে। সেখানে রোজ দুপুরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সিংহরা জল খেতে আসে। তাদের গর্জ্জন, জলপ্রপাতের গুঞ্জনের চেয়ে ঢের ভয়ঙ্কর।"

রাজপুত্র বলিল, "বন্ধু সোয়ালো, ঐ দূরে সহরের আর একপ্রান্তে, একটী চারতলা বাড়ীর উপরে চিলা কুঠুরিতে আমি একটী যুবককে দেখিতে পাচ্ছি; এক রাশ কাগজভরা টেবিলের উপর সে ঝুঁকে পড়ে রয়েছে। তার পাশে একটী ছোট ফুলদানীতে একটী শুকনো গোলাপের তোড়া রয়েছে। তার কালো কোকড়ানো চুলগুলি কি সুন্দর! ডালিমের বিচির মত তার ঠোঁট দুটি লাল, তার বড় বড় চোখ দুটি স্বপ্নময়। সে একটী নাটক লিখতে চেষ্টা করছে কিন্তু ঠাণ্ডা ঘরে বসে বসে তার হাত পা জমে যাচ্ছে, ক্ষুধাতে তার শীর্ণ দেহ অবসন্ন হয়ে আসছে, সে আর লিখ্‌তে পারছে না।"

সোয়ালোর হৃদয়টী খুব দয়াপ্রবণ ছিল সে বলিল, "আচ্ছা, আমি আর এক রাত্রি তোমার কাছে থাকব। তোমার আর একটা চুনি কি আমি দিয়ে আসব?"

যুবরাজ বলিল, "হায়, আর ত আমার আর একটীও চুনি নেই! আমার চোখ নেই। আমার চোখ যে দুটী দুর্লভ হীরা দিয়ে তৈরী, তা ছাড়া আমার আর কিছু নাই। তুমি আমার একটী চোখ তুলে নিয়ে তাকে দিয়ে এস। সে সেটা রত্নাকরের কাছে বিক্রয় করে তার খাবার, আগুন করবার জন্য কাঠকয়লা আর কাপড় চোপড় কিনবে। তারপর সুস্থ হয়ে তার নাটকখানি শেষ করতে পারবে, তা হলেই সে অনেক টাকা পাবে। তখন আর তার দুঃখ থাকবে না।"

সোয়ালো কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "প্রিয় রাজপুত্র, আমি তা পারব না।"

যুবরাজ বলিল, "বন্ধু সোয়ালো, আমি যেমন বলছি তেমনি কর। তা নইলে আমি কিছুতেই শান্ত হতে পারছি না।"

তারপর সোয়ালো যুবরাজের চোখটী তুলিয়া লইয়া সেই যুবকের চিলা কুঠুরিতে উড়িয়া গেল। ছাদের একটী ছিদ্রের মধ্য দিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। যুবকটী দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়াছিল। তাই সে পাখীর ডানার শব্দ শুনিতে পায় নাই। মাথা তুলিয়া শুষ্ক গোলাপের তোড়ার উপর সুন্দর হীরকখণ্ডটী দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

তারপর আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিল, "আমার লেখা তবে লোকে পছন্দ করেছে! এ নিশ্চয়ই আমার কোনো ভক্তের উপহার। আমি এবার নিশ্চিন্ত মনে আমার নাটকটী শেষ করতে পারব।" যুবকের মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বন্দরে যেসব বড় বড় জাহাজ দাঁড়াইয়াছিল তাহারই একটী মাস্তুলের উপর বসিয়া সোয়ালো পাখী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি সুন্দর মিশর দেশে যাচ্ছি, আর দেরী নাই।"

তারপর চাঁদ উঠিলে সে আবার যুবরাজের নিকট উড়িয়া গিয়া বলিল, "রাজপুত্র, আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি।"

যুবরাজ দুঃখের স্বরে বলিল, "বন্ধু সোয়ালো, তুমি কি দয়া করে আর এক রাত্রি আমার কাছে থাকবে না।"

সোয়ালো বলিল, "এখানে এখনি খুব শীত পড়েছে। আর দু'দিন পরেই বরফ পড়তে আরম্ভ করবে। কিন্তু মিশর দেশ এখন কেমন সূর্য্যের আলোতে উজ্জ্বল, উঁচু নীচু তালগাছের উপর দিয়ে প্রভাত সূর্য্যের লাল আলো কেমন সুন্দর দেখায়। নদীর ধারে মাটির উপরে কুমীররা সব কেমন অলসভাবে শুয়ে পড়ে থাকে। আমার বন্ধুরা উঁচু মন্দিরের চূড়ার উপর বাসা তৈরী করছে। গোলাপী ও সাদা রঙের ঘুঘুরা তাদের বাসা তৈরী করা দেখছে ও কুঁ কুঁ করে আনন্দ ধ্বনি করছে। প্রিয় যুবরাজ, আমায় যেতেই হবে। আমি তোমাকে কখনো ভুলবো না। আসছে বসন্ত কালে আমি তোমার জন্য দুটী সুন্দর রত্ন নিয়ে আসব। তুমি যে চুনিটী গরীব স্ত্রীলোকটীকে দিয়েছ আমি তার চেয়ে ঢের বেশী লাল একটি চুনী, আর তোমার হীরার চেয়ে বড় ও উজ্জ্বল একটী হীরা নিয়ে আসব।"

দুখী যুবরাজ বলিল, "বন্ধু, ঐ দেখ ঐ বাগানে একটী ছোট মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। সে যত দেশালাই বিক্রয় করতে এনেছিল সব রাস্তার নর্দ্দামায় পড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আজ যদি সে বাড়ীতে একটীও পয়সা না নিয়ে যেতে পারে তবে তার বাবা তাকে খুব মারবে। বন্ধু আমার, আর একটী চোখ তুলে নিয়ে তুমি তাকে দাও, তাহলে তার বাবা তাকে আর মারবে না।"

সোয়ালো বলিল, "আমি তোমার কাছে আর এক রাত্রি থাকছি কিন্তু আমি তোমার আর একটী চোখ কখনো তুলতে পারব না, তুমি যে তা হ'লে একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে।"

যুবরাজ বলিল, "সোয়ালো, আমি যা বলেছি তাই কর।"

সোয়ালো তখন যুবরাজের আর একটী চোখ

তুলিয়া লইয়া সেই মেয়েটির নিকট উড়িয়া গেল। তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়া হাতের মধ্যে হীরাটি ফেলিয়া দিল। "কি সুন্দর কাঁচের টুকরাটী!" এই বলিয়া আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে সে দৌড়িয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল।

তারপর সোয়ালো যুবরাজের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল "তুমি এখন অন্ধ হয়ে গিয়েছ, আমি আর তোমাকে ছেড়ে যাব না।"

যুবরাজ ব্যথিত স্বরে বলিল, "না, সোয়ালো, সে কি হয়? তুমি মিশরে নিশ্চয়ই যাবে।"

"আমি তোমার কাছে চিরকালই থাকব" এই বলিয়া সোয়ালো যুবরাজের পায়ের তলায় ঘুমাইয়া পড়িল।

পরের দিন সমস্ত দিন সোয়ালো যুবরাজের কাঁধের উপর বসিয়া সে যে সব দেশ দেখিয়াছে তাহার গল্প বলিতে লাগিল। নীল নদীর তীরে লাল পাখীগুলি কেমন সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সোনার রঙের মাছ ধরে, সে তাহাদের গল্প যুবরাজকে বলিতে লাগিল। মরুভূমিতে যে বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন দৈত্য থাকে, সে সকলের সব কথা জানে; সারি সারি উটের পাশে পাশে সওদাগরেরা হাতে মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ধীরে ধীরে হাঁটিয়া যায়; তালগাছে একটা প্রকাণ্ড সবুজ রঙের সাপ আছে, তাহাকে কুড়ি জন পুরোহিত প্রত্যহ পিঠা খাওয়ায়; সে দেশে কেমন ছোট্ট ছোট্ট একদল মানুষ আছে, তাহারা কেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চওড়া পাতার উপর বসিয়া হ্রদে বেড়ায় আর প্রজাপতিদের সহিত খেলা করে। এই সব গল্প করিতে লাগিল।

যুবরাজ বলিল, "প্রিয় বন্ধু সোয়ালো, তুমি আমাকে খুব বিস্ময়জনক গল্প বলছ। কিন্তু সকলের চেয়ে বিস্ময়জনক ও রহস্যময় জিনিষ হচ্ছে পৃথিবীর নরনারীর দুঃখ কষ্টের ইতিহাস। দুঃখের মত এমন রহস্যপূর্ণ বিষয় আর নেই। বন্ধু, তুমি এই সহরের উপর দিয়ে উড়ে বেড়াও আর যা যা দেখ সব আমাকে এসে বল।"

তারপর সোয়ালো সেই মহানগরীর উপর দিয়া উড়িয়া উড়িয়া সব দেখিতে লাগিল। সে দেখিল ধনীরা সব তাহাদের সুন্দর সুন্দর প্রাসাদে আমোদ প্রমোদ করিতেছে আর গরীবরা তাহাদের তোরণদ্বারে বসিয়া একমুষ্টি অন্নের জন্য চেঁচাইয়া মরিতেছে। সে অন্ধকার গলি ঘুঁজির মধ্যে উড়িয়া গিয়া দেখিল অনাহারে শীর্ণ পাংশুবর্ণের ছেলেমেয়েরা কাতরভাবে অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার রাস্তার উপর বসিয়া আছে।

এক ধনীর প্রাসাদের গাড়ী-বারাণ্ডার নীচে ঠাণ্ডা শানের উপর দুটী ছোট ছেলে গলাগলি হইয়া শুইয়া আছে। শীতে তাহাদের ঠোঁট নীল হইয়া গিয়াছে। "আমাদের বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে যে!" এই বলিয়া তাহারা কাঁদিতে লাগিল। পাহারাওয়ালা আসিয়া বলিল, "তোরা এখানে শুয়ে আছিস কেন? বেরো এখান থেকে!"

তাহারা উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া গেল।

সোয়ালো রাজপুত্রকে গিয়া সহরের দুঃখের কথা সব বলিল।

রাজপুত্র বলিল, "আমার সর্ব্বাঙ্গ পাতলা সোনার পাত দিয়ে মোড়া রয়েছে। তুমি একটু একটু করে এই পাত তুলে নিয়ে গিয়ে আমার এই সব গরীব দুঃখী ভাইদের দাও। মানুষরা সর্ব্বদাই ভাবে যে সোনাই তাদের সুখী করতে পারে।"

সোয়ালো যুবরাজের গায়ের সোনার পাত

টুকরা টুকরা করিয়া তুলিয়া লইতে লাগিল। শেষে যখন একটীও পাত রহিল না তখন সুখী যুবরাজকে কদাকার ও বিশ্রী দেখাইতে লাগিল। সে সেই পাতগুলি আনিয়া গরীব দুঃখীদের দান করিতে লাগিল আর শিশুদের মুখ স্বাস্থ্যের গোলাপী আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল, নারীদের মুখে হাসি ফুটিল, বৃদ্ধদের শেষ দিনগুলি আরামের হইল। বালকবালিকারা রাস্তায় ছুটাছুটি করিয়া খেলিতে লাগিল। তাহারা আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "আমরা এখন ক্ষিদের সময় পেট ভরে খেতে পাচ্ছি।"

এদিকে শীত ক্রমেই তীব্রতর হইল, বরফ পড়িতে লাগিল, রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর, গাছপালা, সব সাদা হইয়া গেল। বেচারী সোয়ালোর ক্ষুদ্র দেহখানি ক্রমেই ঠাণ্ডা হইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু সে যুবরাজকে ছাড়িয়া গেল না। তাহাকে সে বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। সে খাবারওয়ালার দোকানের সম্মুখ হইতে খাবারের টুকরা কুড়াইয়া লইয়া খাইয়া খাইয়া কোন রকমে জীবন ধারণ করিতে লাগিল।

তারপর একদিন আসিল, যে দিন সে বুঝিল যে, তার মৃত্যু নিকটে। তাহার শরীরে তখন আর শক্তি ছিল না। সে অতিকষ্টে সুখী যুবরাজের পিঠের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "বিদায়, প্রিয় যুবরাজ, আমাকে তোমার হাতে চুমু খেতে দেবে কি?"

যুবরাজ বলিল, "প্রিয় বন্ধু সোয়ালো, আজ তুমি তোমার প্রিয় মিশর দেশে যাচ্ছ জেনে বড় সুখী হলাম। তুমি আমার কাছে অনেক দিন ছিলে, আমি তোমাকে খুব ভালবেসেছিলাম। বন্ধু, এই শীতে তুমি তোমার প্রাণ হারাইবার ভয় সত্ত্বেও আমার গরীব ভাইদের সাহায্য করে কত উপকার করেছ। আজ তবে বিদায়।"

সোয়ালো বলিল, "না বন্ধু, আমি মিশরে যাচ্ছি না। আমি মরণের দেশে যাচ্ছি। মরণ ত ঘুমের ভাই, না বন্ধু?"

এই কথা বলিয়া সোয়ালো সুখী যুবরাজকে চুম্বন করিয়া তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

ঠিক সেই সময়ে মর্ম্মর মূর্ত্তির ভিতরে চড়চড় করিয়া কি ফাটিয়া যাইবার মত শব্দ হইল। মূর্ত্তির ভিতরে যে শিসার হৃৎপিণ্ড ছিল তাহা দুখানা হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তখন ভয়ানক বরফ পড়িতেছিল।

পরের দিন প্রাতঃকালে নগরপাল কয়েকটি ভদ্রলোককে লইয়া সেই মর্ম্মর মূর্ত্তির নিকট দিয়া যাইতে যাইতে তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! সুখী যুবরাজের সেই সুন্দর সোনার পাত দিয়ে মোড়া দেহ, তরবারির সেই নীল চুনী, সেই হীরার চোখ দুটী কোথায় গেল! এখন সুখী যুবরাজকে কি কদাকার দেখাচ্ছে! ঠিক ভিখারীর মত! আর দেখ একটা মরা পাখী এর পায়ের তলায় পড়ে রয়েছে। এ সব নোংরা জিনিষ কি করে এখানে এল!"

নগরপালের আদেশে সুখী যুবরাজের মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টের অধ্যাপক বলিলেন, "মূর্ত্তিটীর সৌন্দর্য্য যখন নাই, তখন তার আর দরকারও নাই।"

তারপর তাহারা মূর্ত্তিটীকে আগুনে গলাইয়া ফেলিল। কিন্তু ঐ ভাঙ্গা শিসার হৃৎপিণ্ডটি কিছুতেই গলাইতে না পারিয়া রাস্তার জঞ্জালের উপর ফেলিয়া দিল। সেখানে মরা সোয়ালো পাখীটাও পড়িয়া ছিল।

ঈশ্বর তাঁহার একটী দেবদূতকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই সহরের সব চেয়ে মূল্যবান দুটি জিনিষ এনে দাও।"

দেবদূত তাঁহাকে সেই মরা সোয়াল পাখী ও শিশার ভাঙ্গা হৃদপিণ্ডটি আনিয়া দিল।

ঈশ্বর বলিলেন, তুমি ঠিক চিনে এনেছ দেখছি। আমার নন্দন কাননে এই পাখীটী চিরকাল গান করবে আর এই সুখী যুবরাজ আমার কাছে থেকে চিরকাল আমার স্তুতিগান করবে।"

প্রিয় বালক বালিকারা, বল ত এই গল্পটী হইতে কি উপদেশ পাইলে? *

শ্রীকুমুদিনী বসু বি, এ,

* ইংরাজী হইতে।

ধাঁধা

১। এমন একটা জিনিষের নাম কর, যা গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যায় কিন্তু গাড়ীর কোন কাজে লাগে না। অথচ সেটা ছেড়ে গাড়ী চলতে পারে না।

২। একটা মোটরবাস ভাড়া করে এক দিদিমা, তিন মা, দুই মাসী, চার বোন, দুই ভাই, চার মেয়ে, দুই ছেলে, চার মাসতুত ভাইবোন, দুই বোনঝি দুই বোনপো, দুই নাতনী, আর দুই নাতি নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছিল। বল ত সেই মোটর বাসে সবশুদ্ধ কত জন লোক ছিল?

৩। তিন অক্ষরে নাম মোর জানে সর্ব্বজন।
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে সুখেতে ভক্ষণ।
মধ্যম ছাড়িলে উঠে মধুর ঝঙ্কার।
শেষ ছেড়ে লোকমুখে শুধু হাহাকার।

মুকুলের গ্রাহকগ্রাহিকাদের মধ্যে যাহারা তিনটী ধাঁধাঁর ঠিক উত্তর দিতে পারিবে তাহাদের নাম আগামী সংখ্যায় বাহির হইবে।

প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মুকুল

—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭—

বালকবালিকাদের সচিত্র মাসিকপত্র

শ্রীবাসন্তী চক্রবর্তী বি-এ, কর্ত্তৃক
সম্পাদিত

মুকুলের লেখক-লেখিকাগণ

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু, রায় বাহাদুর জলধর সেন, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডাঃ বনোয়ারীলাল চৌধুরী প্রমুখ।

—বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র—

—ঠিকানা—

২৯৪নং দর্গা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা

বিষয়-সূচী

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৭

মুকুলের নিয়মাবলী

১। মুকুল বাংলা মাসের ৭ই তারিখে বাহির হয়।

২। মুকুলের বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। ভি-পিতে দুই টাকা চারি আনা। প্রতি সংখ্যা তিন আনা। বৎসরের মধ্যে যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু বৈশাখ মাস হইতেই কাগজ লইতে হইবে।

৩। ছেলে-মেয়েদের লেখা মুকুলে বাহির হইবে। লেখা মনোনীত না হইলে তাহা ফেরত দেওয়ার জন্য ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। ধাঁধাঁর সঙ্গে উত্তর লিখিয়া না দিলে তাহা প্রকাশিত হয় না।

৪। পত্র লিখিলে বিজ্ঞাপনের হার জানান হয়।

পুরাতন গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

যাহারা মুকুলের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা পাঠাইয়া দেন নাই, অনুগ্রহপূর্ব্বক জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে তাঁহারা মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে তাঁহাদের মূল্য না পাইলে আষাঢ় মাসের মুকুল ভি পি তে পাঠান হইবে না।

মুকুল কার্য্যাধ্যক্ষ—২৯৪নং দর্গা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা

জীবন-তরু

শিল্পী—শ্রীমুকুলচন্দ্র দে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

১৩০২ সনে প্রবর্ত্তিত

"ছোট প্রাণে আমাদের, দাও ভালবাসা,
ছোট ছোট মুখে দাও স্বরগের ভাষা।"

৩য় বর্ষ] (নবপর্য্যায়) জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ [২য় সংখ্যা

আশীষ

ফুল যে ফুটে ফুল হয়
আশীষ কোন একের নয়---
ওই যে বনের দীন
যেমন-তেমন ফুল
রূপে হীন বাসে হীন
নাই জানা যার কূল,
বহুর আশীষ শিরে বয়
ফুল না তবেই ফুল হয়?
আশীষ আছে,
সারাটা রাতের

আশীষ আছে
সারাটা দিনের
আশীষ আছে,
রোদ বাতাসের
মেঘের জলের
আশীষ আছে,
নীল আকাশের
মাটির রসের
বহুর আশীষ শিরে বয়
ফুল না তবেই ফুল হয়?

শ্রীহিমাংশু প্রকাশ রায়

ধান ভানানীর ছেলে ক্রোড়পতি

১২৫৪ সালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসত মহকুমার শ্বেতপুর গ্রামে সৎচাষী বংশে শ্যামাচরণ বল্লভ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালাচাঁদ বল্লভ ও মাতার নাম কমলা বালা।

সৎচাষী সম্প্রদায়ের নাম তোমরা শুনিয়াছ কি? ইহারা চাকুরী করে না। নানারূপ ব্যবসা ও কৃষিকার্য্যের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে। শ্যামাচরণের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্যবসায়ে প্রভূত ধন লাভ করিয়াছিলেন; তখন তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থাও ভাল ছিল। কিন্তু শ্যামাচরণের জন্মের পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়াতে অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হয়। শ্যামাচরণের পিতা কালাচাঁদ বল্লভ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। কালাচাঁদ বল্লভ প্রায় সকল সময়েই ভগবানের নামে ডুবিয়া থাকিতেন। কীর্ত্তন শুনিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেন না, সমস্ত কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া সেখানে উপস্থিত হইতেন এবং তন্ময় হইয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতেন।

একবার তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সাংঘাতিক রোগ হয়। তিনি পুত্রের সেবার জন্য কার্য্যস্থান হইতে আসিয়া বাড়ীতে ছিলেন। পুত্রটির অবস্থা অতি খারাপ—মৃত্যু পথের যাত্রী। এমন সময় নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম হইতে সুমিষ্ট কীর্ত্তন গান শুনিতে পাইলেন। তিনি তখন বাহিরে আসিয়া শুনিলেন একজন সাধু হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি তখনি সেখানে চলিয়া গেলেন। সেখানে কীর্ত্তন করিতে করিতে, পুত্রের যে চির জন্মের মত ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে তাহা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। এদিকে দুপুর বেলা অতীত হইয়া গেল। তিনি তখনও কীর্ত্তনে মগ্ন, আর পুত্রটীর মৃত্যু হইল। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। যে বাড়ীতে কীর্ত্তন হইতেছিল সেই বাড়ীর কর্ত্তা তখন তাঁহাকে বাড়ী যাইতে বলিলেন। বাড়ী পৌঁছিবার আগে দূর হইতে কান্নার শব্দ শুনিয়া তিনি বিপদের কথা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি একটুও শোকার্ত্ত না হইয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন "ভগবান্ তাকে দিয়েছিলেন তিনিই তাকে নিলেন। কেঁদে কি হবে, কাঁদলেত তাকে পাওয়া যাবে না।" এই বলিয়া তিনি পুত্রের সৎকারের সব বন্দোবস্ত করিলেন এবং কীর্ত্তনের দলকে মৃত দেহের সঙ্গে ভগবানের নাম গান করিতে করিতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাহাই হইল! তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী ও ভক্ত ছিলেন।

কালাচাঁদ বল্লভ ও তাঁহার স্ত্রী দুই জনেই দুঃখীর দুঃখ মোচনে সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহাদের সামান্য আয় হইতে দান করিতে তাঁহারা কখনও কুণ্ঠিত হন নাই! এজন্য শ্যামাচরণের পিতার ব্যবসায়ে কোন উন্নতি হয় নাই। কোন অতিথি ও ভিক্ষুক তাঁহার বাড়ী হইতে ফিরিয়া যায় নাই। এমন দানশীল ও ঈশ্বর ভক্ত পিতা মাতার সন্তান যে ঐ সকল সদ্‌গুণের অধিকারী হইবেন সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে?

এই ঘোর দরিদ্রতার সময় আত্মীয় স্বজন কেহই কালাচাঁদকে কোনরূপ সাহায্য করিতেন

না। কাঁলাচাঁদ বল্লভ হাটে সামান্য জিনিষ বিক্রয় করিতেন আর তাঁহার স্ত্রী প্রতিবাসীর বাড়ীতে ধান প্রভৃতি ভানিয়া অতিকষ্টে সংসার চালাইতেন। কালাচাঁদ বল্লভ কখন মিথ্যা কথা বলেন নাই এবং এত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও তাঁহার মুখ সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকিত। তাঁহার মিষ্ট ব্যবহারে গ্রামের সকলে তাঁহাকে ভালবাসিত। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে ভাঙ্গা চালা ঘরের মধ্যে বৃষ্টির জল পড়িতেছিল এবং তাঁহার স্ত্রী ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কোলে করিয়া সারারাত বসিয়া কাটাইয়াছিলেন। তাহাদের এমন দুরবস্থা ছিল।

দুঃখ কষ্টের মধ্যে শ্যামাচরণ বড় হইতে লাগিলেন। শ্যামাচরণকে উপযুক্ত পরিমাণে দুধ দিবার অর্থ পিতামাতার ছিল না। কালাচাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভুবনমোহন সামান্য কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহাদের অবস্থা একটু স্বচ্ছল হইল। তখন তাঁহারা ভুবনমোহনের বিবাহ দেন। সে সময় শ্যামাচরণের বয়স দুই বৎসর।

কালাচাঁদ বল্লভের অন্যান্য ভাইদের অবস্থা ভাল ছিল। কতদিন কালাচাঁদ স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ অনাহারে দিন কাটায়াছেন কিন্তু ভাইরা ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করেন নাই। এজন্য তাঁহারা ভাইদের উপর বিরক্ত হন নাই। পরে ঈশ্বর কৃপায় যখন তাহাদের অবস্থা ভাল হইয়াছিল তখন শ্যামাচরণের মাতা তাঁহার দেবরদের জন্য বাড়ী তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন। অপ্রেমকে প্রেমের দ্বারা জয় করিয়াছিলেন। এমন মা বাপের সন্তান বলিয়াই শ্যামাচরণের মন এত উদার ও মহৎ হইয়াছিল।

শ্যামবাজারে বেলগাছিয়া হইতে খালের পুল পার হইয়া কলিকাতার দিকে আসিতে পুলের নীচে দক্ষিণ দিকে কালাচাঁদ বল্লভের ভ্রাতার দোকান ছিল। সে দোকান হইতে কালাচাঁদকে তাঁহারা তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু পরে শ্যামাচরণ সেই রাস্তারই উত্তর সীমায়, প্রাসাদের মত বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার জেঠা মহাশয় ও কাকাদের সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্য করিতেন।

শ্যামাচরণের বয়স যখন ৫ বৎসর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বয়স ১৯।২০ বৎসর তখন তাঁহার পিতা ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া পরলোকে গমন করেন। তখন সেই গ্রামে বহুলোক ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে তাহাদের সাংসারিক অবস্থা খারাপ ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র ভুবনমোহন যে সামান্য কিছু উপার্জ্জন করিতেন এবং মাতা ধান ভানিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহা দ্বারা খাওয়া পরা চলিত। এই শোকের মধ্যেও সন্তানদের ভরণপোষনের জন্য মাতাকে স্থির চিত্তে কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইয়াছিল।

শ্যামাচরণের বয়স যখন ৯ বৎসর তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভুবনকে ম্যালেরিয়া জ্বর আক্রমণ করিল। ক্রমে ভুবন মোহন শয্যাশায়ী হইলেন ও শীঘ্রই মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন। তখন তাঁহার মাতার দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। এমন ঘোর বিপদেও কোনও আত্মীয় স্বজন তাঁহাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন না। শ্যামাচরণের মধ্যম ভ্রাতা রাম বল্লভ তখন প্রতিবাসীর বাড়ীতে সামান্য সামান্য কাজ করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখের উপর দুঃখ, শোকের উপর শোক আসিল, রামবল্লভ ও ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া ৮।৯ মাস মধ্যে দেহ ত্যাগ করিলেন।

তখন শ্যামাচরণের মাতা যেন শোকে দিশাহারা হইলেন। একদিকে শোকের উপর, শোকের আঘাত বুককে পিষিয়া দিতেছে অন্যদিকে বিধবা পুত্রবধূ দুটীও বালকের সম্পূর্ণ ভার তাঁহারই উপর। তখন বিপদের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় একমাত্র ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া, মাতা নিজে অধিক পরিশ্রম করিয়া অন্নের সংস্থান করিতে লাগিলেন।

কোন দিন তাঁহাদের আহার জুটে কোনদিন জুটে না—তাহাদের খড়ের ঘর আর মেরামত করা হয় না। বর্ষাকালে তাহার ভিতর দিয়া জল পড়ে, এরূপ অবস্থায় শ্যামচরণের মাতা কাহারও নিকট সাহায্য ভিক্ষা করেন নাই। তিনি এমন তেজস্বিনী ছিলেন।

সেই সময়ে আর এক বিপদ আসিল। সেই বৎসর বর্ষাকালে ঐ গ্রামে প্রবল বান আসিল এবং শ্যামচরণদের খড়ের ঘরটী বানের জলে ভাসিয়া গেল। এখন তাঁহারা গৃহহীন হইলেন। দরিদ্র ও নিরাশ্রয় গৃহহীন লোকের যে কি কষ্ট শ্যামাচরণ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন এবং জীবনে কখনও তাহা ভুলেন নাই। পরে যখন শ্যামাচরণ কোটিপতি হইয়াছিলেন তখন যদি কোন গৃহশূন্য ও বিপদাপন্ন ব্যক্তি সাহায্য চাহিত, তিনি তখনই মুক্তহস্তে তাহাকে সাহায্য করিয়াছেন।

গৃহহীন হইয়া শ্যামাচরণের মাতা এক প্রতি-বাসীর বাড়ীতে বাধ্য হইয়া আশ্রয় লইলেন। এমন কঠোর দুঃখ বিপদের কথা শুনিতে পাইয়া শ্যামাচরণের মাতুল মহাশয়ের দয়া হইল। তিনি তখন নিজে আসিয়া তাঁহার বোন ও ভাগিনাদের ধান্যকুড়িয়ায় আপনার বাড়ীতে লইয়া গেলেন।

শ্যামাচরণের মামাদের একটি বড় দোকান ছিল। তাঁহারা চরকার সূতার ও অন্যান্য ব্যবসা করিতেন। তাঁহাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল।

শ্যামাচরণ ধান্যকুড়িয়ায় আসিয়া সেখানে পাঠশালায় ভর্ত্তি হইলেন। শ্যামাচরণ যখন নিজ গাঁয়ে শ্বেতপুরে ছিলেন, তখনও তাঁহার সামান্য অক্ষর পরিচয় হইয়াছিল ও সটকিয়া কড়াকিয়া শিখিয়াছিলেন। মামার বাড়ীতে থাকিয়া তিনি ২।৩ বৎসর পাঠশালায় গিয়াছিলেন। তাঁহার লেখাপড়া শিখা এইখানেই শেষ হইল।

শ্যামাচরণ গান করিতে পারিতেন। তাঁহার গলাটি মিষ্ট ছিল। লোকে তাঁহার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইত। বাল্যকাল হইতে শ্যামাচরণের এই একটি প্রধান গুণ ছিল যে কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া কখন খেলায় যোগ দিতেন না। তিনি পড়া শেষ না করিয়া অন্যান্য বালকদের সঙ্গে আমোদ করিতেন না এই স্বভাবটা জীবনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে কাজটী যখন করিতেন তাহাতে মগ্ন হইয়া যাইতেন।

পড়াশুনা ছাড়িয়াদিয়া তিনি পাট হইতে সূতা তৈয়ার করিবার কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই তাঁহার প্রথম কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ। তখন বাঙ্গলা দেশে চটের কল ছিল না। লোকেরা পাট হইতে সূতা তৈয়ারী করিয়া, ঘরে তাঁতে চট বুনিত। শ্যামাচরণের সুতা অন্যান্য সকলের সুতার চেয়ে সুন্দর হইত, সেজন্য উহা বেশী দামে বাজারে বিক্রয় হইত। সূতা তৈয়ারীর সময়ে অন্যান্য লোকেরা কত গল্প করিত, কিন্তু বালক শ্যামাচরণ একমনে তাঁহার কাজটি করিয়া যাইতেন।

পরের গলগ্রহ হইয়া জীবনযাপন করা কষ্টকর ইহা বালক শ্যামাচরণ মাতার কথাবার্ত্তায় বুঝিতে

পারিয়া অনিচ্ছাসত্বে পড়া ছাড়িয়া উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মাতার মলিন মুখ দেখিলে তাঁহার কষ্ট হইত। তাঁহার মামারাও মনে করিয়াছিলেন ইহার দ্বারা কিছু উপার্জ্জন করিলে সংসারের সাহায্য হইবে। তাঁহার মামাদের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র গাইন সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিলেন।

শ্যামাচরণের মামারা নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে শ্যামাচরণকে বাজার করিতে ও গরুর সমস্ত কাজ করিতে হইত। তিনি গরুগুলিকে মাঠে চরাইতেন। অবসর সময়ে পাট হইতে সূতা তৈয়ারী করিতেন। তিনি বাল্যকালেও বৃথা সময় নষ্ট করেন নাই, তাস পাশা প্রভৃতি খেলায় কখন যোগ দেন নাই।

শ্যামাচরণ রোজ মামাদের বাজার করিতেন। তিনি দেখিলেন যে কতগুলি অনাবশ্যক জিনিষ বৃথা ক্রয় করা হয়। তিনি তাহা বন্ধ করিয়া দুই বৎসরে দেড় শত টাকা জমাইয়া ছিলেন। এ কথা কেহই জানিতেন না। একবার তাঁহার মামার হঠাৎ টাকার বিশেষ দরকার হয় কিন্তু কাহারও নিকট হইতে তখন টাকা না পাইয়া খুব চিন্তিত হন। শ্যামাচরণ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলেন "আপনি টাকার জন্য ভাববেন না। আমরে কাছে দেড়শ টাকা আছে। মামা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে শ্যামাচরণ কিরূপে ঐ টাকা জমাইয়াছে। মামা তাহার মিতব্যায়িতা ও সততা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এই অল্প বয়স হইতে যে শ্যামাচরণ লোভ দমন করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া মামা বুঝিলেন যে এ বালকের ভবিষ্যত উজ্জ্বল।

শ্যামাচরণ ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মামার দোকানে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। দোকানের কাজ ছাড়া তাহাকে দুই বেলা ৭।৮ জনের জন্য রান্না করিতে হইত। দোকানে কাজ করিবার সময় তিনি এমন সুন্দর ভাবে হিসাব রাখিতে শেখেন ও এমন নূতন প্রণালীতে হিসাব লেখেন, যে কাহারও এক পয়সা চুরি করিবার সাধ্য ছিল না। অথচ সেই হিসাবে একটুও ভুল থাকিত না।

শ্যামাচরণ তাঁহার একমাত্র ছোট ভাই রঘুনাথকে চিরকাল খুব ভালবাসিতেন, যতদূর সম্ভব তাহাকে সুখে রাখিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। নিজে যে দামের কাপড় পরিতেন তাহা হইতে বেশী দামের কাপড় জামা ইত্যাদি ছোট ভাইকে দিতেন।

২০ বৎসর বয়সে শ্যামাচরণ তাঁহার মামার সহিত কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাদের কারবারে যোগ দিলেন। তিনি যে কাজে হাত দিতেন, অনেক পরিশ্রম করিয়া সে কাজ সম্বন্ধে সমস্ত খোঁজ খবর লইয়া পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন। সেজন্য পরে তিনি ব্যবসায় এত উন্নতি এবং প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি যেমন পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, তেমনী উৎসাহী সরল, সত্যবাদী ও সচ্চরিত্র ছিলেন। কখনও একটী পয়সাও মনিবকে না বলিয়া লন নাই। তাঁহার কার্য্যের দ্বারা কারবারের কখন লোকসান হয় নাই।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি তাঁহার মামার পাটের কারবারে প্রবেশ করেন। একবার এক জন মাড়োয়ারীর নিকট মাল বিক্রয় করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। অন্য একজন মাড়োয়ারী হাজার টাকা বেশী দিয়া সেই মাল ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন,কিন্তু যুবক শ্যামাচরণ বলিয়াছিলেন "আমি যখন একজনের কাছে বিক্রী করব বলে কথা দিয়েছি. তখন এ মালে যত টাকাই লাভ

হোক আমার কথা ফিরাব না। আপনি ইচ্ছা করলে তার কাছ থেকে মাল কিনে নিতে পারেন।" এই মাল বিক্রয় করিয়া তিন হাজার টাকা লাভ হইয়াছিল। ইচ্ছা করিলে শ্যামাচরণ সে টাকার কথা কর্তৃপক্ষদের না বলিলেও পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। কর্তৃপক্ষরা তাঁহার সাধুতা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন।

যুবক শ্যামাচরণের নানা সদগুণে মুগ্ধ হইয়া পাট ইত্যাদি ব্যবসায়ের আর এক অংশীদার তাঁহার কন্যার সহিত শ্যামাচরণের বিবাহ দেন, তখন শ্যামাচরণের বয়স ২৬ বৎসর।

শ্যামাচরণের মাতাকে তাঁহার ভ্রাতার সংসারের প্রায় সমস্ত কাজই--ধান ভানা, রান্না করা, গরুর কাজ—করিতে হইত। তিনি অতি কষ্টে দিন কাটাইতেছিলেন কিন্তু শ্যামাচরণকে তাঁহার কষ্টের কথা ঘুণাক্ষরেও জানান নাই। শ্যামাচরণ কোন ক্রমে তাহা জানিতে পারিয়া রাত্রি দিন ভাবিতে লাগিলেন মার কষ্ট কি করিয়া দূর করেন। মামার কারবারে কাজ করিতেন কিন্তু মাহিনা ত লইতেন না, শুধু তিনি খাওয়া পরা পাইতেন। তিনি তখন মামার কার্য্য ছাড়িয়া পাটের আড়তে কর্ম্ম লইলেন। পরে সামান্য ভাবে নিজেই পাটের ব্যবসা আরম্ভ করিলেন।

শ্যামাচরণ স্বাধীন ভাবে ব্যবসা আরম্ভ করাতে তাঁহার মামা তাঁহার উপর খুব বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মাতাকে নানা কঠিন কথা বলিতেন। মামার এরূপ ব্যবহার দেখিয়া বাড়ীর আর সকলেই শ্যামাচরণের মাতাকে নানারূপে অপমান করিতে লাগিলেন।

শ্যামাচরণ অন্যের নিকট হইতে এ সংবাদ পাইয়া ধান্য কুড়িয়ায় একটী পুরাতন বাড়ী কিনিলেন সেখানে মা ও স্ত্রী ও তাঁহার ভাই বাস করিতে লাগিলেন। চিরকাল মাতার সুখ সচ্ছন্দের প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল।

পরে শ্যামাচরণের উপর তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের সমস্ত কারবারের ভার পড়ে। তিনি সেই কারবারের অর্দ্ধেক অংশও পাইলেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে ও সততায় পাটের ব্যবসায়ের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। বল্লভ মার্কা পাটের বস্তা বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইল এবং বিদেশেও এই মার্কাযুক্ত পাটের আদর হইল।

তাঁহার মধুর বিনীত ব্যবহারে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, এমন কি গাড়োয়ান, মুটিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া খরিদ্দার প্রভৃতি সকলেই তাঁহার আচরণে কথা বার্ত্তায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

তিন বৎসর এই কাজ করিবার পর তাঁহার লক্ষ টাকা আয় হইল। এমন সময় তাঁহার মামার মৃত্যু হইল। তাঁহার মামা তাঁহার পুত্রদের সমস্ত ভার শ্যামাচরণের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত মনে দেহ ত্যাগ করিলেন।

শ্যামাচরণের উৎসাহে তাঁহার গ্রামে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ বহুকাল বিনা মাহিনায় পড়িত। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে ছাত্রদের নিকট হইতে কিছু মাহিনা লওয়া হইত। কিন্তু এখনও অনেক গরীব ছাত্র বিনা বেতনে ঐ স্কুলে পড়িতেছে। শ্যামাচরণের কারবার হইতে তাহাদের মাহিনা দেওয়া হয়।

পরে শ্যামাচরণ কাশীপুরে প্রায় ১৫।১৬ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া পাটের গাট বাধিবার কল স্থাপন করেন। তিনি ধান্য কুড়িয়ায় পুরান বাড়ী ভাঙ্গিয়া সেস্থানে প্রাসাদের ন্যায় প্রকাণ্ড

বাড়ী তৈয়ারী করিলেন। কলিকাতায় শ্যামবাজারে গ্যালিফষ্ট্রিটে আর এক মস্ত বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। কলিকাতায় অনেক জমী কিনিলেন। মাল বিদেশে লইবার জন্য একটী ষ্টিমার ও ৫০ খানি বোট কিনিলেন।

কোটিপতি হইয়াও তিনি কখন অসাধু ও বিলাসিতার পথে যান নাই। তাঁহার পুত্ররাও পিতা মাতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া দানশীল ও চরিত্রবান হইয়াছে। তাঁহার পুত্র পিতার নামে বসিরহাটে একটী হাঁসপাতাল করিয়া দিয়াছেন।

শ্যামাচরনের বৃহৎ বাড়ীতে সর্ব্বদাই শত শত লোক আহার করিত। তিনিও তাঁহার স্ত্রী দুই জনেই চিরকাল দুঃখী গরীব ও অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনে মুক্ত হস্ত ছিলেন।

শ্যামাচরণ তাঁহার গ্রামটিকে ভালবাসিতেন সেজন্য সহরে থাকিয়াও তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে ভুলেন নাই। তিনি গ্রামে ইংরাজি বিদ্যালয় টোল ও ডিসপেন্সারী খুলিয়াছিলেন। গরীব ছাত্রগণ সেই বিদ্যালয়ে আহার করিতে পাইত। শ্যামাচরণ তাহাদের কাপড় ও বই কিনিয়া দিতেন। বৎসরে অন্ততঃ পঞ্চাশটী ছাত্রের সমস্ত খরচ শ্যামাচরণ দিতেন। এ ছাড়াও অন্যান্য বিদ্যালয়েও গরীব ছাত্রদের তিনি সাহায্য করিতেন। নিজে বিদ্যালয়ে বিশেষ কিছুই শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু যাহারা বিদ্যাশিক্ষার্থী তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চিরকাল উৎসাহী ছিলেন। তিনি গ্রামবাসীদের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

শ্যামাচরণ তাঁহার বন্ধু বান্ধব ও আশ্রিতদের অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন। বন্ধুদের বিপদে তিনি সর্ব্বদাই সাহায্য করিতেন। একবার তাঁহার এক কর্ম্মচারীর খড়ের ঘর আগুনে পুড়িয়া যায়, তিনি সে খবর পাইয়া তাঁহার জন্য পাকা বাড়ী তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। মনিবের এত দয়া দেখিয়া সে কর্ম্মচারী অবাক হইয়া গিয়াছিল। দুঃখের সময়ে শ্যামাচরণকে আত্মীয় স্বজন কোন সাহায্য করেন নাই বা তাঁহার খোঁজ লন নাই। পরে তিনি ঈশ্বর কৃপায় ধনী হইলে তাঁহারা অনেকেই তাঁহার আশ্রয় লইয়াছিলেন।

অতিথি সেবা তিনি ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। তিনি তাঁহার বৃহৎ বাগানের তরকারী গ্রামের সকলকে দান করিয়া খুব সুখী হইতেন। এখন পর্য্যন্ত তাঁহার বাগানের তরকারী বাজারে বিক্রয় হয় না, গ্রামবাসীরা আগের মতই পায়।

তিনি খুব সাদা সিধা লোক ছিলেন, পোষাকে কোন আড়ম্বর ছিল না। নিজের যশ প্রচার করিতে তিনি ভালবাসিতেন না, সেজন্য তিনি নিজের ফটো কখন তুলেন নাই। তিনি যে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন তাহা সর্ব্ব সাধারণকে কখনও জানিতে দেন নাই।

গ্রামবাসীর জলকষ্ট দূর করিবার জন্য কত পুকুর কাটাইয়া দিয়াছেন ও ঘাটে সহজে নামিবার জন্য বাঁধান সিঁড়ি করিয়া দিয়াছেন।

তাঁহার হৃদয় এমনি উদার ছিল যে, মুসলমান জৈন ও খৃষ্টান যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাদের উৎসব ব্যয় কিম্বা মন্দির নির্ম্মাণের জন্য সাহায্য চাহিলে তিনি আনন্দের সহিত দিতেন। বসিরহাট সহরের নিকারী পাড়ার মসজিদ নির্ম্মাণের জন্য শ্যামাচরণ অনেক টাকা দিয়াছিলেন।

ভগবানের নাম শুনিতে শুনিতে শ্যামাচরণের চোখ দিয়া জল পড়িত। তিনি চিরকাল গরীব দিগকে দান করিয়া ভগবানের প্রিয় কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

প্রতি বৎসর পূজার সময় তিনি ১৩।১৪ হাজার

নরনারীকে অন্নবস্ত্র দিতেন। এই বাৎসরিক দান ছাড়া আর যে প্রাত্যহিক কত দান করিতেন তার হিসাব পাওয়া যায় না।

শ্যামাচরণ গ্রামে আসিলে সেখানকার যত গরীব লোক, তাহাদের এবার অভাব দূর হইবে মনে করিয়া, আনন্দিত হইত।

তোমরা অনেকে বোধহয় বেলগাছিয়ার কারমাইকেল কলেজের নাম শুনিয়াছ। সেই কলেজগৃহ নির্ম্মাণের জন্য শ্যামাচরণ ৫০০০ হাজার টাকা দিয়াছিলেন এবং বলিয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহার নাম যেন প্রকাশ না পায়। যে জমীর উপর হাঁসপাতালটী নির্ম্মিত হইয়াছে সে জমী শ্যামাচরণের ও তাঁহার কারবারের ও অন্যান্য অংশীর। শ্যামাচরণ বলিয়াছিলেন যে সেই জমীতে অন্যের অংশ না থাকিলে বিনা মূল্যেই তিনি জমী দিতেন, বাধ্য হইয়া জমীর মূল্য তাঁহাকে লইতে হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদের সাহায্যের জন্য দেড় লক্ষ টাকা ও তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধে আড়াই লক্ষ টাকা খরচ করাতে তিনি ঐ কলেজের জন্য আর বেশী অর্থ সাহায্য করিতে পারেন নাই।

এইরূপে বাঙ্গলার অনেক হিতকর কাজে তিনি সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে মানা করিয়াছিলেন সেজন্য সাধারণে সে কথা জানেন না।

১৮৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে খুলনা জেলার অন্তঃর্গত কয়েকটী গ্রামে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাদের গ্রামের ধনীদের নিকট হইতে কোন সাহায্য না পাইয়া অনেকে দলে দলে বসিরহাটে আসে। দানবীর শ্যামাচরণের দানের কথা শুনিয়া তাহারা ধান্যকুড়িয়ায় উপস্থিত হয়। শ্যামাচরণ তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার জমীতে অনেকগুলি ঘর উঠাইলেন। সেই ঘরে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকরা স্থান ও আহার পাইল। তাঁহার মা ও স্ত্রী এ সময়ে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। অনেক দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর চিকিৎসার ভারও লইয়াছিলেন।

হিন্দু, মুসলমান সকলেই সেই ঘরে আশ্রয় ও আহার পাইয়াছিল। কয়েকজন ব্রাহ্মণ হিন্দুদের জন্য ও একজন মুসলমান মুসলমানদের জন্য রান্না করিত। সব বন্দোবস্ত অতি শৃঙ্খলার সহিত করা হইয়াছিল। এই বিরাট অন্নদান ও আশ্রয়দান ও রোগীর সেবার কাজ ১৩০৩ সালের (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ) কার্ত্তিক মাসে আরম্ভ হইয়াছিল আর ১৩০৪ সালের ১৯শে মাঘ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

প্রথমে অতিথিশালায় দুই হাজার লোক প্রতিদিন আহার করিত, পরে ৩।৪ হাজার লোক একবেলা আহার পাইত। দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের আহারের জন্য, নিজে যে দামের চাল খাইতেন সেই চাল তাহাদের দিতেন। অনেক ভদ্র পরিবারও তাঁহার আশ্রয় লইয়াছিলেন। শিশুদের জন্য দুধ, বার্লি, সাগু প্রভৃতির বন্দোবস্ত ছিল। অনেক ভদ্র পরিবার সেই বিপদের সময় তাঁহার নিকট হইতে টাকা ধার লইয়াছিলেন কিন্তু সে টাকা আর তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে হয় নাই।

অজস্র টাকা এইরূপে ব্যয় করাতে তাঁহার কোন কর্ম্মচারী এই প্রকার ব্যয় কমাইতে বলিয়াছিলেন, তিনি তখন সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিলেন।

এমনও দেখা গিয়াছে যে ক্রোড়পতি শ্যামাচরণ এই দুর্ভিক্ষপীড়িত রোগীর মলিন

বিছানাধারে বসিয়া তাহার দেহে হাত বুলাইতে-ছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন প্রত্যেক মানুষই ভগবানের সন্তান। ইহাদের সেবা করিলে ভগবান সন্তুষ্ট হইবেন।

তিনি তাঁহার দাসদাসীদের অতি যত্ন করিতেন। তাহাদের সহিত এমন মধুর ব্যবহার করিতেন যে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। শ্যামাচরণের খাস চাকর এখনও জীবিত আছে, মনিবের কথা বলিতে গেলে দুঃখে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে।

শ্যামাচরণ বাল্যকালে কঠোর পরিশ্রম করিয়া ছিলেন শেষে তিনি তাঁহার স্নেহময়ী মাতা সাধ্বী-পত্নী ও সুপুত্র ও কন্যাদের লইয়া সুখে দিন কাটাইতে ছিলেন।

১৩০৫ সালে তাঁহার মাতা ১০৫ বৎসর বয়সে পরলোকে চলিয়া যান। শ্যামাচরণ তখন বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। শ্যামাচরণ মার সব ইচ্ছাই পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন সেজন্য তাঁহার এত উন্নতি হইয়াছিল। যখনই তিনি কোন নূতন কার্য্য আরম্ভ করিতেন তখনই মায়ের আশীর্ব্বাদ লইতেন। মাতার কোন আদেশ লঙ্ঘন করেন নাই, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন।

একমাস পরে মাতার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সেই উপলক্ষ্যে অন্যান্য বিরাট দানের সঙ্গে প্রায় ৪০ হাজার গরীবদের একটী করিয়া টাকা ও এক মালসা লুচি সন্দেশ দান করিয়াছিলেন, শুধু তাহাই নহে গরীবদের দুই-বেলা পরিতোষরূপে আহার করাইয়াছিলেন। তিনি পৌষের শীতে খালি পায়ে প্রায় সারারাত্রি সব কাজের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। তিনি যেন দেখিতেছিলেন যে পরপার হইতে তাঁহার মা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

যেদিন তাঁহারা হবিষ্যান্ন ছাড়িয়া আত্মীয় স্বজন মিলিয়া মাছ ইত্যাদি খাইতেছিলেন, খাইবার পর শ্যামাচরণ ভীষণ বমি করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্বর হইল, কত অভিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিলেন। কিন্তু তখন ভগবানের ডাক আসিয়াছিল আর কেহ তাঁহাকে এ পৃথিবীতে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

শ্রাদ্ধক্রিয়ার পর ৫ দিনের দিন কাহাকেও কোন কষ্ট না দিয়া তিনি অমরধামে চলিয়া গেলেন। এই নীরব দানবীর ও কর্ম্মবীরের জীবন শেষ হইল। গ্রামের গরীব দুঃখী সকলের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল।

তিনি ধনী হইয়াও নিরহঙ্কার সরল ও সাধু, সত্যবাদী ছিলেন। তিনি যাহা উপার্জ্জন করিয়া-ছিলেন তাহা নিজের সুখের জন্য ব্যয় না করিয়া, দুঃখীদের দুঃখ মোচনে খরচ করিয়াছিলেন। সার্থক তাঁহার ধনোপার্জ্জন, সার্থক তাঁহার জন্ম, এমন পুত্র পাইয়া "জননী কৃতার্থ হইলেন, কুল পবিত্র হইল।"

খেলা

ছেলেদের ছুটোছুটি তট বালুকায়,
হেসে খায় লুটো পুটি—কি কথা রটায় ;
ছায়া ছবি নেচে ফিরে আলো সাথী সনে ;
নীল পায়রার ঝাঁক সুনীল গগনে।
তারা দল ঘরে ফেরা পাখী,
এক সাথে সবে ওঠে ডাকি,
সাঁঝের বেলায়,
লুকোচুরি খেলে ফিরে ফিরে ;
চাঁদরে রবিরে ঘিরে ঘিরে
আকাশের গাছের তলায়।

এক খেলা চিরদিন ছেলেদের মত ,
নাচনের সুর ছাঁদ তেমনি নিয়ত
এনিখিলে দেখি বারে বারে,
গগনে ভুবনে পারাবারে
সকল মেলায়,
সেই সে পাতার বাঁশী বাজে,
তেমনি খেলনা সারি রাজে
নীলনভে, সাগর-বেলায়
খোলা মাঠে বন ছায়ে তটিনীর তীরে,
নাগর দোলায় কে যে দোলে ফিরে ফিরে ॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ট্যানটেলাস

প্রকাণ্ড পাহাড়—সিপাইলস। তার তলদেশে রাজ-অট্টালিকা ট্যানটেলাসের—বড়ই জমকাল। সে অট্টলিকা তৈরী ছিল না ইট পাথরে শুড়কী চূনে—গড়া ছিল মণি-মুক্তা সোনায়। যেমন নাচন-লীলা স্বর্ণরশ্মি সূর্য্যালোকের ঢেউয়ের উপর তার যে শোভা—তেম্‌নি শোভায় ঝল্‌সে যেতো সোনার আভায় সেই প্রাসাদের ছাদ। অস্তাচলে হেলার পথে দান যে করেন দিনমনি নেত্র লোভনরূপ পশ্চিমের পুঞ্জীভূত মেঘে সেই রূপেরই তুল্য-রূপে হতো উদ্ভাসিত স্তম্ভগাত্র যত অট্টালিকার ট্যানটেলাসের।

জ্ঞানী ছিলেন গুণী ছিলেন ধনী ছিলেন অনেক ধনে কুবের ছিলেন ট্যানটেলাস পশ্চিমের ফ্রিজিয় দেশের।

অনেক কাল রাজ্য করে ভালয় ভালয়, মন্দ পথে চালিয়ে দিলে সূক্ষ্ম বুদ্ধি তাঁর। উড়িয়ে দিলেন ধন, খুইয়ে দিলেন মান। বইলেন শিরে অপযশের মস্ত বড় বোঝা।

জুপিটারের দেউল। সেই দেব-দেউলকে চৌকী দিত একটি কুকুর অষ্টপ্রহর—নিদ্রাহীন নয়ন-পত্র তার। সেটির যেমনি রূপ তেম্‌নি গুণ—বেজায় হুসিয়ার। পরম প্রিয় জুপিটারের সেটি।

ট্যানটেলাস্ না ফন্দি এঁটে বন্ধু তাঁর প্যানডারসের সঙ্গে জুটে কুক্ষণেতে হরণ করেন কুকুরটিকে—দেবালয়ের অঙ্গন হতে। ছিঃ! ছিঃ! কি লজ্জার কথা!—শুনতে গেলে ধিক্কার আসে অন্তরে। দুষ্কৃতির এইটি হলো পয়লা নম্বর ট্যানটেলাসের।

দ্বিতীয় নম্বর দুষ্কৃতি তারপরেতে এইটি তাঁর :—

জিয়ুস ছিলেন দেবতাগণের রাজা। সেই জিয়ুস রাজের ভোজের গৃহে প্রবেশ করে, করলেন অপহরণ অমৃতকে পাত্র হ'তে—বসেছিল দেবতাগণের ভোজের সভা যখন। কিন্তু কেতুর মত পান করেন নি অমৃত কে হরণ করে নিজে সেজে স্বার্থপর! হরণ করেন মরণশীল মর্ত্তবাসী মানবগণকে দেবেন বলে। এইখানেতেই প্রভেদ রইল দুই চুরিতে অনেকটা। কিই বা তাতে আসে যায়—চুরির নামেই অখ্যাতি যে! চুরি মাত্রেই যশের ক্ষয়!

আরো তাঁর দুষ্কৃতি ছিল দুটি একটি জঘন্য।

সুদর্শন চক্র দিয়ে বিষ্ণু করলেন শিরশ্ছেদন দানব কেতুর, হরণ হেতু অমৃত—ভারতের পুরাণে আছে এমন সাজার কথা লেখা।

ট্যানটেলাসের সাজা যে, সে যে ভীষণ সাজা—কেতুর সাজা কোথায় লাগে। কেতুর জ্বালা এক নিমেষের—এক কোপেতেই গলা কঁ্যাচ। ঐখানেতেই জ্বালার শেষ।

ট্যানটেলাসের জ্বালা চিরকালের জ্বালা—জীবন ব্যাপী জ্বালার সাজা।

দ্যুলোকের আলোক হ'তে নামিয়ে এনে ভূমণ্ডলের সূর্য্যালোকে, সেখান হ'তে নামিয়ে এনে ফের পাতালতলের অন্ধকারে, ডুবিয়ে রাখলেন ট্যানটেলাসকে কৃষ্ণঘন সাগর-জলে জিয়ুস—রইল শুধুই মুণ্ডুটুকু ঠোঁট অবধি জেগে। আর মাথার উপর তাঁর ঝুলিয়ে দিলেন খুব নিকটে পক্ক পক্ক মিষ্টি ফল বৃক্ষশাখা পূর্ণ করে। আর দাঁড় করালেন সাগর-জলে অনেক উচ্চ পাহাড় এক। হেলিয়ে দিলেন ট্যানটেলাসের পানে—যেন পড়-পড় প্রতিক্ষণেই ঘাড়ের পরে। আর শিকল দিয়ে কোমর বেঁধে আচ্ছা ক'রে ক'শে, শিকলের অন্য মাথা জড়িয়ে দিলেন এঁটে পাহাড়-গায়ে—পালাবার পথটি হলো বন্ধ ট্যানটেলাসের।

জ্বালিয়ে দিলেন কণ্ঠ জিয়ুস ট্যানটেলাসের তৃষ্ণানলে। আর জঠর দিলেন অগ্নি-ক্ষুধায় জ্বালিয়ে তাঁর। সমান ভাবে জ্বলতে থাকলো তৃষ্ণা ক্ষুধার আগুন—তাদের হ্রাস ছিল না মুহূর্ত্তের।

আর্ত্ত হ'য়ে তৃষ্ণাতে ঠোঁট নামিয়ে চুমুক দিতে গেলেই সাগর-জল যেতো অনেক নীচে সরে—ভাটায় দিত বিষম জোরে জলকে ধ'রে টান। আবার মাথা তুল্লেই সোজা ক'রে ঠোঁটের কাছে আসতো উঠে জল বিষম জোরে জোয়ারের। আবার যেই চেষ্টা হ'তো চুমুকের তেম্নি সরতো জল নীচের পানে ভাটার টানে। এই ভাবেতেই ওঠা-নামা জলের, এই ভাবেতেই নিরাশ-আশার টানাটানি ট্যানটেলাসের চলতো বারে বারেই।

ক্ষুধার জ্বালায় খাবার জন্য হাত তুলতো উর্দ্ধে যেই ট্যানটেলাস, প্রাপ্তির আশায় পক্ক ফল বৃক্ষ হ'তে; অম্নি আচম্বিতে বাত্যা এসে উড়িয়ে নিতো ডাল—অনেক দূরে উপর দিকে। হাত নামাতো যেই নিরাশ হয়ে—থামতো ঝড়। আসতো নেমে ডাল ফলের বোঝা নিয়ে ফের নীচে, মাথার উপর তার। হাত তুল্লেই ঝড়ের দোলায় ফলগুলি সব উঠে যেতো ডালের সাথে উর্দ্ধে, আর হাত নামালেই তারই সঙ্গে নেমে আসতো ডাল ফলগুলিকে নিয়ে—ঝড়ের হতো শেষ। এই ভাবেতেই চলতো খেলা প্রতিবারেই প্রবল ঝড়ের, খিদের সাথে হাতের সাথে ট্যানটেলাসের।

পাহাড় ছিল এমন ভাবেই ঝুঁকে—যেন

পড়-পড়। কখন্ পড়ে কখন্ পড়ে মাথার উপর ভেঙে। কিন্তু কোনদিনই পড়লো না, তবু পড়ার ভয় জেগেই রইল সারাক্ষণই—তাইতে বুক দুরু-দুরু। ট্যানটেলাস তো মরলো না। রইল অমর হ'য়ে তৃষ্ণা নিয়ে ক্ষুধা নিয়ে চির-কালটি ধরে—ঐ পড়-পড় পাহাড়তলায় ভয়টি নিয়ে বুকে।

পশ্চিমের পুরাণ গ্রন্থে আছে উল্লিখিত এমন ভীষণ সাজার কথা ট্যানটেলাসের।*

শ্রীহিমাংশু প্রকাশ রায়

* এই গল্পটী গদ্যেপদ্যে নূতন ধরণে লেখা। একটু কায়দা করে পড়তে হবে। মুঃ সঃ।

জোছনা রাতে

(১)

আজ মধু মালতীর গন্ধে,
ভরিয়া গিয়াছে বন উপবন,
বহিছে শীতল মৃদু সমীরণ,
তটিনী ছুটিছে নাচিয়া নাচিয়া,
নবীন মোহন ছন্দে ;
নিশারাণী আজ হরষে আকুল,
হাস্না হানার গন্ধে।

(২)

আকাশ নীলিমা ভরা,
গন্ধরাজের গন্ধ লুটিয়া,
মলয় বহিছে থাকিয়া থাকিয়া,
গাহে যেন গান কি মোহন,
পরাণ পাগল করা।
আজি জ্যোৎস্নায় গিয়াছে প্লাবিয়া
শস্য শ্যামল ধরা।

(৩)

শ্রান্ত ধরার প্রাণ,
ঘুমে অচেতন আকাশ ভুবন,
নাহি কলরব স্তব্ধ বিজন।
শান্ত প্রকৃতি লভিছে বিরাম
থেমেছে পাখীর গান।
ভেসে আসে শুধু সকরুণ সুরে
ঝর্ণার কলতান।

(৪)

হাস্না হানার গন্ধে,
চাঁদ বুঝি আজ ধরা দিতে চায়,
উঁকি মারে মোর খোলা জানালায়,
আমারো হৃদয় উঠিছে নাচিয়া
আজিকে মধুর ছন্দে,
প্রকৃতির সনে আমারো পরাণ
আকুল বকুল গন্ধে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চারিটি গল্প

(৪) সওদাগর

এক ছিলেন সওদাগর। তিনি জাহাজে চড়িয়া নানা দেশে গিয়া বাণিজ্য করিতেন। এক দিন তিনি মাঝসমুদ্রে জলে পড়িয়া হাহাকার করিতেছেন ও বিধাতাকে নিন্দা করিতেছেন।

বিধাতা কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি যে, তুমি আমার এত নিন্দা করিতেছ? বল আমায় কি করিতে হইবে, এখনই তাহা করিতেছি।"

সওদাগর বলিলেন, "পরমেশ্বর! আমি কলিকাতা হইতে কতকগুলি জিনিস লইয়া চীন দেশে বিক্রয় করিতে যাইতেছিলাম। সিঙ্গাপুরের নিকট আসিতে না আসিতে আমার এক খালাসী মাতাল হইয়া জাহাজে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। ঐ দেখ, আমার জাহাজখানা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। আমার দামী জিনিসপত্র সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। আমি পুড়িয়া মরিবার ভয়ে জলে ঝাপ দিয়াছি। কিন্তু অকূল সমুদ্র! আর বাঁচিবার আশা কোথায়? আগুনে না হয় জলে, আমাকে মরিতেই হইবে। প্রভু! তোমাকে না লোকে ন্যায়বান ঈশ্বর বলে? কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমার জগতে ন্যায়-ধর্ম্ম কিছু নাই। একটা মাতাল খালাসীর দোষে আমার সকল সম্পত্তি ত গিয়াছেই; এখন জীবনটি পর্য্যন্ত যায়-যায়! একের দোষে অপরের দণ্ড;—এ তোমার কেমন বিচার?"

বিধাতা কহিলেন, "আমি মানুষকে সামাজিক জীব করিয়াছি। পরস্পরের কার্য্যের ফল ভোগ করিয়াই মানুষের এত সুখ-শান্তি ও উন্নতি। তুমি যখন আমার এই নিয়মে অসন্তুষ্ট, তখন তোমার পক্ষে এই নিয়ম স্থগিত করিয়া দিতেছি। যাও, তুমি জাহাজে উঠিয়া আবার চীন দেশে যাত্রা কর।"

সওদাগর জাহাজের দিকে ফিরিয়া দেখিলেন, আগুন নিভিয়া গিয়াছে। কয়লাগুলি আবার কাঠ হইয়া গিয়াছে। দড়াদড়ি পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল; সেগুলি আবার ঠিক ঠিক জায়গায় দেখা যাইতেছে। মাঝি-মাল্লারা যে যার স্থানে খুসিমনে রহিয়াছে। জাহাজে যে কখনও আগুন লাগিয়াছিল, এমন চিহ্ন মাত্র নাই।

সওদাগর অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে করিতে জাহাজে উঠিলেন; উঠিয়া খালাসীদিগকে বলিলেন, "আমরা বিধাতার কৃপায় ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি। এখন চল, জাহাজ খুলিয়া আবার চীন দেশের দিকে যাত্রা করি।" এ কথা তিনি দু' তিন বার বলিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কেহ তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল না; জাহাজ ছাড়িবার জোগাড় করিল না। কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বে কোনও দিন সওদাগরের হুকুম এমন অবহেলা করে নাই।

তিনি আশ্চর্য্য ও বিরক্ত হইয়া, ধমক দিয়া বলিলেন, "তোমরা আমার আদেশ অমান্য করিতেছ কেন? শীঘ্র জাহাজ ছাড়।" এ কথায়ও কেহ উত্তর দিল না। সওদাগর দেখিলেন, সকলে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, হাস্য-আমোদ করিতেছে,

এ-দিক ও-দিক পায়-চারি করিতেছে! তিনি অনেক মিনতিও করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কোনও ফল হইল না; কেহই উত্তর দিল না।

সওদাগর তখন ভাবিলেন, "আর কিছু নয়; বিধাতা আমাকে সামাজিক নিয়মের বাহিরে ফেলিয়াছেন। ইহারা আমার ভাষা বুঝিতেছে না। আমার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে।"

নিজের ইচ্ছা আকার ইঙ্গিতে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, তাহাতেও তাহারা কিছুই বুঝিল না। তখন অত্যন্ত ভীত ও ব্যাকুল হইয়া, তিনি নিজেই দড়ি টানিয়া একটা পাল তুলিয়া দিলেন; এবং হাল ধরিয়া বসিয়া একাই জাহাজ চালাইবার চেষ্টা করিলেন। মাঝসমুদ্রে বসিয়া থাকিলে ত চলে না! চীন দেশে যাওয়া না হয়, অন্ততঃ দেশে ফিরিয়া যাওয়া ত চাই! কিন্তু জাহাজ কতক দূর গিয়াই আর অগ্রসর হয় না! এর কারণ কি? পালে ত হাওয়ার জোর বেশ আছে। পরে দেখিলেন, নঙ্গর তোলা হয় নাই। নঙ্গর তুলিতে গিয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। যে জিনিস দশ জন খালাসী তুলিতে হাঁপাইয়া পড়ে, তা তিনি একা তুলিবেন কিরূপে? ত্রস্তে-ব্যস্তে তিনি আবার মাঝি-মাল্লাদিগকে ডাকিলেন; কিন্তু কেহই সাড়া দিল না। তাঁর পক্ষে সামাজিক নিয়ম যে রহিত হইয়া গিয়াছে! তিনি যেমন অন্যের কুকার্য্যের ফল লইতে অনিচ্ছুক, তেমনি অন্যের সাহায্য হইতেও বঞ্চিত হইয়াছেন।

এ অবস্থায় উপায় চিন্তা করিতে করিতে একটা বুদ্ধি তাঁহার মাথায় আসিল। তিনি ভাবিলেন, "সিঙ্গাপুর ত অনেক দূরে নয়। যখন মাঝি-মাল্লারা আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছে, তখন ইহাদিগকে জাহাজে ফেলিয়া, আমি একা ডিঙ্গি চড়িয়া কোনও রকমে সিঙ্গাপুরে চলিয়া যাই। সেখানে উঠিলে অবশ্য একটা উপায় হইবে।"

এই ভাবিয়া তিনি ছোট এক ডিঙ্গিতে চড়িয়া নিজে দাঁড় টানিয়া অনেক কষ্টে সিঙ্গাপুরে পৌঁছিলেন। সেখানে তাঁর এক বন্ধুর কথা মনে পড়িল। বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া উপস্থিত বিপদের একটা কিছু কিনারা করিতে পারিবেন, মনে করিলেন। অন্ততঃ বন্ধুর দ্বারা খালাসী-দিগকে বুঝাইয়া দেশের দিকে রওয়ানা করাইতে পারিবেন, এই আশা হইল। তাড়াতাড়ি বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে গৃহেও পাইলেন। দেখিলেন, বন্ধু আফিস ঘরে বসিয়া চিঠিপত্র লিখিতেছেন। অপর দু'তিন জন লোক বসিয়া আছে; মাঝে মাঝে তাহাদের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেছেন। তিনি অতিশয় আশান্বিত হইয়া, হাসিমুখে গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং নমস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। বন্ধু কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ব্যগ্র ভাবে নিজের বিপদের কথাও বলিলেন এবং তাঁহার নিকট পরামর্শ ও সাহায্য চাহিলেন। বলিলেন, 'এখন, তুমি ভাই আমায় একটা বুদ্ধি দাও। সিঙ্গাপুরের সব ধনী মানী লোক তোমার বশ; তুমি ইচ্ছা করিলে আলাদা একটা জাহাজে করিয়াও আমাকে দেশে পাঠাইতে পার।"

সওদাগর আধঘণ্টা কথা কহিলেন; কিন্তু তাঁর বন্ধু, না নমস্কার গ্রহণ করিলেন, না কুশল-মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন, না একটি কথার জবাব দিলেন! তিনি যেমন লিখিতেছিলেন, তেমনি লিখিয়া যাইতে লাগিলেন; আর মাঝে মাঝে অন্য লোকদের সঙ্গে দুই চারিটি কথা কহিতে লাগিলেন।

বন্ধু কিছুমাত্র আদর-অভ্যর্থনা করিলেন না

এবং তাঁর দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না দেখিয়া, সওদাগরের মনে পড়িল, এও সামাজিক নিয়ম স্থগিত হওয়ার ফল। এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও যে পর হইয়া যাইবে, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

এখন কি করেন? দাঁড় টানার পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হইয়াছে, অত্যন্ত ক্ষুধাও পাইয়াছে, ভাবিলেন, "বন্ধু ত খাইতে দিবার নাম করিল না; যাই, কোনও হোটেলে গিয়া আহার ও বিশ্রাম করি। শরীর সুস্থ হইলে অবশ্য বুদ্ধি যোগাবে।"

হোটেলে গিয়া আহার চাহিলেন; কিন্তু হোটেলওয়ালা বা তার চাকর-বাকরেরা কেহই তাঁহার সহিত কথা কহিল না। পূর্ব্বে তিনি অনেকবার সিঙ্গাপুরের এই হোটেলে আহারাদি করিয়াছেন। তখন হোটেলওয়ালা ও তার কর্ম্মচারীরা কত আদর-যত্ন করিয়াছে। কিন্তু এবার কেহ যেন তাঁহাকে চিনিতেই পরিল না। তিনি সেখানে অনেক লোকের মধ্যে থাকিয়াও, মনে করিতে লাগিলেন, যেন একা অরণ্যে আছেন।

তখন সওদাগর হতবুদ্ধি হইলেন; এবং ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে বলিতে লাগিলেন, "হে বিধাতঃ! আমি এখন যে ঘোর বিপাকে পড়িয়াছি, এর অপেক্ষা জাহাজের আগুনে পুড়িয়া মরা বা সমুদ্রের জলে ডুবিয়া মরা অনেক ভাল ছিল। এ অবস্থায় আমার বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। হয়, আমাকে শীঘ্র সংসার হইতে তুলিয়া লও; নয়, আবার পূর্ব্বের ন্যায় সামাজিক নিয়মের অধীন কর। আমি আর কখনও তোমার নিন্দা করিব না।"

সওদাগরের এই কাতর কথাগুলি শুনিয়া, বিধাতা বলিলেন, "তুমি ত বিপদে পড়িয়া বলিতেছ—আমাকে আবার সামাজিক নিয়মের অধীন কর। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, সামাজিক নিয়মের অধীন হওয়া মাত্র তোমাকে আবার সেই মাতাল খালাসীর দুষ্কর্ম্মের ফল লইতে হইবে। তোমার জাহাজ পুড়িয়া যাইবে। নিজে ডিঙ্গির সাহায্যে হয়ত কোনওরূপে প্রাণটি বাঁচাইতে পার; কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই নিতান্ত গরীব হইয়া যাইবে। হয়ত তখন তুমি আবার আমাকে দোষ দিতে থাকিবে।"

সওদাগর বলিলেন, "মঙ্গলময় ঈশ্বর! তোমার প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নিয়ম যে মানুষের পক্ষে এমন আবশ্যক, আগে তাহা জানিতাম না। যে ব্যক্তি সামাজিক নিয়মের অধীন, সে দুঃখী হইলেও একেবারে হতাশ হয় না। কিন্তু যদি কেহ সামাজিক নিয়মের বাহিরে পড়ে, তার রাজ-রাজেশ্বর হইয়াই বা লাভ কি? তার মত দুর্ভাগ্য আর কেহ নাই। জাহাজ পুড়িয়া গেলে আমি গরীব হইয়া যাইব সত্য, কিন্তু আমার শরীর, এই হাত-পা, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি, সবই ত থাকিবে? এ সকলকে খাটাইয়া আমি সুখী হইতে পারিব। হয়ত আবার ধনী হইতেও পারি। মানুষ পরস্পরের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকিবে ও সুখী হইবে, এই তোমার ইচ্ছা। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে দুঃখ। অতএব, আমাকে এই নিয়মের অধীন কর। আমি ইহা লঙ্ঘন করিব না।"

বিধাতা সওদাগরের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। জাহাজ পুড়িয়া গেল। সওদাগর এক ডিঙ্গি করিয়া স্থলে উঠিলেন। পরে সিঙ্গাপুরের সেই বন্ধুর সাহায্যে দেশে ফিরিয়া পরমেশ্বরের নিয়মসকল পালন করিতে লাগিলেন। তিনি অল্প অল্প ধন সঞ্চয়ও করিলেন; এবং আনন্দিত মনে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

উপসংহার

তৎপরে আরও বহু লোক নিজ নিজ দুঃখের কথা বলিয়া বিধাতার মঙ্গল-নিয়মের দোষ দিতে লাগিল। বিধাতা একদিন তাহাদের সকলকে একত্র করিলেন; এবং রাজমিস্ত্রী, কৃষক, বাত-রোগী ও সওদাগরকে সেখানে আনিয়া আদেশ করিলেন, "তোমরা নিজ নিজ জীবনের বৃত্তান্ত বলিয়া আমার নিয়মসকলের যথার্থ তত্ত্ব ইহা-দিগকে বুঝাইয়া দাও।" তখন তাঁহারা প্রত্যেকে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহা সকলকে বলিলেন।

রাজমিস্ত্রী বুঝাইয়া দিলেন,—"যে নিয়মে মানুষ উপর হইতে পড়িয়া আঘাত পায়, তাহা মঙ্গল নিয়ম। এ নিয়ম না থাকিলে, মানুষের চলা-ফেরা, কাজ-কর্ম্ম কিছুই হইতে পারিত না।"

কৃষক বুঝাইয়া দিলেন,—"যে নিয়মে বৃষ্টির জলে মানুষের ঠাণ্ডা লাগে ও জ্বর হয়, তাহা মঙ্গল নিয়ম। এ নিয়ম না থাকিলে, মানুষ কোনও প্রকার ইন্দ্রিয়-সুখে সুখী হইতে পারিত না।"

বাতরোগী বুঝাইয়া দিলেন,—"যে নিয়মে পিতামাতার শরীরের রোগ পায়, তাহা মঙ্গল নিয়ম। এ নিয়ম না থাকিলে, মানুষ পিতামাতা হইতে কোনও উৎকৃষ্ট শক্তি ও বৃত্তিই পাইতে পারিত না।"

সওদাগর বুঝাইয়া দিলেন,—"যে নিয়মে মানুষ অপরের দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করে, তাহাও মঙ্গল নিয়ম। এ নিয়ম না থাকিলে, মানুষ পরস্পরের সাহায্য পাইয়া সুখে জীবন যাপন করিতে পারিত না।"

এই সকল অমূল্য উপদেশ শুনিয়া, সকল অসন্তুষ্ট লোকদের মনের ক্লেশ চলিয়া গেল। তাহারা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিন্দা ছাড়িয়া, তাঁর নিয়মসকল বুঝিতে ও পালন করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে পৃথিবীর অনেক দুঃখ কমিয়া গেল।

শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পদ্মা নদী

বাঙ্গালা দেশে যত নদী আছে, তন্মধ্যে পদ্মা নদীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বেগবতী। ইহার আর এক নাম কীর্ত্তিনাশা। এই নাম হইতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই নদী পূর্ব্ব বঙ্গের ভিতর দিয়া, পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া মেঘনা নদীর সহিত মিশিয়াছে। পদ্মার দুই তীরে যে সকল গ্রাম ও নগর আছে তাহা ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, পদ্মার ভাঙ্গন বড় ভয়ানক, প্রতি বৎসর যে কত শত সহস্র লোক গৃহহীন হয় তাহার সংখ্যা করা যায় না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ভাঙ্গন আরম্ভ হয়; সারা বর্ষা কাল প্রবলভাবে ভাঙ্গন চলিতে থাকে, শীতের সময় ইহার রুদ্রমূর্ত্তি শান্ত ভাব ধারণ করে। পূর্ব্ববঙ্গ ও বিক্রমপুরের কত প্রাচীন কীর্ত্তি যে পদ্মা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা রাজ-বল্লভের "একুশ রত্ন মঠ" ভাঙ্গিয়া লইবার পর হইতে ইহার নাম "কীর্ত্তিনাশা" হইয়াছে। ইতিহাস

প্রসিদ্ধ অনেক মূল্যবান দ্রব্যাদি পদ্মা বিনষ্ট করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের স্বভাব কবি গোবিন্দদাস লিখিয়া গিয়াছেন,

"বিস্তীর্ণ বিশাল পদ্মা বিনাশ-অক্ষরে,
সৈকতে লিখিয়া যায় গত ইতিহাস,
চক্রবাক্ কাঁদা খোঁচা বালুচরে চরে,
পদচিহ্নে পরিশিষ্ট করিছে প্রকাশ।"

পদ্মার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য মনোরম। তীরে দাঁড়াইয়া দূরে দৃষ্টিপাত করিলে পর পারে বৃক্ষাদি সুশোভিত গ্রামগুলি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, আর নদীর মধ্যে বালুচরের উপর সবুজ শস্য ক্ষেত্রগুলি অতীব সুন্দর দেখায়। দূরে দিগন্তের পানে চাহিলে দেখা যায়, আকাশ নদীর কিনারে কিনারে মিশিয়া গিয়াছে। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখিতেও খুব সুন্দর। ইহার গর্জ্জন অতি ভীষণ, বহুদূর হইতে শোঁ শোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। পদ্মার তীরে বায়ু সেবন আরামজনক। পদ্মার জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যপ্রদ, এই কারণে বিক্রম-পুরে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব কম। আজকাল অনেকে স্বাস্থ্য লাভের আশায় পদ্মার উপর নৌকাতে বাস করিয়া থাকেন।

পদ্মার তীরে দাঁড়াইয়া আর একটী সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়,—জেলেদের মাছ ধরা। এই উত্তাল তরঙ্গময় নদীর বুকে ক্ষুদ্র ছিপি নৌকায় মাছ ধরা অসীম সাহসের কাজ।

জেলেরা নৌকায় নানা বর্ণের পাল তুলিয়া হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে, প্রবল বাতাসে নৌকা গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়। যদিও পদ্মার জল সর্ব্বদাই পূর্ব্বগামী, তবু এমনই আশ্চর্য্য যে পালভরে নৌকাগুলি সব দিকেই চলিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একই সময়ে পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিম দিকে পালভরে নৌকা চলিয়া থাকে। পদ্মার তীরে সর্ব্বদাই প্রবল বেগে বাতাস বহিয়া থাকে, বাতাসে ও নৌকার গতিতে ঢেউগুলি খুব বড় হইয়া তীরের দিকে ছুটিয়া আসে। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসিয়া তীরে আছাড়িয়া পড়িতেছে। নিবিষ্ট মনে চাহিয়া থাকিলে মনে হয় যেন এক মহাসমর আরম্ভ হইয়াছে। তরঙ্গের কি প্রচণ্ড তাণ্ডব! এই প্রকার ভয়ানক অবস্থার মধ্যেও মাঝিরা অতি আনন্দের সহিত সাড়ি গান গাহিতে গাহিতে নৌকা চালাইয়া যায়; ইহারা—

"ভরা পালে চলি যায়, কোন দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙ্গে দু'ধারে—"

ঝড়ের সময় পদ্মার অবস্থা অতিশয় ভয়াবহ হইয়া থাকে, ঐ সময় মাঝিরাও নৌকা চালাইতে খুব সাবধান হয়। অনেক সময় পদ্মাতে নৌকা ডুবি ঘটিয়া থাকে, কখন কখন লোকও মারা যায়।* প্রবল ভাঙ্গনের সময়ও লোকজন মৃত্যু মুখে পতিত হয়। বর্ষার সময় পূর্ব্ববঙ্গের ও বিক্রম-পুরের অবস্থা অতি শোচনীয়। জলে মাঠঘাট ডুবিয়া যায়, নৌকা ব্যতীত এক-পা অগ্রসর হইবার উপায় নাই, ভাঙ্গন আরম্ভ হইলে, লোকের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকে না। খুব বড় বড় নৌকায় জিনিষপত্র লইয়া নিরাশ্রয় লোকগুলি অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া পড়ে। প্রবল ভাঙ্গনের সময় লোকজন ঘর দরজা প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া লইতে অবকাশ পায় না। কত বড় বড় অট্টালিকা মঠ

---

*তোমরা বোধহয় শুনেছ কয়েকদিন পূর্ব্বে ভীষণ ঝড়ে যাত্রীপূর্ণ একখানি বড় ষ্টিমার যমুনা নদীতে ডুবিয়া গিয়াছে। এত প্রবল বেগে ঝড় বহিতেছিল, যে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ষ্টিমারখানি একেবারে উল্টাইয়া যায়। এই ষ্টিমার ডুবিতে প্রায় দুইশত লোক মারা গিয়াছে
—মুঃ সঃ

ও রাজা জমিদারের বাস ভবন পদ্মাগর্ভে ডুবিয়া যায় দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়, দুঃখে নয়ন অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়। বিক্রমপুরের উপর পদ্মার আক্রোশ যেন খুব বেশী! প্রতিবৎসরই বিক্রম-পুরের কোন না কোন অংশ পদ্মায় ভাঙ্গিয়া লয়।

ষ্টিমারে চড়িয়া পদ্মার উপর দিয়া যাইবার সময় ভাঙ্গনকূলের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও বিরাট অট্টালিকা নদীতে পড়-পড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও বা অর্দ্ধেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বাকী অর্দ্ধাংশ ধ্বংসলীলার সাক্ষ্যস্বরূপ রহিয়াছে। তীরবর্ত্তী বাড়ীঘরগুলি অচিরেই ভাঙ্গিয়া যাইবে আশঙ্কায় গৃহস্থগণ বৃক্ষাদি কাটিয়া ফেলিতেছে, বড় বড় নৌকায় জিনিষপত্র বোঝাই করিতেছে। এই সকল দৃশ্য দেখিবার জন্য নদী-তীরে সর্ব্বদাই বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিলে প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই:ত গেল মানুষের বসত বাটীর কথা। এতদ্ব্যতীত বড় বড় ফলের বাগান, শস্য পরিপূর্ণ ক্ষেত্রসকল ক্রোশ ব্যাপিয়া ভাঙ্গিয়া যায়, কত বড় বড় বাজার, হাট, বিদ্যালয়-গৃহ অতি অল্প কাল মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

গোয়ালন্দ হইতেই পদ্মার বেগ অতিশয় বেশী। সারাঘাটে যে সুবৃহৎ রেলের সেতু প্রস্তুত হইয়াছে উহা পদ্মারই উপর দিয়া চলিয়াছে। ঐ স্থানের পদ্মার স্রোত এত প্রবল নয় এবং ভাঙ্গিবারও আশঙ্কা কম, এই জন্য ঐ স্থানে সেতু নির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছে। অনেক দিনের চেষ্টায় ও বহু অর্থব্যয়ে এই বিরাট সেতু তৈয়ার হইয়াছে। ইহা ছাড়া পদ্মার উপর আর কোথাও সেতু নির্ম্মাণ করা যায় নাই।

পদ্মার ভাঙ্গনে মানুষের কীর্ত্তিকলাপ একেবারে চিহ্নহীন করিয়া ফেলে। আর কোন বিপদই মানুষকে এত অভিভূত ও সহায়হীন করিতে পারে না। বিক্রমপুরে ও পূর্ব্ববঙ্গে বহু প্রাচীন যুগের কত স্মৃতিস্তম্ভ, কত সমাধিমন্দির বিদ্যমান ছিল, সবই একে একে পদ্মার জলে ডুবিয়া গিয়াছে। গত ১৩৩০ সনের ভাদ্র মাসে 'রাজাবাড়ীর মঠটী' পদ্মায় ডুবিয়া যায়। তখন কবি বড় দুঃখে লিখিয়াছেন,—

"চাঁদ কেদারের সকল কীর্ত্তি লুপ্ত হল আজ
ইতিহাসে রইল শুধু নামটী তাঁদের লেখা,
সকল স্মৃতি রইল ডুবি অতল জলের মাঝ
কীর্ত্তিনাশার বুক জুড়িয়া রইল কেবল আঁকা।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভোর

১

মোরগ হাঁকে কোঁকর—কোঁ—
পায়রা বকে বক্ বকুম্।
ওঠ্ রে মাণিক! মুখ হাত ধো,
এখনো কি যায়নি ঘুম?

২

কাগা ডাকে কা - কা—
ছুয়োর খোলে খুট্ খাট্।
বাবা উঠে খাচ্ছে চা,
বেয়ারা দিচ্ছে ঝাঁটপাট॥

৩

মা গিয়েছে ভাঁড়ার ঘরে,
ঠাকুর গেছে নাইতে,
কাকাতুয়া হল্লা করে,
ঝি চেঁচায় তা' চাইতে!

৪

ছুধ জ্বাল দেওয়া হয়ে গেল,
মেণি তার ভাগ পেয়েছে,
তোমার টুকু খেয়ে ফেল,
নইলে নেবে খেয়ে সে॥

৫

ভুলু কুকুর ছুয়োর গোড়ায়
কর্ছে বসে' ছট্‌ফট্।
সইস মলে' দিচ্ছে ঘোড়ায়,
চাপড় পড়ে চটাপট্॥

৬

হাওয়া দিচ্ছে মিঠে মিঠে,
ফুলগুলি সব জেগেছে।
মালীরা দেয় জলের ছিটে,
সবাই কাজে লেগেছে॥

৭

সূয্যি মামা কোন্ সকালে
দিয়ে গেছে ঘরে উঁকি।
সবার ঘুমটি না ভাঙ্গালে,
তারই ঘাড়ে পড়বে ঝুঁকি॥

৮

তাই সে দেছে চাঁদকে বলে'
ভোরে আমায় দিস্ তুলে।
সোনার রথে যাব চলে,
আকাশেরি ইস্কুলে॥

৯

মাষ্টার সেথায় বড় কড়া,
একদিনও তার ছুটি নাই।
রোজই দিতে হবে পড়া,
রোজই রোদ যোগানো চাই॥

১০

টুক্ টুকে তার রাঙা মুখ,
মাজা যেন তামার থালা।
এই সময়ই দেখতে সুখ,—
আলো আছে, নাইক' জ্বালা॥

১১

সোনার অঙ্গে পরেছে সে,
সোনার মেঘের গয়না।
যাত্রা সুরু করেছে সে,
দেরি কভু হয় না॥

১২

তুইও তেম্নি সোনা ছেলে,
আয়রে উঠে, ধন আমার!
তোরে নাহি দেখ্ তে পেলে,
সকালবেলা অন্ধকার॥

শ্রীইন্দিরা দেবী

তিল থেকে তাল

"আঃ, আজ ছুটির দিনটায় কি বৃষ্টিই হচ্ছে! একটুও ভাল লাগছে না" এই বলেই রাগ করে রাণী যেই পা'টা ছুঁড়ল, অমনি তার পিছনের টেবিলে ধাক্কা লেগে টেবিলের উপরে যে নানা কারুকার্য্য করা কাঁচের সুন্দর বড় ফুলদানিটা ছিল সেটা মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। সেই যায়গাতে পোষা কুকুর ভোলা শুয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছিল, সে ফুলদানি ভাঙ্গার শব্দে ভয় পেয়ে সে ঘর থেকে দৌড়ে রান্নাঘরের দিকে গেল। রান্নাঘরের পিছনের দরজা খোলা ছিল, সেই দরজার সামনে গয়লার ছেলে দুধের বালতি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তার উপরে ভোলা গিয়ে পড়তেই, দুধের বালতি-শুদ্ধ গয়লার ছেলে পড়ে গেল। আর নর্দ্দামা দিয়ে দুধ গড়িয়ে যেতে লাগল। গয়লার ছেলেটী তখন এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে, পাশের আস্তাবলে যে ঘোড়াটা ছিল, সে দড়ি ছিঁড়ে এক দৌড়ে রাস্তায় চলে গেল।

রাস্তায় দুটী গরু একটা বোঝাই গাড়ী নিয়ে ষ্টেশন থেকে আসছিল। তাদের উপর ঘোড়াটা পড়তেই, গরু দুটো ভয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল, আর মালগুলি রেলের লাইনের উপরে পড়ে গেল। তখন ট্রেণ ছাড়বার সময় কিন্তু লাইনের উপর থেকে মালগুলি সরিয়ে না নিলে ত ট্রেন ছাড়তে পারা যায় না! কাজেই ট্রেন ছাড়তে দেরী হল। দেরী দেখে শত শত যাত্রী খুব বিরক্ত হয়ে উঠল। তারা জানতে চাইল আজ ট্রেণ ছাড়তে এত দেরী হচ্ছে কেন?

তারা জানে না যে একটী ছোট্ট মেয়ে বিরক্ত হয়ে পা ছোঁড়াতেই এত কাণ্ড হয়েছে। রেলের যাত্রীরা গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে দোষ দিতে লাগল। গাড়োয়ান সেই গয়লার ছেলেটীকে দোষ দিল, গয়লা তার ছেলেকে খুব মার দিল। গয়লার ছেলে কাঁদতে কাঁদতে ভোলার ঘাড়ে সব দোষ চাপাল। ভোলা ত মানুষ নয়! জানোয়ার, কাজেই সে ফুলদানিকে দোষ দিতে পারল না। তবে এ কথা ঠিক যে ফুলদানিটা মাটিতে পড়ে শব্দ করাতেই ভোলা ভয় পেয়েছিল। আর যে ফুলদানিটা পড়ে ভেঙ্গে একেবারে চুরমার হয়ে গেছে, সে কি করে আর রাণীকে দোষ দেবে!

আর রাণীর অবস্থা কি হয়েছিল? সে দরজায় দাঁড়িয়ে আগাগোড়া সব কাণ্ডই দেখছিল এবং দেখে দেখে ভয়ে কাঁপছিল। রাণী মনের দুঃখে ফুলদানি ভাঙ্গা কাচগুলি কুড়িয়ে নিয়ে মার কাছে গেল ও মাকে সব কথা বলল।

শেষে রাণী বলল, "মা, আর কখনো টেবিলে পা ছুঁড়ব না।"

মা বললেন, "তুমি রাগ করেছিলে সেই জন্যই ত এত কাণ্ড আজ হয়ে গেল। রাগ যদি না করতে ত, তা হলে পা ছুড়তে না, কেমন! আর রাগটাই হচ্ছে এত গোলমালের গোড়া। এবার থেকে হঠাৎ সামান্য কারণে যখন রাগ হবে, তখন চেষ্টা করে তা দূর করবে। আর দেখবে তখন কোথাও কোন গোলমাল হবে না। মনের সুখে তোমার দিনগুলি কেটে যাবে।"

দেশবিদেশের কথা

আস্‌পি ইঞ্জিনিয়ার

আস্‌পি ইঞ্জিনিয়ার নাম শুনিয়া মনে হয় যে, ইনি বুঝি একজন ইংরেজ। বাস্তবিক তাহা নহে। ইনি একজন আমাদেরই দেশের লোক। ইহার বাড়ী করাচী। সেখানেই ইহার পিতা-মাতা বাস করেন। ইনি জাতিতে পার্শী। ইঞ্জিনিয়ারের বয়স সতের বৎসর। করাচী কলেজে পাঠ করেন।

করাচী ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে আরব সাগরের তীরে একটি সুন্দর সহর। এই সহরের কয়েক মাইল পশ্চিম দিকেই ভারতের শেষ সীমা।

পাখী আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। ইহা দেখিয়া বহুকাল হইল, মানুষের ইচ্ছা হইয়াছিল যে, সেও আকাশে উড়িবে। কিন্তু মানুষের পাখা নাই, সে আকাশে উড়িতে পারিল না। আকাশে উড়িবার চেষ্টা করিয়া অনেক মানুষ মারা গিয়াছে।

মানুষ পরাজয় মানিবার পাত্র নহে। বহুকালের চেষ্টার পর, এক কল তৈয়ার করিয়াছে। ইহার নাম এরোপ্লেন। বাঙ্গলায় ইহাকে ব্যোমযান বলা যাইতে পারে। এই ব্যোমযানের পাখা আছে। কলে এই পাখা খুব তাড়াতাড়ি ঘুরে এবং আকাশে উড়িয়া যায়।

ইংলণ্ড হইতে যে সকল ব্যোমযান ভারতবর্ষে আইসে, করাচীতে তাহার নামিবার সুন্দর স্থান নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এইস্থানে প্রতি-সপ্তাহে ইংলণ্ড হইতে আকাশপথে ব্যোমযানে ডাক আসে ও ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে যায়। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর নানাদেশ হইতে আরও অনেক ব্যোমযান যাত্রী লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া থাকে।

ইঞ্জিনিয়ার প্রতিদিন দেখিতেন, ব্যোমযানে চড়িয়া কত নরনারী বিদেশে যাইতেছে, ডাকের চিঠিপত্র লইয়া নানাদেশে চলিয়া যাইতেছে, তাঁহার প্রাণে ব্যোমযানে চড়িবার কৌতূহল জন্মিল।

ইঞ্জিনিয়ার কলেজের বুদ্ধিমান ছাত্র। সে বিশ দিনে ব্যোমযান চালাইতে শিখিল। সে শুনিয়াছিল, কোন ভারতবাসী যদি ভারতবর্ষ হইতে নিজের ব্যোমযানে ইংলণ্ডে যায় তবে আগা খাঁ তাঁহাকে প্রায় ৭৫০০ টাকা পুরস্কার দিবেন। ইঞ্জিনিয়ারের বাবা তাহাকে একখানি ছোট এরোপ্লেন কিনিয়া দিলেন। পঞ্জাবের চাওলা নামক একটি যুবক ব্যোমযান চালাইতে শিখিয়াছিল। ইঞ্জিনিয়ার ও চাওলা ছোট এরোপ্লেনে চড়িয়া ইংলণ্ডে গমন করে। সেখানে যাইয়া শুনিতে পান, ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে যাহারা যাইবে, তাহারা পুরস্কার পাইবে না। যে ভারতবাসী ইংলণ্ড হইতে একাকী চারি সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষে পঁহুছিতে পারিবে, সেই পুরস্কার পাইবে।

ইঞ্জিনিয়ার মাসখানেক পূর্ব্বে একখানি ক্ষুদ্র এরোপ্লেনে একাকী ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়াছিল। পথে কত সমুদ্র, পর্ব্বত ও মরুভূমি। সতের বৎসরের ছেলে সঙ্গে একখানি সাবান
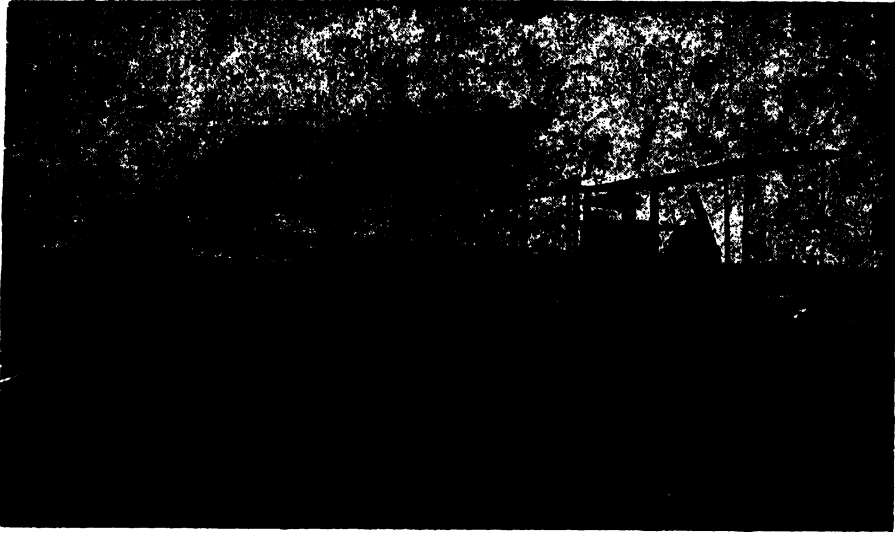
দন্তমাজ্জনী লইয়া একাকী এরোপ্লেনে উঠিল, একাকী কল চালাইতে লাগিল, একাকী পথ দেখিয়া চলিতে লাগিল। ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্স, ফ্রান্স হইতে ভূমধ্যসাগর পার হইয়া আফ্রিকা, আফ্রিকা হইতে সিরিয়া, তারপর পারস্যদেশ ও বেলুচিস্তান আটাশ দিনের মধ্যে পার হইয়া গত ১১ই মে করাচী পঁহুছিয়াছে। পথে কয়েকবার এরোপ্লেনের কল বিকল হইয়াছিল, তখন আকাশ হইতে মাটিতে নামিয়া নিজেই তাহা মেরামত করিয়াছে। সতের বছরের বালকের পক্ষে তাহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

চেষ্টা থাকিলে ছেলেরাও যে অসাধারণ কার্য্য করিতে পারে, ইঞ্জিনিয়ার তাহা দেখাইয়াছে। যে দিন ইঞ্জিনিয়ার করাচী পঁহুছে, সে দিন আকাশ হইতে সে যখন নামে, তখন কয়েক হাজার স্ত্রীলোক ও পুরুষ তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। সে ধীরে ধীরে আকাশ হইতে নামিতে লাগিল, আর সকলে আনন্দধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। ইঞ্জিনিয়ার এরোপ্লেন হইতে নামিয়াই দেখিতে পাইল তাহার মা ও বাপ প্রফুল্লমুখে তাহার কাছে আসিতেছেন। সে মা বাপকে প্রণাম করিল, মা ও বাবা তাহাকে কোলে লইয়া বুক জুড়াইলেন।

মনমোহন সিংহ

মনমোহন সিংহ একজন পাঞ্জাবী শিখ ছাত্র, ইংলণ্ডে ব্রিটিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়িতেছিলেন। তিনিও একাকী এরোপ্লান চালাইয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিতে দুইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুইবারই পথে নামিবার সময় তাহার এরোপ্লান ভাঙ্গিয়া যায়। মনমোহন সিংহ অতিশয় অধ্যবসায়ী ও সাহসী। তিনি দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়াও দমিলেন না। আর একখানা এরোপ্লান লইয়া ভারতবর্ষের দিকে "উড়তে" লাগিলেন। এবারেও প্রায় করাচীর কাছে আসিয়া তাহাকে

বাধ্য হইয়া আকাশ হইতে নামিতে হইল। এই গোলমালে মনমোহন সিংহের করাচীতে পৌঁছিতে কয়েকদিন বিলম্ব হইল ও তজ্জন্য আগাখাঁর পুরস্কার পাইলেন না। যদিও তিনি আগাখাঁর পুরস্কার পাইলেন না, তবু তাহার অধ্যবসায় অতিশয় প্রশংসনীয়।

—

বাঙ্গালীর চেষ্টা

একজন বাঙ্গালী (মিঃ বি, কে, দাস) আর একজন মাড়োয়ারী (মি লোহিয়া) সম্প্রতি করাচী হইতে এরোপ্লান চালাইয়া দমদমাতে পঁহুছিয়াছেন। ইহারা উভয়ে 'দমদমা উড়ন ক্লাবের (Dum Dum Flying Club) সভ্য, এই খানেই এরোপ্লান চালান শিক্ষা করিয়াছেন!

বেতারে বিজলিবাতি

মুকুলের পাঠক পাঠিকা, তোমাদের মধ্যে যাদের বাড়ীতে "বিজলী বাতি" আছে, তারা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছ যে, প্রত্যেক বাতির সাথে একটা তার সংলগ্ন আছে। এই তার আবার রাস্তায় কোন তারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এইরূপ তোমাদের বিজলী বাতিগুলি যেখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সেই বিজলীর কারখানার সহিত সংযুক্ত হয়। এই তারের ভিতর দিয়ে কারখানা থেকে "বিদ্যুৎ-স্রোত" এলেই তোমাদের বিজলী বাতি জ্বলে ওঠে। কোন কারণে বিদ্যুতের স্রোত আসা বন্ধ হলেই বাতিগুলি নিভে যায়। সংক্ষেপে এইরূপ বলা যেতে পারে যে, তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ না এলে বাতি জ্বালতে পারা যায় না। বিদ্যুতের কারখানা হতে বাতিগুলি যত দূরে থাকুক না কেন, তার দিয়ে পরস্পর সংযোগ থাকা চাই। সহরে যে সব বাতি জ্বলে তা পাঁচ কি সাত মাইল দূরবর্ত্তী বিদ্যুতের কলঘর হতেই বিজলী পায়। আবার সহরের অনেক দূরেও বিজলীর উৎপন্নস্থান থাকতে পারে। মহীসুর রাজ্যে শিবসমুদ্রম জলপ্রপাতে বিদ্যুৎ তৈয়ার করা হয়। এই স্থানটী মহীসুর রাজ্যের রাজধানী বাঙ্গালোর সহর হইতে ৭৫ মাইল দূরে। কিন্তু তারের ভিতর দিয়া এতদূর হইতে বিদ্যুৎ আনাইয়া রাজধানী আলোকিত করা হয়। সম্প্রতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মার্কোনি বিনাতারে বিজলী বাতি জ্বালাইয়া সভ্য জগতের লোকদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। এই মার্কোনিই ৩০ বৎসর পূর্ব্বে "বেতারে" সংবাদ প্রেরণ করতে সর্ব্বপ্রথমে সমর্থ হয়েছিলেন। ইহাঁর উদ্ভাবনের ফলেই আজ তোমরা ঘরে বসে বিনাতারে দেশ বিদেশের খবর ও গান শুনতে পাচ্ছ।

মার্কোনি ইতালীর জেনোয়া নামক বন্দরে নিজের সখের ষ্টীমারে সমুদ্রের উপর ছিলেন। সেখানে ষ্টীমারের একঘরে বসে শুধু একটা চাবি টিপে দিলেন, আর অমনি এগার হাজার মাইল দূরে অষ্ট্রেলিয়াতে এক বৈদ্যুতিক প্রদর্শনীর হাজার হাজার বিজলী বাতি জ্বলে উঠল। কি আশ্চর্য্য!

বিনাতারে যেমন আজকাল দেশ বিদেশে খবর পাঠান যাচ্ছে, ভবিষ্যতে সেইরূপ লোকে বেতারে বিজলী বাতিও জ্বালতে পারবে।

আজকাল টেলিফোনে অনেক দূরেও কথা বলা যায়, এতেও তারে সংলগ্ন কল বসাতে হয়। তোমরা বাড়ীতে বসেই সহরের দূরবর্ত্তী বন্ধুবান্ধব

ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বল্‌ছ। এখন ভারতবর্ষেও টেলিফোনের নূতন বন্দোবস্ত হয়েছে, তাতে দিল্লীতে বসে বোম্বাইয়ের কি অন্য সহরের লোকের সঙ্গেও কথাবার্ত্তা বল্‌তে পারা যায়। ইহাতে কাজের সুবিধা ও আনন্দ দুইই হয়।

সম্প্রতি "বেতার" টেলিফোনের প্রণালী উদ্ভাবিত হচ্ছে। সেদিন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লণ্ডনে বসেই অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করলেন !! কি আশ্চর্য্য !!!

বেতার টেলিফোনের সাহায্যে দেশের দূরত্ব কমে যাচ্ছে।

ধাঁধা

১। আমার চোখ নাই, কিন্তু লোককে আমি পথ দেখাই, আমি বোবা কিন্তু আমি সংখ্যা বলে দিই। বল ত আমি কে ?

২। নীচের বাক্যগুলিতে একএকটী ফুলের নাম লুকান আছে। নাম গুলি বল

(ক)। এ ফুলগুলির কেমন মধুর গন্ধ, রাজ-বাড়ীতে পাঠাবে কি ?

(খ)। চল ভাই সব, কুল খাব টপাটপ।

(গ)। আচ্ছা কাকা, মিনি বেড়ালটা কোথায় লুকাল বলতে পার ?

(ঘ)। কবে ললিতা আমার সঙ্গে খেলা করতে আসবে ?

(ঙ)। আজ আফিসে এত কাজ, বাড়ী ফিরতে রাত হবে।

(চ)। সৈন্যেরা দেখতে পেল যুদ্ধক্ষেত্রে একটা মস্ত গোলা পড়ে রয়েছে. অমনি তারা সেটা তুলে নিল।

৩। নীচের অক্ষরগুলি হতে দুখানা বিখ্যাত বইয়ের নাম বাহির কর।

ভাতমারা হারম নয়

৪। কাল বরণ হলেও আমি সবার আদর পাই,
জনম মোর মাটীর তলে, লোকের ঘরে ঠাঁই,
পরের সেবায় পরাণ দিয়ে আকাশে মিশে যাই.
ভেবে চিন্তে বল তোমরা মোর নামটী ভাই।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের ধাঁধার উত্তর আষাঢ় মাসের মুকুলে বাহির হইবে।

প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ নং আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা। শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মুকুল

—আষাঢ়, ১৩৩৭—

বালকবালিকাদের সচিত্র মাসিকপত্র

শ্রীবা[illegible] চক্রবর্ত্তী বি-এ, কর্ত্তৃক

সম্পাদিত

মুকুলের লেখক-লেখিকাগণ

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু, রায় বাহাদুর জলধর সেন, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডাঃ বনোয়ারীলাল চৌধুরী প্রমুখ।

— বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র —

—ঠিকানা—

২৯৪নং দর্গা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা

বিষয়-সূচী

আষাঢ়—১৩৩৭

মুকুলের নিয়মাবলী

১। মুকুল বাংলা মাসের ৭ই তারিখে বাহির হয়।

২। মুকুলের বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। ভি-পিতে দুই টাকা চারি আনা। প্রতি সংখ্যা তিন আনা। বৎসরের মধ্যে যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু বৈশাখ মাস হইতেই কাগজ লইতে হইবে।

৩। ছেলে-মেয়েদের লেখা মুকুলে বাহির হইবে। লেখা মনোনীত না হইলে তাহা ফেরত দেওয়ার জন্য ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। ধাঁধাঁর সঙ্গে উত্তর লিখিয়া না দিলে তাহা প্রকাশিত হয় না।

৪। পত্র লিখিলে বিজ্ঞাপনের হার জানান হয়।

পুরাতন গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

যাঁহারা মুকুলের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা পাঠাইয়া দেন নাই, অনুগ্রহপূর্ব্বক আষাঢ় মাসের মধ্যে তাঁহারা মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। আষাঢ় মাসের মধ্যে তাঁহাদের মূল্য না পাইলে শ্রাবণ মাসের মুকুল ভি পি তে পাঠান হইবে না।
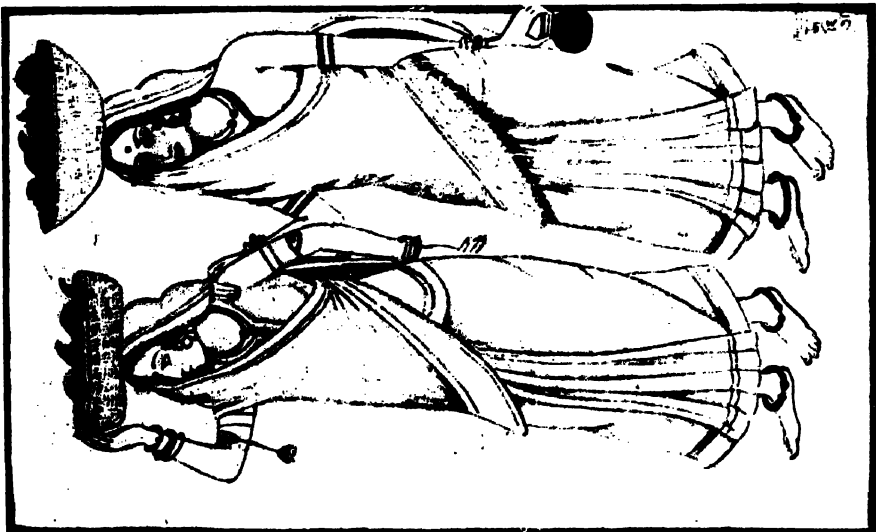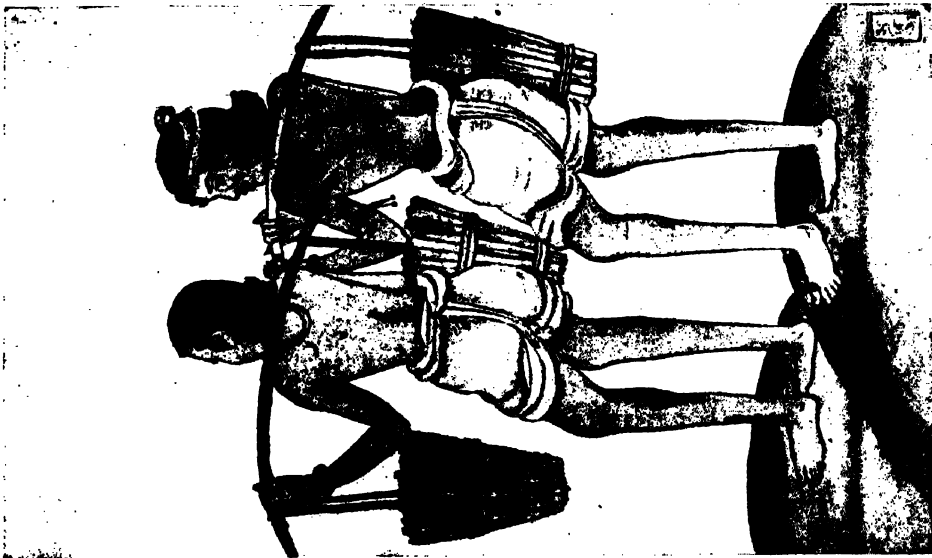
মুকুল কার্য্যাধ্যক্ষ—২৯৪নং দর্গা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা

শ্রম

শিল্পী—শ্রীসবিতা দেবী

প্রবাসী প্রেস

১৩০২ সনে প্রবর্ত্তিত

"ছোট প্রাণে আমাদের দাও ভালবাসা,
ছোট ছোট মুখে দাও স্বরগের ভাষা।"

৩য় বর্ষ] (নবপর্য্যায়)   আষাঢ়, ১৩৩৭   [৩য় সংখ্যা

খোকার ছড়া

১

চাঁদে বুড়ী সূতো কাটে
    খোকা যাবে কিনতে।
ঐ সূতোয় খোকার মোজা
    মাকে হবে বুনতে।
যেমন সূতো বুড়ী কাটে
তেমন সূতো নাইরে হাটে!
    বুড়ী তোমার রথ পাঠিও
    শূন্য হতে মর্ত্ত্যে
নাইকো ঘরে তেমন যান
    চন্দ্র লোকে উঠতে।

২

চাঁদ হাসে।
চাঁদের হার
    চাঁদের বুক
        কালো—
    আধখানা
        কালো।

খোকা হাসে।
খোকার জিত্
    মায়ের বুক
        আলো—
    সবখানা
        আলো।

শ্রীহিমাংশু প্রকাশ রায়

মণ্টি ক্রীষ্টো

[ছেলেবেলা থেকেই এডমণ্ডের নাবিক হবার সখ ছিল। ছেলের ইচ্ছা দেখিয়া তার বাবা, তাঁর এক বন্ধু মিঃ মরেলোর জাহাজে—তার জন্য একটী কাজ যোগাড় করিয়া দিলেন। একবার বাণিজ্য করে ফেরবার পথে জাহাজের ক্যাপ্‌টেন জ্বর হয়ে মারা গেল। তখন এডমণ্ড জাহাজ চালাবার ভার নিয়ে এলবা দ্বীপে ফরাসীদেশের বন্দী সম্রাট নেপোলিয়নকে একখানা চিঠি দিয়ে—ও তার একখানা জবাব নিয়ে দেশে ফিরে গেল

সেখানে সে-ই নুতন ক্যাপটেন হোল। ক্যাপটেন হবার পরেই—সে মার্সিডিস নামে একটী মেয়েকে বিয়ে করবে ঠিক করল। কিন্তু যে দিন তাদের বিয়ে, সেদিন হঠাৎ একদল সৈন্য এসে এডমণ্ডকে বন্দী করে নিয়ে গেল। নেপোলিয়নের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেট তাকে সমুদ্রের মধ্যে এক পাহাড়ে দ্বীপের জেলখানায় বন্দী করে রাখলেন।

জেলখানা থেকে পালাবার ফন্দী করে সে দেওয়ালে গর্ত্ত করতে আরম্ভ করল। দিক ভুল করাতে গর্ত্ত বাইরের দিকে না হয়ে—আরেক জন কয়েদীর ঘরের মধ্যে হোল। সেই কয়েদীটী বৃদ্ধ—তাঁর নাম ফ্যারিয়া। তাঁর সঙ্গে এডমণ্ডের খুব ভাব হোল। ফ্যারিয়া মন্টি-ক্রীষ্টো দ্বীপের গুপ্ত ধনের সন্ধান জান্‌তো। তিনি এডমণ্ডকে সেই সন্ধান বলে দিয়ে বল্লেন—সে যেন সেখানে গিয়ে সেই ধন উদ্ধার করে।

কিছুদিন পরে ফ্যারিয়ার মৃত্যু হলো। এই জেলখানার নিয়মানুসারে কয়েদীদের মৃতদেহ ছালায় বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দেয়। এডমণ্ড বুদ্ধি করে ফ্যারিয়ার মৃতদেহ থলি থেকে সরাইয়া—নিজে সেখানে মরার মত পড়িয়া থাকে। জেলের লোকেরা তাকেই মৃত দেহ মনে করে সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়। সমুদ্রে সাতার দিয়ে সে এক জনহীন দ্বীপে প্রথমে উঠে—পরে একখানি জাহাজ দেখিতে পাইয়া—সেই জাহাজের কাছে সাঁতার দিয়া যায়।

জাহাজের ক্যাপটেন তাঁহাকে আশ্রয় দেন—ও নাবিকের কাজ ভাল জানে বলিয়া নিজের জাহাজেই চাক্‌রী দেন। জাহাজে চাক্‌রী করিতে করিতে সে মন্টি-ক্রীষ্টো দ্বীপের গুপ্তধন উদ্ধারের চিন্তা করিতে লাগিল। ব্যবসায়ের খাতিরে তাদের একবার সেই জনহীন মন্টি-ক্রীষ্টো দ্বীপে নঙ্গর করিতে হইল। সুযোগ বুঝিয়া এডমণ্ড বাজে ওজর দেখাইয়া সেই দ্বীপে থাকিয়া গেল। পরে কি হোল নীচের গল্প থেকে জান্‌তে পারবে।]

এতদিন পরে সে মন্টি-ক্রীষ্টো দ্বীপের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—আর কয়েক ঘণ্টা পরেই সেখানে নামিবে—ইহা এডমণ্ড কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। মাত্র আর কয়েক মাইল পার হইলেই—সে তার বাঞ্ছিত স্থানে পৌঁছিবে ইহা ভাবিয়া তাহার রাত্রিতে ঘুমই হইল না। চোখ বুজিলেই তাহার সামনে কার্ডিনাল স্পডার উইলখানি ভাসিয়া উঠিতেছিল। একবার একটু তন্দ্রার ভাব হইতেই

সে স্বপ্ন দেখিল—"সে মন্টি-ক্রীষ্টো দ্বীপের পাহাড়ের এক গুহায় গিয়াছে। গুহাটীর উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত চারিদিক হীরা মণি-মুক্তায় সাজান। সে অনেক দামী দামী পাথর পকেট ভর্ত্তি করিয়া লইল—কিন্তু সেখান হইতে ফিরিয়া দিনের আলোয় দেখিল সেগুলি শুধুই পাথর। গুহার পথ আর খুজিয়া পাইল না।

নিরাশার ছায়া মুখে লইয়া এডমণ্ডের ঘুম ভাঙ্গিল। কিন্তু কাজের ব্যস্ততায় তাহা শীঘ্র ভুলিয়া গেল। আজকাল ক্যাপ্টেন এডমণ্ডের হাতেই সমস্ত কাজ কর্ম্ম দেখা শুনার ভার দিয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সমস্ত প্রস্তুত হইল। সাতটা বাজিয়া দশ পনর মিনিটের সময় জাহাজ বন্দর ছাড়িয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়িল।

সমুদ্র স্থির। দক্ষিণ পূব কোণ হইতে মৃদু বাতাস বহিতেছিল—আকাশে অসংখ্য তারা মিট্‌মিট্ করিতেছিল।

এডমণ্ড নিজে হালে বসিয়া অন্য সমস্ত নাবিকদের শুইতে বলিল। তাহারা ইহাতে খুব খুসীই হইল, এডমণ্ডের উপর তাহাদের খুব বিশ্বাস ছিল।

সেদিন সারা রাত্রি জাহাজখানি পাল তুলিয়া ভাসিয়া চলিল। সকাল বেলা যখন এডমণ্ডকে বিশ্রাম দিবার জন্য ক্যাপ্টেন উপরে আসিল—তখন মন্টি-ক্রীষ্টো দ্বীপ স্পষ্টই দেখা গেল। ক্যাপ্টেনের হাতে হাল ছাড়িয়া দিয়া এডমণ্ড একটু শুইতে গেল। কিন্তু সারা রাত্রি জাগার পরেও তাহার কিছুতেই ঘুম আসিল না। বিছানায় খানিকক্ষণ গড়াগড়ি দিয়া আবার ডেকে ফিরিয়া আসিল। নেপোলিয়নের বন্দী স্থান সেই এলবা দ্বীপের পাশ দিয়া তাহাদের জাহাজ চলিতে লাগিল—আর প্রতিক্ষণে তাহাদের সামনে মন্টি ক্রীষ্টো দ্বীপ আরও স্পষ্টরূপে দেখা যাইতে লাগিল। এডমণ্ড সাগ্রহে ঐদিকে তাকাইয়াছিল আর ভাবিতেছিল সত্যই কি সেখানে কিছু আছে?—না সবই স্বপ্ন?

শেষে রাত্রি দশটার সময় তারা নঙ্গর করিল। সব প্রথমে এডমণ্ড তীরে লাফাইয়া পড়িল—ইচ্ছা হইল মন্টি-ক্রীষ্টোর মাটিকে চুমু খায়।

অন্যান্য নাবিকেরা সকলেই এই দ্বীপটিকে ভাল করিয়া জানিত—আগে তাহারা দুই তিন বার এখানে আসিয়াছে—কিন্তু এডমণ্ড পূর্ব্বে কখন আসে নাই, এই প্রথম। মার্সেলস্ থেকে যাবার আসবার পথে ইহার পাশ দিয়া গিয়াছে কিন্তু কখন নামে নাই।

সন্ধ্যাবেলাটা খুবই অন্ধকার ছিল, কিন্তু রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় চাঁদ উঠিল—চারিদিক রূপালী আলোয় ভরিয়া গেল।

ধীরে ধীরে রাত্রি বাড়িতে লাগিল—চাঁদও উপরে উঠিতে লাগিল।

এডমণ্ড জ্যাকোপোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ রাত্রিতে আমরা কোথায় শুইব?

—"কেন? জাহাজের উপরে!"

"আচ্ছা—পাহাড়ে যে সমস্ত গুহা আছে তার তার মধ্যে শুলে হয় না?"

—"কোন গুহায়? এখানকার পাহাড়ে গুহা আছে বলে ত মনে হয় না?

এডমণ্ডের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। যদি এখানে কোন গুহাই নেই—তবে কার্ডিনাল স্পাডার উইলে যে গুহার কথা আছে তার মানে কি?

হঠাৎ তাহার মনে হইল হয়ত কার্ডিনাল এই সমস্ত গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন—কিম্বা অন্য

কোন প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ সমস্ত গুহার মুখ চাপা পড়িয়া গিয়াছে—সেই জন্য কেহ উহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিতেছে না। তাহার মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। সে ঠিক করিল দিনের বেলায় ঐ গুহার খোঁজ করিবে। ইতিমধ্যে যে জাহাজখানিতে তাহাদের মাল চালান করিবার কথা ছিল সেই জাহাজ হইতে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখা গেল। নাবিকেরা বুঝিল এখন কয়েক ঘণ্টা তাহাদের কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। কাজ করিতে করিতে এডমণ্ড ভাবিতেছিল—সে যদি তাহার মনের কথা সকলকে খুলিয়া বলে—তবে কেমন হয়? কিন্তু বুদ্ধিমানের মত কাহাকেও কিছু বলিল না। তাহাদের কাজ শেষ হইয়া গেলে সবাই শুইয়া পড়িল।

পরদিন সকাল বেলা এডমণ্ড একটি বন্দুক কিছু বারুদ, টোটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল—সকলকে বলিল কিছু শীকারের খোঁজে যাইতেছে। সে একাই রওনা হয়েছিল—কিন্তু জ্যাকোপো আবার ধরিয়া বসিল সেও যাইবে। পাছে তাহাকে সঙ্গে না লইলে সকলের মনে কোন প্রকার সন্দেহ হয় এই ভাবিয়া সে রাজী হইল।

কিছু দূর যাইতে না যাইতেই এডমণ্ড একটা ছাগল মারিল। জ্যাকোপোকে সেইটা লইয়া জাহাজে ফিরিয়া রান্না করিতে বলিল। রান্না হইলে বন্দুকের আওয়াজ ধরিয়া তাহাকে ডাকিতে উপদেশ দিল।

সে এখন একলা চলিল। চারিদিক খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল—যদি কোন রকমে কার্ডিনালের উইলের সেই গুপ্ত চিহ্ন কোথাও দেখতে পাওয়া যায়।

হঠাৎ এক জায়গায় মনে হোল কেউ যেন পাথর দিয়ে একটী গুহার মুখ বন্ধ করিয়াছে। সে সেগুলিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল—যতই অগ্রসর হইতে লাগিল ততই সেই প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাইল। এমনি ভাবে চলিতে চলিতে একটি ছোট পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। পথটি দেখিয়া মনে হইল—আগে ওখানে একটী ছোট ঝরণা ছিল। দু পাশে ছোট ছোট ঝোপ! ঝোপগুলিকে দু পাশে সরিয়ে দিতেই আবার সেইরূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল। খুব ব্যগ্র হয়ে অগ্রসর হতে হতে—কোন গুহা দেখতে পাওয়া ত দূরের কথা—বরং একটা ছোট পাহাড়ে তাহার পথ আটকাইল।

নিরাশ হয়ে সে আবার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাবে ঠিক করল। তার এত দেরী দেখে হয়ত তারা ভাবছে।

এদিকে জাহাজের লোকেরা খাবার তৈরী করে এডমণ্ডকে খবর দেবে ভাবছে এমন সময় তারা দেখল সে পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আস্‌ছে। হঠাৎ তারা দেখল—তার পা ফসকে যাওয়াতে সে পড়ে গিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সকলেই ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল। সেখানে ছুটে গিয়ে সকলে দেখলে সে প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে আছে—হাঁটু দিয়ে রক্ত পড়ছে। প্রায় বার ফুট উঁচু থেকে সে পড়ে গিয়েছে।

চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে সে চোখ মেলে চাইল। একবার ওঠবার চেষ্টা করে—ভীষণ যন্ত্রণা পেয়ে শুয়ে পড়ল। সকলকে বলিল—তার সমস্ত শরীরে অসহ্য বেদনা হয়েছে—হাঁটুতে আর পিঠে খুব লেগেছে। সে উঠতে পারবে না। সঙ্গীরা সকলেই তাকে খুব ভালবাসত। তারা বল্লে তাকে ঘাড়ে করে

জাহাজে নিয়ে যাবে। এডমণ্ড তাদের বল্লে—"কিছু দরকার নেই—তা ছাড়া আমার গায়ে এত ব্যথা যে তোমরা গায়ে হাত দিলেও লাগবে। তোমরা ভাই গিয়ে খাওয়া দাওয়া কর—আমি একটু চুপ করে শুয়ে থাকি—তাহলে বোধ হয় অনেকটা ভাল হব।—তোমাদের খাওয়া শেষ হলে আমাকে নিয়ে যেও।"

খাওয়া-দাওয়া সেরে নাবিকেরা ফিরে এসে দেখল—ভালো হওয়া ত দূরে থাকুক—এডমণ্ডের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে! ক্যাপটেন যে কি করবে ভেবেই কুল করতে পারল না। নীস্ (Nice) বন্দরে কতক মাল বোঝাই নিতে হবে—অথচ এডমণ্ডকে এ অবস্থায় ফেলেই বা কি করে যাওয়া যায়। এদিকে এডমণ্ড বলছে সে এমনি ভাবে মরতে প্রস্তুত আছে কিন্তু তাকে জাহাজে বয়ে নিয়ে যেতে সে যা কষ্ট পাবে তা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।

ক্যাপটেন অনেক ভেবে চিন্তে বল্ল "আচ্ছা আমরা না হয় দুদিন দেরী করেই রওনা হব।"

এডমণ্ড কিন্তু তাতে আপত্তি করল সে বল্ল "তা হতেই পারে না আমি নিজের দোষে ভুগছি তার জন্যে সকলে অসুবিধা ভোগ করবে কেন? আমাকে বরং কিছু বিস্কুট—একটা বন্দুক কিছু বারুদ আর টোটা দিয়ে তোমরা চলে যাও। তারপরে ফেরবার পথে আমাকে নিয়ে যেও।"

—"কিন্তু ভাল হবার আগে তুমি যে অনাহারে মরবে।"

—"তা মরতে রাজী আছি—কিন্তু এখন আমি নড়তে পারব না।

ক্যাপটেন এডমণ্ডকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছুক ছিল না—জাহাজ ছাড়বার আগে আর একবার তার মন বদলিয়েছে কিনা দেখতে এল।

ক্যাপ্টেন্ বললে—"দেখ আমরা বোধ হয় এক সপ্তাহের আগে ফিরতে পারব না—এমন কি আরও দেরী হতে পারে।"

এডমণ্ড বললে—"তবে আমার কথা শোন—তোমরা যদি যাবার পথে কোন জাহাজ দেখ তবে তাদের আমাকে নিয়ে যেতে বোলো—আমাকে তারা লেগহরণে যেন পৌঁছে দেয় ভাড়া যা লাগে আমি দেব। আর তা না হলে তোমরা ফেরবার পথে আমাকে নিয়ে যেও।"

ক্যাপ্টেন গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়তে লাগল—এই প্রস্তাবে বিশেষ খুসী হোল না।

জ্যাকোপো বললে—"দেখ ক্যাপ্টেন—এ যত দিন না ভাল হয় ততদিন আমি এখানে থাকি।

—"কিন্তু তোমার লাভের টাকা নেবে কে?"

—"আমি কিছু চাই না—"

এডমণ্ড বললে—জ্যাকোপো—তুমি বড় ভাল লোক—কিন্তু তোমার আমার কাছে থাকবার কোন দরকার নাই। আমি দু একদিনের মধ্যে ভালো হয়ে যাব—তখন আমি আমার একটা কিছু ব্যবস্থা করে নেব।"

এইরূপ বাকবিতণ্ডার পার ক্যাপ্টেন ও জ্যাকোপো জাহাজে ফিরে গেল।

কয়েকবার তারা এডমণ্ডের দিকে ফিরেও তাকাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা নঙ্গর তুলিয়া ফেলিল—এক ঘণ্টার মধ্যেই এমিলিয়া জাহাজ দূরে যেখানে আকাশ ও সমুদ্র মিশিয়াছে সেই সীমা রেখা অতিক্রম করিয়া চক্ষের বাহির হইয়া গেল। মানুষের বসবাসহীন নির্জ্জনদ্বীপে এডমণ্ড এখন একলা হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিমলেন্দু সরকার

সৃষ্টি

আপনার হাতে রচা এই যে বাগিচা,
যেথা হাসে যুথি, বিছান যেথায় ঘাসের গালিচা,
গোলাপ কেয়ারি, ছাটা মেহদির বাবরি
বকুল আবলি আসে, লাজে ভীরু, আনন আবরি,
কেতকী কাঁটায় থাকে শুয়ে, আনন্দে কদম্ব দোলে,
সন্ধ্যায় নীরবে কুন্দ নত আঁখি খোলে,
সন্ধ্যামণি রাঙা মুখ হাসি দিয়ে ভরা,
নিশি-গন্ধা বহি আনে বন্ধু লাগি সুরভি পসরা,
শান্তিময়ী যামিনীর চন্দ্রাতপ তলে,
তার পানে চেয়ে আর সাধ্যকার, কোন মুখে বলে
নাই ভগবান এই সৃষ্টির মাঝারে ?
এই শান্তি, এই প্রীতি, গোধূলির এ আলো
আঁধারে,
আমি যে ইসারা তাঁর পেয়েছি হিয়ায়,
নিজ হাতে রচা এই এতটুকু ফুল বাগিচায় ॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

পুতুল

রুবি বলল "মা, আমার পুতুলটা যদি মানুষের মত আমার সঙ্গে কথা বলত, ত কেমন মজা হত!"

মা বললেন "সত্যি, তা হ'লে তোমার খুব ভাল লাগত! যদি সত্যি পুতুলরা মানুষের মত কথাবার্ত্তা ও চলাফেরা করে তা হ'লে ওদের ভূতে পেয়েছে বলে তুমি ভয় পাবে। তার চেয়ে পুতুল যেমনটি আছে, অমনিই ভাল, তাই নয় কি?

এমন সময় রুবির মাকে রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি যেতে হল, তিনি চলে যাবার পর রুবি খাটের উপর পুতুলকে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

হঠাৎ রুবি শুনতে পেল যেন কার পায়ের শব্দ হচ্ছে, সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তার সব চেয়ে বড় পুতুল রুনু তার পাশে এসে দাঁড়াল। রুনু তার স্বাভাবিক আকারের চেয়ে চার গুণ বড় হয়েছে, আর সে নিজে যেন একটা বেড়াল ছানার মত ছোট্ট হয়ে গেছে।

রুনু খুব কঠোর স্বরে বলে উঠল "রুবি এখন তোমায় আমি স্নান করাব আর তোমার চুল আচড়ে দেব।"

রুবি খুব রেগে বললে "বটে আমি তোমায় কখন তা করতে দেব না। এই শীতের দিনে বিকাল বেলায় কেউ কখন ছোট ছেলে মেয়েদের স্নান করায়—এমন অদ্ভুত কথা কেউ কখন শুনেছে?"

রুনু বলল "আচ্ছা দেখি কার কথা থাকে। আমি এখন কর্ত্রী ঠাকরুণ হয়েছি, আমি যা বলব তোমায় তাই করতে হবে।"

এই বলেই সে রুবির একটা হাত ধরে তাকে টেনে উঠাল এবং নিজে খাটের উপর বসে তাকে কোলে নিল, পরে কলতলায় নিয়ে গিয়ে তার গায়ে সাবান মাখাতে লাগল।

তখন রুবি চীৎকার করে বলল "তোমার কি সাহস, তুমি যদি এখনি না থাম তবে তোমায় ঐ আলমারির ড্রয়ারে এক মাস বন্ধ করে রাখব।"

রুনু বলল "ও! তুমি যদি চুপ না কর তবে ওই পুতুলের বাক্সে তোমায় বন্ধ করে রাখব। তুমি দেখতে পাচ্ছ না, তুমি যেমন ইচ্ছা করেছিলে যে আমি যেন মানুষের মত হই, তাই ত হয়েছি! এখন তুমি মজাটা বোঝ! পুতুলকে তোমার ইচ্ছামত যখন তখন তাকে নিয়ে যা খুসী তাই করতে! কত সময় যে তুমি আমায় এ বাক্সে আর আলমারীর মধ্যে বন্ধ করে রেখেছ!"

এই বলে সে রুবিকে বগলে করে মাথাটা নীচের দিকে ঝুলিয়ে ঘরে নিয়ে চলল। এমন সময় টেবিলের উপর একটা গল্পের বই দেখে সে তাড়াতাড়ি রুবিকে মেজের উপর রেখে, তার কাছে বসে গল্পের বই পড়তে লাগল, আর রুবির কথা ভুলেই গেল।

সেদিন বড শীত ছিল, বেচারী রুবি মাটির উপরে শুয়ে পড়ে থেকে শীতে কাঁপতে লাগল আর বলতে লাগল আমায় গরম কাপড় চোপড় পরিয়ে দাও, লক্ষ্মিটী!"

কিন্তু রুনু ওর কথা একটুও শুনল না সে গল্পেতে ডুবে ছিল। একটু পরে সে বিছানায় আরামে শুয়ে বই প্:তে লাগল।

আর একটা পুতুল, তার নাম ছিল টুনু, সেও

দেখতে দেখতে রুনুর মত মস্ত বড় হয়ে উঠল। আর রুবির কাছে এসে রুনুর দিকে ফিরে বলল "রুনু, তোমার যদি রুবিকে নিয়ে খেলা শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে আমি কিছুক্ষণ তাকে নিয়ে খেলতে চাই।"

রুনু বলিল "আচ্ছা, আমি আর ওকে চাই না। ওর মুখটা ধুয়ে দাও, বড় ময়লা হয়ে রয়েছে।" এই বলেই সে আবার মন দিয়ে বই পড়তে লাগল।

টুনু একটা ন্যাকড়া নিয়ে রুবির চুল ধরে তার মুখ জোরে জোরে ঘস্‌তে লাগল। তারপরে সে একটা ছেঁড়া ময়লা তোয়ালে দিয়ে তার মুখটা জোরে মুছে দিল। তারপরে একটা ছোট্ট জামা তার গায়ে জোর করে পরিয়ে দিতে লাগল, জামায় হাত ঢুকাবার সময় তার হাত দুটা মুচড়িয়ে দিতে লাগল। তারপরে চুল আচড়াবার পালা এল,—সেটা সব চেয়ে কষ্টকর হল। টুনু শেষে করল কি চুলের মধ্য দিয়ে একটা পিন ঢুকিয়ে দিল, সেটা রুবির মাথায় বিঁধে গেল।

তখন বেচারী রুবি যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলে উঠল "কি অস্পর্দ্ধা। আচ্ছা এর শাস্তি আমি দেবই দেব, তখন টের পাবে!"

কিন্তু টুনু রুবির কথা গ্রাহ্যও করল না সে নিশ্চিন্ত মনে রুবিকে নানা রকমে কষ্ট দিতে লাগল।

হঠাৎ টুনু জানালা দিয়ে দেখল যে বিকালে বেশ রোদ হয়েছে। আর বাগানে সুন্দর ফুল ফুটেছে। সে তখনি খেলনার বাক্সটা খুলল। সে বাক্সর মধ্যে রেলগাড়ী, টিনের ঘোড়া, মোটর গাড়ী, লাট্টু, চায়ের বাসন ইত্যাদি নানা জিনিষ ছিল, তারই উপরে রুবিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে বাগানে চলে গেল ও রুনুকে বলল "রুনু, চল বাগানে গিয়ে খেলা করি।

রুনু বই রেখে খুব খুসী হয়ে, বাগানে চলে গেল। রুবির তখন হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, খুব শীত করছে আর টিন ইত্যাদি লেগে হাত পা ছিড়ে গেছে, সে যেই কাঁদবার চেষ্টা করছে, এমন সময় মার কথা শুনতে পেল। মা বলছেন "রুবি, সন্ধ্যে হয়ে এল যে, উঠ, কতক্ষণ ঘুমুবি, বলত? চল, খেতে চল।"

বর্ষার সুর

১

ঝম্ ঝম্, ঝম্ ঝম্, ঝম্ ঝম্,
বর্ষার জল পড়ে হরদম্।
ভেক ডাকে একঘেয়ে মল্লার,
পুকুরে ফুটেছে কত কহ্লার,
পথে ঘাটে ছেয়ে গেছে কর্দ্দম।

২

রিম্ ঝিম্, রিম্ ঝিম্, রিম্ ঝিম্,
বাজিতেছে বরষার ডিণ্ডীম।
জলো মেঘে ছেয়ে গেছে অম্বর
বরষা সেজেছে প্রলয়ঙ্কর,
পাখী গুলো ভিজে হ'ল হিম সিম্।

৩

শন্ শন্, শন্ শন্, শন্ শন্,
জলো হাওয়া ছোটে ওই বন্ বন্।
কাঁপে তরু বিথীকার অঙ্গ,—
হাহাকার উঠে জুড়ে বঙ্গ,—
গৃহহীন চাষা কাঁপে কন্ কন্।

৪

গুড়্ গুড়্, গুড়্ গুড়্, গুড়্ গুড়্,
ওই বুঝি মেঘ পড়ে হুড়্ মুড়্।
শিখী দেছে সুরু করে নর্ত্তন,
চাষাদের হ'লো আশা বর্দ্ধন,
বিবরে লুকায় শিবা সুড়্ সুড়্।

৫

টুপ্ টাপ্, টুপ্ টাপ্, টুপ্ টাপ্,
টুনটুনি ওই দেখ ভেজে জাব।
ভরা নদী ছুটে চলে রঙ্গে,
রূপাঝলে সবুজের অঙ্গে,
দুষ্টু বালক আজ চুপ্ চাপ্।

৬

থম্ থম্, থম্ থম্, থম্, থম্,
বহুকাল গেছে থেমে ঝম্ ঝম্।
ঘোলাটে ফ্যাকাশে দেখ অম্বর,
থেমেছে বরষা-যাদু-মন্তর।
ভেক করে হাঁক্ ডাক্ হরদম্।

শ্রীবিমলচন্দ্র দত্ত

পিপীলিকা

সাধারণতঃ দেখা যায় যে পোকা মাকড় প্রায় একলাই বাস করে। কখন কখন হয়ত দু' এক জোড়া এক সঙ্গে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু সেই জাতের অন্যান্য পোকাদের গতিবিধি, কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে তাহারা একেবারে উদাসীন। বোলতা, মৌমাছি, পিপীলিকা, এরা সমাজ বদ্ধ জীব। এর মধ্যে পিপীলিকারাই সামাজিক জীবনের উচ্চ অবস্থায় আসিতে পারিয়াছে।

পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের চূড়া হইতে সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত, সকল স্থানেই পিপীলিকাদের দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের বাসগ্রাম অন্যান্য সামাজিক পোকা হইতে দীর্ঘকাল স্থায়ী ও উহারা সংখ্যায় বেশী। মৌমাছি ও বোলতাদের গ্রাম প্রতি বৎসরে গড়িয়া উঠে আর ভাঙ্গিয়া যায়।

পিপীলিকারা অন্য অনেক পোকার মত অপুষ্টিকর খাদ্য খায় না, আবার মৌমাছিদের মত মধু ও ফুলের রেণু খাইয়াই জীবন ধারণ করে না। আর তাহারা মৌমাছিদের মত অমন দামী জিনিষ মোম দিয়া, বহু পরিশ্রম করিয়া, ঘর তৈয়ারী করে না। মোম কিম্বা কাগজ দিয়া তৈয়ারী ঘরগুলিকে সহজেই পরিবর্ত্তিত কিম্বা তাহাদের সংস্কার করা যায় না। এইরূপ ঘর তৈয়ারী করিতে বহু পরিশ্রম ও সময় লাগে। যদি কখন খাদ্যদ্রব্য ফুরাইয়া যায়, কিম্বা সে স্থানের আবহাওয়া কষ্টকর হয়, কিম্বা বাসাগুলি যদি কোনরূপে ভাঙ্গিয়া যায়, তবে তাহাদের সন্তান লইয়া কোন নূতন নিরাপদ স্থানে যাওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

পিপীলিকাদের শত্রু খুব কম। তাহাদের বাড়ীতে অনেকে বেড়াইতে আসে, যেমন আমাদের বাড়ীতে বিকাল বেলায় কত বন্ধু-বান্ধব গল্প করিতে আসেন। মিঃ ফ্লোরেল পোকাদের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ, তিনি বলেন পিপীলিকারাই পিপীলিকাদের প্রধান শত্রু—যেমন দেখা যায় মানুষই মানুষের প্রধান শত্রু। তোমরা জান যুদ্ধের সময় কত মারমারি কাটাকাটি হয়, দুই পক্ষে কত হাজার হাজার মানুষ মানুষেরই ছোড়া-বন্দুক ও কামানের গোলায় প্রাণ হারায়।

সাতাশটী ভিন্ন রকমের পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। পিপীলিকাদের প্রত্যেক গ্রামেই যে ২৭ রকম পিপীলিকা থাকে তাহা নয়। সাধারণতঃ এক এক গ্রামে পাঁচ রকম ভিন্ন জাতের পিপীলিকা বাস করে। ডানাযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষ পিপীলিকা, প্রধান ও সাধারণ মজুর, আর কতগুলি সৈন্য পিপীলিকা লইয়া এক একটি দল গঠিত হয়। কখন কখন আর এক জাতের পিপীলিকা দেখা যায়, তাহাদের "নাস্যুতি" বলে। "নাস্যুতি" মানে যাহাদের নাক আছে। ঘর ভাঙ্গিয়া গেলে নাস্যুতিরা তাহা পুনরায় তৈয়ার করিয়া দেয় এবং জীর্ণ স্থানের সংস্কার করে।

স্ত্রী পিপীলিকাদের দেহ হইতে একরূপ রস বাহির হয়, তাহা দ্বারা তাহাদের সন্তানদের শরীর পুষ্ট করে। সন্তানদের কার্য্যক্ষম হইতে কখন কখন দশ মাস লাগে। ততদিন তাহাদের মাতা

(রাণী পিপীলিকা) অন্য কোন খাদ্য আহার করেনা—সেও তাহার দেহ হইতে নির্গত রস খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। সন্তানরা বড় হইলে তাহারা ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসে এবং বাস করিবার জন্য অন্য ঘর তৈয়ারী করে। তাহারা নিজেদের জন্য ও শ্রান্ত ক্লান্ত রাণীমার জন্য খাবার সংগ্রহ করে। ইহার পর রাণী পিপীলিকা শুধু ডিম পাড়িতে থাকে ও তাহার সেবকদের জিব হইতে জলীয় খাদ্য আহার করে। রাণীরা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

প্রত্যেক পিপীলিকারই নির্দ্দিষ্ট কাজ থাকে। কেহ কেহ নবজাত পিপীলিকাদের লালন পালনের ভার লয়। তাহারা শিশু পিপীলিকাদের আহার করায়, দেহ পরিষ্কার করিয়া দেয়, আর যখন যেরূপ আবহাওয়া হয় সেই অনুসারে তাহারা গ্যালারির এক কুঠুরি হইতে অন্য এক কুঠুরিতে স্থানান্তরিত করে। যদি অন্য কোন পোকা আসিয়া বাসা ভাঙ্গিয়া দেয়, তখন তাহারা উহাদের নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়। পিপীলি-কারা শিশুদের কিরূপ যত্ন করে তাহা জানিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

অপুষ্ট শিশু পিপীলিকাদিগকে তাহারা প্রথমে অন্ধকার কুঠুরিতে রাখে, আলোতে বাহির করেনা। মিঃ হুইলার বলিয়াছেন মরুভূমিতে তিনি দেখিয়াছেন যে যেমন সন্ধ্যাকালে আয়ারা শিশুদের নির্ম্মল উন্মুক্ত বায়ু সেবন করাইবার জন্য বাগানে কিম্বা মাঠে তাহাদের ঠেলা গাড়ী করিয়া বেড়াইতে লইয়া যায়, তেমনি পিপীলি-কারা রাত্রি ৯টার সময় তাহাদের বাসার সম্মুখে বড় গর্ত্তের মধ্যে পিপীলিকা শিশুদের লইয়া এধার ওধার বেড়াইতে থাকে।

এরকম দেখা গিয়াছে যে অন্য জাতের পোকা আসিয়া পিপীলিকাদের বাসায় বসবাস করি-তেছে। তাহারা পিপীলিকাদের অনেক উপকার করিয়া থাকে। উহাদের দেহ হইতে মধুর ন্যায় মিষ্ট এক প্রকার রস বাহির হইতে থাকে ও পিপীলিকারা তাহা আগ্রহের সহিত পান করে। এই পোকারা কচি নরম পাতার উপর বাস করিতে ভালবাসে। পিপীলিকারা ইহাদের খুব যত্ন করে, বিপদের সম্ভাবনা হইলে ইহাদের নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়। এমন কি পিপীলি-কারা ইহাদের ডিম ও সন্তানদের খুব যত্ন করে। আমরা যেমন গরুর দুধ পান করি ও গরুদের কত যত্ন করি, আর গরু আমাদের গৃহপালিত জন্তু; এ পোকারাও পিপীলিকাদের সংসারে সেইরূপ ভাবে ব্যবহৃত হয়। তোমাদের খুব আশ্চর্য্য লাগিতেছে, না?

পিপীলিকাদের বাড়ীতে অনেক অতিথি আসে। কেহবা শত্রুতা সাধন কেহবা বন্ধুত্ব করিতে আসে। এক রকম লাল পোকা পিপীলি-কাদের অতিথি হয়, পিপীলিকারা তাহাদের অতি যত্ন ও সমাদর করে। ঐ পোকাদের দেহে হলুদ কিম্বা লাল রঙের চুলের গুচ্ছ আছে। ঐ স্থান হইতে যে রস নির্গত হয়; পিপীলিকারা তাহা সন্তুষ্ট চিত্তে পান করে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অধ্যাপক ডিরেনফার্থ যাত্রার পূর্ব্বেই পথের আবশ্যকীয় সকল প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন। পাহাড়ের পথে কি কি ধরণের জিনিষের দরকার হবে, তা ভেবে-চিন্তে, অনেক পরামর্শ করে স্থির করতে হয়াছিল। এত আর দিল্লী কি শিলং সহরে বেড়াতে যাওয়া নয়, যে গরম কাপড়-চোপড়, সুটকেশ ও বিছানা বেন্ধে লয়ে রেল গাড়ীতে চাপলেই হ'ল, খাবার ইত্যাদিত পথেই মিলবে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা যাত্রীদের পাহাড়ে উঠবার পথে লোকজনের বসতি নাই; কাজেই, বরফে ঢাকা পথে চলবার জন্য তাদের দরকারী প্রত্যেকটি জিনিষ মুটের মাথায় বয়ে লয়ে যেতে হয়েছে। আর জিনিষও কম দরকার হয় নাই। যাত্রীরা মুটে-মজুর লয়ে, সংখ্যায় চার পাঁচ শ'র কম নয়। এদের জিনিষ পত্র লয়ে যাওয়াও এক বিরাট ব্যাপার।

কোন পথ দিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে হবে তা ঠিক করবার পরেই অনেকগুলি তাঁবু, যথেষ্ট কাপড়-চোপড়, ঘুমোবার থলে তৈয়ারী করতে হ'ল। বরফের পাহাড়ের পথে, বিষম ঝড় ও অতিহিম হ'তে শরীর রক্ষা করবার জন্য যাত্রী-দিগকে এই থলের মধ্যে সমস্তটা শরীর ঢুকিয়ে দিয়ে, শুধু মুখটি বার করে রাত্রে ঘুমুতে হবে। তাঁবুগুলি খুব মোটা শক্ত কাপড়র দিয়ে তৈয়ার করতে হয়েছে, যেন প্রচণ্ড বরফের ঝড় সইতে পারে। তাঁবুর ভিতরে পাথরের উপর পাতবার জন্য এক ইঞ্চি পুরু রবারের চাদর চাই। এই রবারের উপর বিছানা পাতলে গায়ে পাথর ফুটবে না। যাত্রীদেরও সঙ্গীয় মুটে মজুরদের জন্য নিত্য ব্যবহার্য্য আহারের দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে প্রথম বিশ্রাম তাঁবুতে মজুত করতে হয়েছে। আবার পাহাড়ে যতই উপরে উঠা যায়, ততই অত্যাধিক পরিশ্রম হয়। সেজন্য ক্রমশঃ ক্ষুধা কমে যায়। কাজেই যাত্রীদের শরীর সবল ও সুস্থ এবং মনে স্ফূর্ত্তি রাখিবার জন্য নানা প্রকার সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্যেরও যোগাড় করতে হয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারা গিয়েছে বিশ হাজার ফিট পাহাড়ের উপরে উঠ্‌লে যাত্রীদের ক্ষুধা এত কমে যায় যে তখন জোর করে খেতে হয়। এখানে মানুষের পাকস্থলী শুধু সাদাসিধে খাবার যেমন, চিনি, জ্যাম, জমান দুধ, বিস্কুট, সরবৎ, মিষ্টি, হজম করতে পারে। যে সব খাদ্য খেলে, শরীরে তাপ বাড়ে, এত উচুতে তাই খেতে হয়। সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, পাহাড়ের চূড়ায় উঠ্‌তে গেলে, সাধারণ আহার্য্য বাদে, আরো অনেক প্রকার দরকারী খাদ্যের বন্দোবস্ত থাকা চাই। ইহার মধ্যে পানীয় জলের বন্দোবস্ত করাই প্রধান কাজ। যত উপরে উঠা যায়, বাতাস ততই শুষ্ক হয়, আর শরীর থেকে তাড়াতাড়ি জলীয় ভাগ উড়ে যায়। ফলে ক্ষণে ক্ষণে পিপাসা পায়, গলা শুকিয়ে যায়, তখন কিছু জলীয় পান না করলে কষ্ট হয়। এত উচু পাহাড়ের উপর জল কোথাও নাই, জল

জমে বরফ হয়ে আছে। বরফ গলাতে পারলে জল পাওয়া যায়। কিন্তু কয়লা কিম্বা কাঠের বোঝা মুটের পিঠে ব'য়ে অত উচুতে লয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আবার বরফ গলাতে অনেক পরিমাণে কয়লার দরকার। তবে উপায় কি? এজন্য যাত্রীরা এক প্রকার ধুমহীন হালকা রাসায়নিক কয়লা সঙ্গে লয়ে গিয়েছেন। ইহার একটুতেই সহজে তীব্র উত্তাপ পাওয়া যায়।

পাহাড়ের চুড়াতে উঠতে আর একটা জিনিষের খুব দরকার হয়। যতই উপরে উঠা যায়, হাওয়া ততই হাল্কা হয়, অনেকের নিশ্বাস লওয়া-কষ্টকর হয়। এজন্য "অক্সিজেন" চাই। গৌরী-শঙ্কর অভিযানের সময়, যাত্রীরা অক্সিজেন তৈয়ার করিবার একটা ভারী যন্ত্র সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবারে রাসায়নিকের বুদ্ধির সাহায্যে একাজ সহজেই সেরেছেন। যাত্রীরা কাঞ্চন-জঙ্ঘার পথে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য সঙ্গে লইয়াছিলেন, যাহা বন্ধ তাঁবুর ভিতরে পোড়াইলে অক্সিজেন গ্যাসে তাঁবু ভরে যায়। কাজেই এদের অক্সিজেন যন্ত্র সঙ্গে লইতে হয় নাই।

তোমরা যাত্রীদের আসবাব পত্রের কথা মোটামুটি জানতে পারলে। এখন তাদের পোষাক-পরিচ্ছদের কথা একটু শোন। পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা হ'তে যাত্রীরা জেনেছেন যে ধীরে ধীরে পর্ব্বতের উপরে উঠতে উঠ্‌তে শরীরকে শীতের কষ্ট সহিয়ে নিতে হবে। যাত্রীদিগকে কয়েকটা পাতলা পশমের গেঞ্জি ইত্যাদি গায়ে দিয়ে তার উপরে একটু মোটা পশমের কোট ও তার উপরে আর একটা কোট পরতে হবে। সব উপরের কোটটা এ রকম জিনিষ দিয়ে তৈরী হবে

যার মধ্য দিয়ে বাতাস কোন রকমে যেন না ঢুকতে পারে। পায়ে বুট জুতা পরতে হবে, কিন্তু সেটাও এত বড় হওয়া চাই যে কয়েক জোড়া মোজা পরেও যেন তার মধ্যে পা ঢুকান যায়। আর সেই জুতার তলায় বেশ পুরু করে রবার, গরম ফেল্ট কাপড় ও চামড়া লাগাতে হবে, যেন বরফের উপর দিয়ে চললেও পা গরম থাকে। হাতেও প্রথমে আঙ্গুল-খোলা পশমের দস্তানা পরতে হবে, তার উপরে এমন কাপড়ের তৈরী আর একটা দস্তানা পরতে হবে যার মধ্য দিয়ে বাতাস ঢুকতে না পারে। আর মাথায় পশমের এবং চামড়ার দুই রকম টুপিই পরতে হবে।

চোখে কাল পুরু চশমা পরতে হবে, তা না হলে বরফে ঢাকা পাহাড়ে প্রতিফলিত প্রখর সূর্য্যের আলো চোখে লাগলে চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। সূর্য্যের তীব্র আলো মুখের উপর পড়লে চামড়া ফেটে ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এমন কি জ্বর হয়, সেজন্য চামড়ার মুখোস পরতে হয় ও মুখে "ক্রীম" মাখতে হয়।

মার্চ্চ মাসের শেষে ও এপ্রিল মাসের প্রথমে যে পার্ব্বতীয় পথ দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা যাত্রীরা যাচ্ছিলেন সে পথে বড় বড় গাছে চিত্র বিচিত্র মনোহর গন্ধ "অর্কিড" গুচ্ছে গুচ্ছে ঝুলছিল—অপূর্ব্ব রঙে রঞ্জিত প্রজাপতি সুগন্ধ ভরা বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল, আর ফুলের উপর বসছিল। এ সময়ে চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনমুগ্ধকর। কয়েক দিন পরেই যাত্রীরা পর্ব্বতের উপরে ঠাণ্ডা দেশে গিয়া পৌছিলেন। সেখানে রডডেণ্ড্রন ফুলগুলি সবে মুকুলিত হচ্ছে, আর লাল, বেগুনি, হলদে রঙের ফুলগুলি সবুজ পাতার সমুদ্রের মধ্যে স্নান করে যেন হাসছে। এখানে গরম দেশের গাছ জন্মায় না। শুধু পাহাড়ী সরু লম্বা ঝাউ জাতীয় গাছ দেখা যায়। আরও উপরে উঠলে, আর গাছ, ফুল কিছুই দেখা যাবে না। তখন শুধু চারিদিকে বরফ আর পাথর। বরফ সাদা মন্দিরের চূড়ার আকারে নীল আকাশের কোলে দাঁড়িয়ে আছে।

১৫০০০ হাজার ফিট উপরে উঠলে পর্ব্বতের সঙ্গে যাত্রীদের লড়াই আরম্ভ হবে। এত উপরে উঠলে প্রধানতঃ তিনটি অসুবিধা ভোগ করতে হয়। প্রথমত সে যায়গার তাপ খুব কম, কাজেই শীত খুব বেশী। অবশ্য আবশ্যক মত গরম কাপড়-চোপড় পরলে শীতের কষ্ট ভোগ করতে হয় না। কিন্তু আর এক প্রধান বিপদ এই যে বাতাসের বেগ সমান থাকে না। বাতাস যদি স্থির ধীর ভাবে বইতে থাকে, তবে গরম কাপড়-চোপড় পরলে আরামে থাকা যায়, কিন্তু এখানে প্রায়ই ভীষণ ঝড় বইতে থাকে। বিশেষতঃ মে ও জুন মাসে ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় অতিশয় জোরে বাতাস বইতে থাকে। এই শীতে কনকনে ঝড়ের বাতাস যেন শরীরে বিঁধতে থাকে। আর যখন কাচের গুঁড়ার মত বরফের গুঁড়া গুলি ধোঁয়ার আকারে বাতাসেব মুখে উড়তে থাকে, তখন মানুষের বোধশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি যেন লোপ পায়। সমতল ভূমিতে যেখানে বাতাস এমন পাতলা নয় সেখানে শীতের সময়েও ঝড়ে এমন কষ্ট হয় না।

এই সময়ে প্রায় সর্ব্বদাই আকাশ ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন থাকে। কোন ধাতু (সোনা, রূপা, তামা কি সিসা) খালি হাতে স্পর্শ করা যায় না। আগুনে পোড়ান লাল লোহার জিনিষে হাত দিলে, যেমন হাত পুড়ে যায়, ধাতুর তৈরী কোন জিনিষে খালি হাত দিলে, সেই রকম কষ্ট হয়। এ যায়গায় রান্না করাই মুস্কিল,
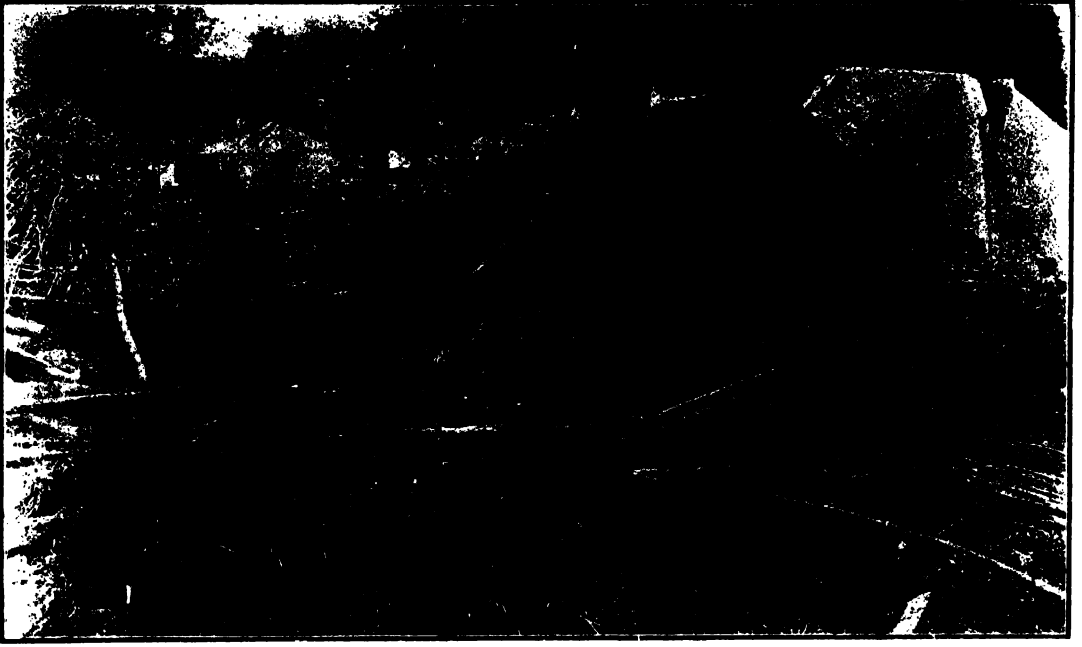
কারণ বরফ আগুনে গলিয়ে তবে জল পাওয়া যাবে। কাজেই গরম গরম টাটকা রান্না করা খাদ্য পাওয়া দুষ্কর। শীতের কষ্ট, তুষারের ঝড়ের কষ্ট, আবার এত উঁচুতে বাস করার নানা অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করতে হয়।

অনেকে ১০,০০০ হাজার ফিট উঁচুতে উঠলেই এক রকম "পার্ব্বত্য পীড়ায়" ভোগেন; জাহাজে চড়ে সমুদ্রে গেলে লোকের সামুদ্রিক পীড়া হয় গা বমি বমি করে, ক্ষিধে থাকে না, এও কতকটা সেইরূপ। অবশ্য জার্ম্মানী যাত্রীরা সকলেই উঁচু পাহাড়ে উঠতে দক্ষ, কাজেই ২০,০০০ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উঠলে শারিরীক কোন কষ্ট তাঁদের অক্ষম করে ফেলবে না। এত উপরে উঠলে শ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়, কাজেই নড়া চড়া করতে অসুবিধা। তখন আস্তে আস্তে চলা-ফেরা করতে হয়, আর শরীরকে গরম রাখতে বেগ পেতে হয়।

আর একটা কথা, অত উপরে উঠলে সেখানকার আবহাওয়ায় ঘুম হয় না। রাত্রির পর রাত্রি নিদ্রায় শ্রান্ত ক্লান্ত দেহকে বিশ্রাম না দিয়ে, ক'জন লোক এ রকম বিপদ ও কষ্ট সহ্য করতে পারে? যত উপরে উঠা যায়, লোকের কষ্ট তত বাড়তে থাকে, কাজেই মানুষ আর কত সহ্য করবে! মানুষের শরীর ত রবারের তৈরি নয় যে একে ইচ্ছামত বাড়ান কি কমান যায়। পাহাড়ের অনেকটা উপরে উঠলে সে যায়গায় মানুষের পক্ষে বেশী দিন বাস করা অসম্ভব; যতই দিন যেতে থাকে, মানুষের আবহাওয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার ক্ষমতা ততই কমে আসে। সেজন্য কাঞ্চনজঙ্ঘায় আরোহন করতে হ'লে প্রথম ভাগটা ধীরে ধীরে শরীরটাকে সহিয়ে সহিয়ে উঠতে হবে, পরে যখন চূড়ার কাছে পৌঁছান যাবে তখন খুব তাড়াতাড়ি উঠার কাজ সেরে নিতে হবে।

কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়াতে উঠবার জন্য যাত্রীদিগকে
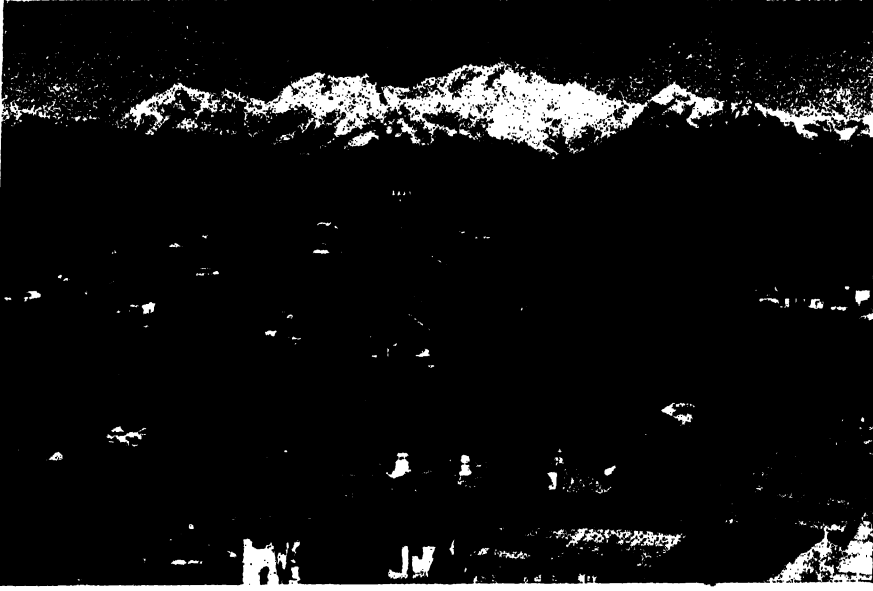
দেহের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে হবে। ঐ স্থানে উঠবার সময় প্রকৃতির সহিত মানুষের শক্তির যুদ্ধ গভীর হতে থাকে। উঁচু পর্ব্বতে উঠতে কি কি বাধা নিশ্চয়ই পেতে হবে তা বলিলাম। এখন পথে আর কি কি বাধা পাওয়া সম্ভব তা শোন।

এপ্রিল ও মে মাসে উপত্যকা থেকে উপরে গরম বাতাস বইতে থাকে, আর বরফ গলতে সুরু হয়। শীতের সময় বরফ জমে, যে সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর পাহাড়ের গায়ে আটকে ছিল, বরফ গলতে সুরু করাতে, সেগুলি আলগা হতে আরম্ভ হয়। তখন বরফ স্তূপ আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর উপর থেকে ধসে পড়তে থাকে; পথে যে সব জিনিষ পড়ে, বরফের স্তূপ সে সব ভেঙ্গে চুরে নিয়ে চল্‌তে থাকে। এই চলন্ত স্তূপ যতই নীচে নামতে থাকে ততই পতনের বেগ দ্রুত হয়, আর সমস্ত পিষে ফেলে ধ্বংস করতে করতে, পাশের স্থান কম্পিত করতে করতে ছুটতে থাকে। এসময়ে কে তার গতি রোধ করতে পারে বা তার সম্মুখে দাঁড়াতে পারে? এই বরফের স্তূপ ৫।৬ হাজার ফিট নীচে নেবে আসে। এতে ক্ষুদ্র মানুষ যে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? বরফস্তূপ পাথর সমেত নিশ্চয়ই উপর থেকে গড়িয়ে পড়তে থাকবে কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা যাত্রীরা যে পথ দিয়ে যাবে সেই পথ দিয়ে পড়তে না-ও পারে। যাত্রীরা যথাসম্ভব নিরাপদ পথ বেছে নিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছেন।

যাত্রীদের আর এক বিপদ হচ্ছে ঝড়। কেউ বলতে পারেনা পাহাড়ে কখন ঝড় আরম্ভ হবে। অত উঁচুতে বাতাস প্রথমে ধীরে ধীরে বইলেও, হঠাৎ ঝড়ে পরিনত হয়। অমনি বরফের গুড়া উড়তে থাকে, পথ-ঘাট আঁধার হয়ে যায়। আর তখন কত দিনের মত চলা-ফেরা করা অসম্ভব হয়।

কাঞ্চনজঙ্ঘায় উঠা গৌরিশঙ্করে উঠবার চেয়েও কষ্টকর। এর চূড়ায় বেশী পরিমাণে তুষার পড়ে, আবার এই বরফ গলে অনেকদূর নীচে চলে যায় ও গলা বরফের নদী চলে। কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার ঠিক নীচেই, উহার সম্মুখে কি পশ্চাতে, অন্যকোন চূড়ার শ্রেণী নাই, কাজেই যত ঝড় ঝাপটা একেই সহ্য করতে হয়, আর এই জন্যই এখানকার দৃশ্যও অপূর্ব্ব।
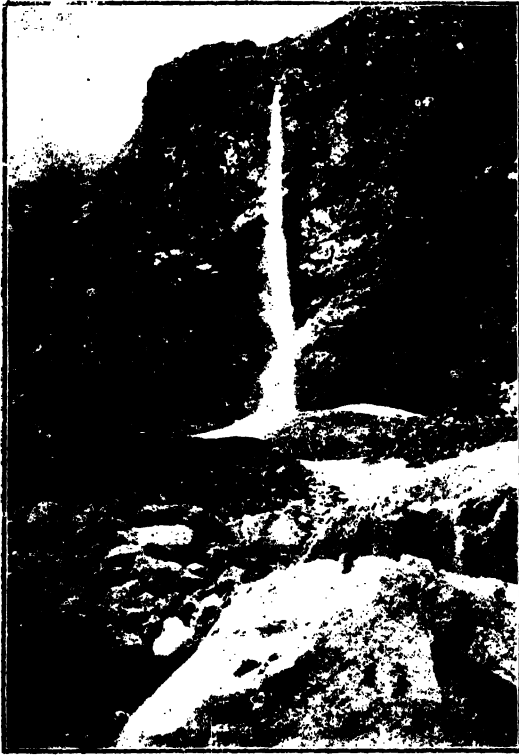
কাঞ্চনজঙ্ঘা যাত্রীরা নেপাল রাজ্যের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা ৫০০০ ফিট উপরে জনগ্রিতে পৌঁছেছেন। এই পথে তাঁরা বরফের ঝড়ের মধ্যে পড়েছিলেন। পথের পাশে পেমংসি বৌদ্ধ মঠ দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে "লামানাচ" দেখিয়ে যাত্রীদিগকে অভ্যর্থনা করা হয়, মন্দিরের পুরোহিতেরা কেউ মুরগি, কেউ ঘোড়া, কেউ গরুর মুখোস পরে নেচে ছিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ঢোল ও বড় বড় করতাল আর বাঁশী বাজছিল। চারিদিকে পাহাড়, দূরে পার্ব্বত্য নদীর গর্জ্জন, তার মধ্যে অদ্ভুত মুখোস ও পোষাক পরে লামারা নাচছিলেন। তোমরা এ দৃশ্য দেখলে মনে করতে যেন গল্পের রাক্ষসরা রূপ ধরে নাচতে আরম্ভ করেছে।

আবার এক বিপদ ঘটেছিল। যাত্রীদলের এক পাহাড়ী কুলি হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়ে আর এক কুলির বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল। তখন অনেক কষ্টে তাকে ধরে ফেলা হয়। আর যাত্রীদের সঙ্গে যে ডাক্তার ছিলেন, তিনি আহত কুলির চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করলেন।

পথে রঙ্গিত নদী পার হয়ে যখন যাত্রীরা যাচ্ছিলেন, তখন দেখলেন যে একটা বনে আগুন লেগেছে, আর বাঁশ গাছগুলি পুড়ছে ও কামানের মত শব্দ হচ্ছে। যাত্রীদের তাঁবু একটা ধানের ক্ষেতের মধ্যে ফেলা হয়েছিল। সে যায়গার চারিদিকে কত জোক আর পোকা, যে কি বলব। সেখানে এত ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল যেন মনে হচ্ছিল তাঁবুটাকে বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

যাত্রীদের মধ্যে কাহারও কাহারও ছোট খাটো অসুখ হয়েছিল, কিন্তু সকলেই ভাল ছিলেন। যাত্রীরা ২০ হাজার ফিট উপরে উঠেছিলেন। তারপর আর উঠতে পথ পেলেন না। কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছে হার মানতে হল। বিষম ঝড়ে ও বরফস্তূপের পতনে ইঁহারা বিপন্ন হয়েছিলেন। তবুও এগিয়ে চলেছিলেন। কিন্তু

আর উপরে উঠা সম্ভব হল না। এই পথে এখান থেকে বরফ-ঢাকা পর্ব্বতের পিঠ এত খাড়া যে তার উপর দিয়ে পথ করে যাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই যাত্রীরা কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় উঠার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। নিকটবর্ত্তী ২৪ হাজার ফিট উচু একটা পর্ব্বতের চূড়ায় উঠতে সমর্থ হয়েছেন। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত এত উচু পাহাড়ে আর কেহ উঠতে পারে নাই।

জার্ম্মানী যাত্রীরা কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্ব্বতের চূড়ায় উঠতে না পারলেও অনেক আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন। অনেক সুন্দর সুন্দর ফটোও তোলা হয়েছে।

স্বার্থপর দৈত্য

প্রতি অপরাহ্নে বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে বালক বালিকারা আসিয়া দৈত্যের বাগানে খেলা করিত।

সবুজ মখমলের মত ঘাসে-মোড়া বাগানটী দেখিতে খুব সুন্দর ছিল। সবুজ ঘাসের মাঝে মাঝে বিচিত্র বর্ণের সুন্দর সুন্দর ফুল, নীল আকাশের তারার মত শোভা পাইত। তাহাদের মধুর সৌরভে বাগানখানি সর্ব্বদা আমোদিত হইয়া থাকিত। বাগানে বারটি পিচ ফলের গাছ ছিল। শরৎ কালে পিচফলগুলি পাকিত। তখন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা সেই সব গাছে বাসা করিত আর সুস্বর লহরীতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিত। তাহাদের সুরের মধুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া বালকবালিকারা খেলা ভুলিয়া যাইত। তাহারা আনন্দের স্বরে বলিয়া উঠিত. "এখানে আমরা কি সুখেই খেলা করি।"

একদিন যাহার বাগান সেই দৈত্য ফিরিয়া আসিল। সে বহুদুরে এক পাহাড়ে তাহার বন্ধুকে দেখিতে গিয়াছিল। সে আসিয়া দেখিল তাহার বাগানে অনেকগুলি ছোট ছোট বালক-বালিকা খেলা করিতেছে। সে কর্কশস্বরে চেঁচাইয়া বলিল "তোরা সব এখানে কি কর্‌ছিস।"

শিশুরা তাহার ক্রুদ্ধস্বর শুনিয়া ভয়ে পলাইয়া গেল। দৈত্য আপন মনে বলিল,"আমার বাগান আমারই থাকবে, একথা সকলেই বলবে। আমি বাইরের আর কাউকেই এ বাগানে ঢুকতে দেব না।" এই বলিয়া সে বাগানের চারিদিকে খুব উঁচু একটা দেওয়াল তুলিয়া দিল। এবং ফটকের উপর বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিল!

"বাহিরের লোকেরা এখানে আসিলে
অভিযুক্ত হইবে।"

এই দৈত্য বড় স্বর্থপর ছিল। বেচারী বালক বালিকারা সেই বাগানে ঢুকিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে তাহারা বাগানের চারিদিকের দেওয়ালের পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত, আর দুঃখিত হইয়া বলাবলি করিত, "ভাই, এর মধ্যে কেমন সুন্দর বাগানখানি রয়েছে, আমরা সেখানে কেমন আনন্দে খেলা করতাম।"

তারপর একদিন বসন্তকাল আসিল। বাগানের জঙ্গল গাছে গাছে ফুলে ফুলে ছাইয়া গেল, কত রকমের পাখীর স্বর লহরীতে সমস্ত দেশ মুখরিত হইতে লাগিল। ফুলের শোভা ও সৌরভে আর পাখীর গানে সমস্ত দেশ যেন আনন্দে মাতিয়া উঠিল।

কিন্তু ঐ স্বার্থপর দৈত্যের বাগানে বসন্ত আসিল না। বাগানে শিশুদের প্রবেশ নিষেধ বলিয়া কোনো গাছে ফুলও ফুটিলনা, পাখীরাও গান করিল না। একটী ফুল ঘাসের নীচে হইতে মাথা তুলিতে যাইতেছিল কিন্তু ফটকের বাহিরের ঐ বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে শিশুদের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আবার ঘাসের নীচে মাথা গুজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

বাগানে কেবল বরফ আর তুষারের মেলা

হইল। তাহারা চিৎকার করিয়া বলিল, "বসন্ত এ বাগানে আসতে যখন ভুলে গিয়েছে, আমরাই তখন এখানে সারা বৎসর রাজত্ব করব।" সেই বাগানে তুষার ও বরফের সঙ্গে প্রচণ্ড উত্তরের বাতাস ও শিলাবৃষ্টি অহরহ হইতে লাগিল। ক্রমাগত শিলাবৃষ্টিপাতে দৈত্যের প্রাসাদের শার্সির কাচ ও ছাদের শ্লেট সব ভাঙ্গিয়া গেল।

একদিন দৈত্য ঘরের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া তাহার সাদা বরফে ঢাকা বাগানের দুর্দ্দশা দেখিতে দেখিতে বলিল, "আমি বুঝতেই পারছিনা যে এবার আমার বাগানে বসন্ত কেন এলোনা! কবে এই বিশ্রী শীতকালটা চলে যাবে?"

কিন্তু ঐ স্বার্থপর দৈত্যের বাগানে বসন্ত ত আসিলই না; গ্রীষ্ম, শরৎ, হেমন্ত কোন ঋতুই আসিল না। গ্রীষ্মকালে দেশের প্রত্যেক বাগানে গাছে গাছে জাম, গোলাপজাম, আম, লিচু, প্রভৃতি নানা রকমের সুমিষ্ট ফল পাকিয়া উঠিল কিন্তু দৈত্যের বাগানের গাছে কোন ফলই ধরিল না। গ্রীষ্ম ঋতু বলিল, "দৈত্যটা বড় স্বার্থপর, কিছুই পাবেনা।" সুতরাং সে বাগানে কেবল শীতকালই রাজত্ব করিতে লাগিল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে কেবলই কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস, শিলাবৃষ্টি, তুষার এবং বরফপাত হইতে লাগিল।

একদিন সকালে দৈত্য বিছানায় শুইয়া আছে এমন সময়ে বাহিরে মধুর সঙ্গীতের ধ্বনি শুনিতে পাইল। সে স্বর তাহার কাণে যেন মধু ঢালিয়া দিল। সে বিছানা হইতে তাড়াতাড়ি লাফাইয়া উঠিয়া দেখে, বাগানের একটি গাছে কোকিল তাহার ঝঙ্কার তুলিয়াছে। বাগানে সে শিলাবৃষ্টি তুষার ও বরফ নাই। খোলা জানালা দিয়া একটি মধুর সৌরভ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। সে অবাক হইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে এসব সত্য কিনা তাহা ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। পাখীর গান সে কতদিন শুনে নাই, ফুলের যে সুগন্ধ আছে তাহা সে যেন ভুলিয়াই গিয়াছে। "বসন্ত তবে এতদিনে এসেছে" এই বলিতে বলিতে সে এক অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে দেখিল দেওয়ালের এক ছোট গর্ত্ত দিয়া শিশুরা সব বাগানে ঢুকিয়া গাছের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। প্রত্যেক গাছেই একটি শিশু উঠিয়াছে। গাছেরা সব শিশুদের পাইয়া এত আহ্লাদিত হইয়াছে যে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে, পাখীরা সব আনন্দে কলধ্বনি করিতে করিতে চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে সবুজ ঘাসের ভিতর হইতে ফুলেরা মুখ বাহির করিয়া হাসিতেছে। চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। কেবল বাগানের শেষের দিকের এক কোণে তখনো বরফ ও তুষারে ঢাকা ছিল। সেখানে একটি খুব ছোট ছেলে একটি গাছের নীচে দাড়াইয়া সেই গাছে উঠিতে না পারিয়া খুব কাঁদিতেছিল। সে গাছটি তখনো তুষারে ও বরফে ঢাকা ছিল, আর কনকনে উত্তরের বাতাস তাহার উপর দিয়া বহিতেছিল।

বালকটির অবস্থা দেখিয়া দৈত্যের হৃদয়ে দয়া হইল। সে বলিল, "আমি কি স্বার্থপর! এখন বুঝতে পারছি যে কেন আমার বাগানে বসন্ত আসে নাই। আমি ঐ ছোট্ট ছেলেটিকে গাছে চড়িয়ে দিয়ে আসি। তারপর বাগানের চারিদিকের দেওয়ালটা ভেঙ্গে ফেলে আমার বাগানকে চিরদিনের জন্য শিশুদের আনন্দ নিকেতন করে তুলব।" এতদিন শিশুদের বাগানে ঢুকিতে দেয় নাই বলিয়া তাহার হৃদয় অনুতাপে বিদ্ধ হইতে লাগিল।

দৈত্য এই বলিয়া ধীরে ধীরে ঘরের দরজা খুলিয়া বাগানে প্রবেশ করিল। কিন্তু শিশুরা তাহাকে দেখিবা মাত্র ভয়ে দৌড়িয়া বাগান ছাড়িয়া পলায়ন করিল। আর অমনি বাগানে শীতকাল দেখা দিল। কেবল সেই ছোট্ট ছেলেটির চোখ জলে এত ভরিয়া গিয়াছিল যে সে দৈত্যের আগমন দেখিতে পায় নাই। দৈত্য ধীরে ধীরে তাহার পিছনে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া গাছের উপর বসাইয়া দিল। আর তখনি সেই গাছে ফুল ফুটিয়া উঠিল, পাখীরা আসিয়া গান গাহিতে লাগিল, আর সেই ছোট ছেলেটী দুহাত বাড়াইয়া দৈত্যের গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। যে সব শিশুরা দৈত্যকে দেখিয়া ভয়ে পলাইয়া গিয়াছিল, তাহারা যখন দেখিল যে দৈত্য ঐ ছেলেটীকে আদর করিতেছে, তখন তাহারা আনন্দে দৌড়িয়া আসিয়া বাগানে ঢুকিল। আর অমনি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বসন্তও আসিল। দৈত্য বলিল "বাছারা এটা এখন তোমাদেরই বাগান। তোমরা মনের আনন্দে এখানে খেলা কর।" এই বলিয়া সে একটা বড় শাবোল লইয়া বাগানের চারিদিকের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। দুপ্রহরে সহরের লোকেরা যখন বাজার হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল তখন সকলে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল যে দৈত্যের বাগানের শোভা অপরূপ হইয়াছে এবং স্বার্থপর দৈত্য শিশুদের সহিত খেলা করিতেছে।

শিশুরা সারা বৈকাল দৈত্যের সহিত খেলা করিল। সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিলে তাহারা দৈত্যের নিকট হইতে বিদায় চাহিল। দৈত্য বলিল "যে ছেলেটিকে আমি গাছে চড়িয়ে দিয়েছিলাম সেই সুন্দর ছোট ছেলেটি কোথায় গেল?" দৈত্য তাহাকে খুব ভাল-বাসিয়াছিল।

শিশুরা বলিল "আমরা ত জানি না। সে বোধ হয় চলে গিয়েছে।"

দৈত্য বলিল "তোমরা তাকে কাল নিশ্চয় আসতে বলো।" কিন্তু শিশুরা যখন বলিল যে তাহারা সেই ছেলেটিকে কখন দেখে নাই, সে কোথায় থাকে তাহাও জানে না, তখন দৈত্য অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িল।

প্রতি অপরাহ্ণে শিশুরা আসিয়া দৈত্যের সহিত খেলা করিতে লাগিল। কিন্তু যে ছেলেটিকে দৈত্য সব চেয়ে বেশী ভালবাসিয়াছিল সে আর আসিল না। দৈত্য সব ছেলেদেরই আদর করিত কিন্তু সেই ছেলেটির জন্য তাহার মন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সে কেবলি বলিত "তাকে একবার দেখতে পেলে আমি বড় সুখী হই।"

তারপর কত বৎসর চলিয়া গেল। দৈত্যের দেহ জরাগ্রস্ত ও ক্ষীণ হইয়া আসিল। সে আর শিশুদের সহিত খেলা করিতে পারিত না। একটি বড় আরাম চেয়ারে বসিয়া সে ছেলেদের খেলা দেখিত এবং তাহার বাগানের শোভা দেখিয়া আনন্দ পাইত। তখন দৈত্য বলিত "আমার বাগানে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল আছে কিন্তু শিশুরাই সব চেয়ে সুন্দর ফুল।"

শীতকালের সকালে একদিন দৈত্য পোষাক পরিতে পরিতে তাহার ঘরের জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল। দৈত্য এখন আর শীতকে ঘৃণা করে না, কারণ সে বুঝিয়াছে যে শীতের অবসানেই বসন্ত আসিবে।

হঠাৎ সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চাহিয়া দেখিল এবং সে যাহা দেখিতেছে তাহা সত্য কিনা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য বারম্বার চোখ মুছিতে লাগিল। সত্যই এক অদ্ভুত দৃশ্য তাহাকে

একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বাগানের এক কোণের একটি গাছ সেই শীতকালেও সাদা সাদা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে, আর তাহার ডাল হইতে রূপালি ফুল সব ঝুলিতেছে, আর তাহার নীচে সেই ছোট্ট ছেলেটি দাঁড়াইয়া আছে।

দৈত্য মহানন্দে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া বাগানে ঢুকিল। ছেলেটির নিকটে গিয়া তাহাকে দেখিয়া দৈত্যের মুখ রাগে লাল হইয়া গেল। সে চেঁচাইয়া বলিল "বাছা কে তোমাকে এমন করে আঘাত করেছে? কার এত বড় সাহস?" শিশুর ছোট ছোট কোমল দুটি হাতে এবং পায়ে রক্ত মাখা আঘাতের দাগ দেখা যাইতেছিল।

দৈত্য খুব রাগিয়া বলিল "বল বাছা, কে তোমাকে এমন করে মেরেছে? আমি এই তলওয়ার দিয়ে তাকে এখনি কেটে ফেলব।"

বালকটি মধুর স্বরে বলিল "না, না, এ প্রেমের আঘাতের চিহ্ন।"

"তুমি কে?" এই বলিয়া দৈত্য অত্যন্ত সম্ভ্রম ও ভক্তির সহিত তাহার পায়ে প্রণাম করিল।

স্বর্গীয় হাসিতে বালকটির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল "তুমি একদিন তোমার বাগানে আমাকে খেলা করিতে দিয়েছিলে এখন আমার সঙ্গে স্বর্গে আমার বাগানে খেলা করবে এসো।"

পরদিন বৈকালে ছেলেরা দৈত্যের বাগানে খেলা করিতে আসিয়া দেখিল যে একটি সাদা ফুলে ভরা গাছের নীচে দৈত্যের মৃতদেহ পড়িয়া আছে, আর তাহার সর্বাঙ্গ সাদা ফুলে ছাইয়া গিয়াছে।

শ্রীকুমুদিনী বসু

ধাঁধা

১। এমন একটা জিনিষের নাম কর, যেটা মানুষে পেতে চায়না, কিন্তু পেলে না রেখেও পারেনা।

২ লোকেরা আমায় আসতে বলে, কিন্তু আমি এলেই তারা ঘরে লুকায়। বলত আমি কে?

৩। চারি ভাই পাশাপাশি দৌড়াই কিন্তু কেহ কাহাকেও ধরতে পারিনা। বলত আমরা কে?

বৈশাখ মাসের ধাঁধার উত্তর

১। শব্দ। ২। মোটে ৭ জন ৩। বিছানা।

বৈশাখ মাসের ধাঁধার উত্তর নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাগণ দিয়াছেন।—

শ্রীবীণাপানি চৌধুরী
শ্রীনিশিকান্ত সরকার
কুমারী খেলা ঘোষ, ভবানীপুর

জ্যৈষ্ঠের ধাঁধার উত্তর

১। মাইল পাথর।

২। (ক) গন্ধরাজ (খ) বকুল (গ) কামিনি (ঘ) বেল (ঙ) জবা (চ) গোলাপ।

৩। মহাভারত। রামায়ণ

৪। কয়লা।

জ্যৈষ্ঠের ধাঁধার উত্তর নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাগণ দিয়াছেন—

শ্রীক্ষিতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ময়মনসিংহ
শ্রীসুশীল ও কুমারী লিলি মুখার্জ্জী তালপুকুর রোড, নারিকেল ডাঙ্গা
শ্রীশোভাময়ী বসু।

প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মুকুল

—কার্ত্তিক, ১৩৩৭—

বালকবালিকাদের সচিত্র মাসিকপত্র

শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী বি-এ, কর্ত্তৃক

সম্পাদিত

মুকুলের লেখক-লেখিকাগণ

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু, রায় বাহাদুর জলধর সেন, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডাঃ বনোয়ারীলাল চৌধুরী প্রমুখ।

— বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র —

—ঠিকানা—

২৯৪নং দর্গা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা

বিষয়-সূচী

কার্ত্তিক—১৩৩৭

মুকুলের নিয়মাবলী

১। মুকুল বাংলা মাসের ৭ই তারিখে বাহির হয়। ১৫ই তারিখের মধ্যে কোন গ্রাহক মুকুল না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খবর লইয়া কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র লিখিবেন।

২। মুকুলের বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। ভি-পিতে দুই টাকা চারি আনা। ষাণ্মাসিক এক টাকা চারি আনা। প্রতি সংখ্যা তিন আনা। বৎসরের মধ্যে যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু বৈশাখ মাস হইতেই কাগজ লইতে হয়।

৩। মুকুলের গ্রাহক গ্রাহিকা ছেলে-মেয়েদের লেখা মুকুলে প্রকাশিত হয়। লেখা মনোনীত না হইলে তাহা ফেরত দেওয়ার জন্য ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। প্রেরিত ধাঁধাঁর সঙ্গে উত্তর লিখিয়া না দিলে তাহা প্রকাশিত হয় না।

৪। মুকুলের নমুনার জন্য এক আনার ডাক ষ্ট্যাম্প পাঠাইতে হয়।

টাকাকড়ি চিঠি পত্র নীচের ঠিকানায় মুকুল আফিসে পাঠাইতে হইবে।

মুকুল কার্য্যাধ্যক্ষ—২৯৪নং দর্গা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা

সুইটজারল্যাণ্ডের আল্প্‌স পর্ব্বতের তুষার স্রোত বা গ্লেসিয়ার

১৩০২ সনে প্রবর্ত্তিত

৩য় বর্ষ] (নবপর্য্যায়) কার্ত্তিক, ১৩৩৭ [৭ম সংখ্যা

ভাইবোন

আমি বোন তুমি ভাই,
আজন্ম একই ঠাঁই,
দুরতাবিহীন।
এক জননীর স্তন্য,
পান করি উভে ধন্য,
কাটিয়াছে দিন।
তাহারি স্নেহের ছায়,
লভিয়াছি সমুদায়,
জীবনের সব।
সে স্নেহ সিন্ধুর প্রায়,
উত্তাল তরঙ্গে ধায়,
নিত্য প্রাণ নব।
পিতামাতা স্বর্গবাসে,
তেমন কে ভালবাসে,
আজি হাহাকার।

ভাইবোন মিলে তবু,
অভাব বুঝিনি কভু,
মুছি অশ্রুধার।
ভাইবোন এক প্রাণ,
ছিলনাক ব্যবধান,
পূর্ণ ছিল হিয়া।
হেরিয়া ভাইয়ের মুখ,
ভগিনী জুড়াত বুক
সব তাকে দিয়া॥
ভাইময় বিশ্ব তার,
কিছু নাহি ছিল আর,
সংসারের সার।
এমন সোদর ভাই,
জগতে তুলনা নাই,
কোথা পাব আর।

মানব জনম ল'য়ে,
ভাইবোন এক হ'য়ে,
সুখের জীবন।
ভ্রাতৃমুখ ক্ষণতরে,
দৃষ্টি হ'তে যদি সরে,
চিন্তার দাহন।
হৃদয় সান্ত্বনাহীন,
ভয়ে ভয়ে কাটে দিন,
কত ভাবনায়।
কত অমঙ্গল কথা,
অকারণে দেয় ব্যথা,
বৃথা কল্পনায়।
ধরণীর সবখানি,
ভাইয়ের অস্তিত্ব জানি,
পৃথ্বী পূর্ণতায়।

ধরাতলে বোন ভাই,
এমন সম্বন্ধ নাই,
খুঁজিয়া না পায়।
দোঁহে দোঁহাকার মত,
মনের বাসনা যত,
এক দুজনার।
সেই প্রেম সেই প্রীতি
তুলনারহিত নিতি
স্নেহ সাধনার।
ভাই যদি আগে চলে,
ভগিনীকে নাহি ব'লে,
যায় স্বর্গপুর।
সে শোকের সীমা নাই,
ব্রহ্মাণ্ড বিলোপ তাই,
সে যে কতদূর।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

মণ্টি-ক্রীষ্টো

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই এডমণ্ড আবার গুহায় ফিরে গেল। কতকগুলি দামী পাথর পকেটে নিয়ে—বাক্সটি যেমন ভাবে ছিল তেমনি ভাবে রেখে—তার উপরে বালি চাপা দিয়ে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে—ফাটলগুলি মাটি দিয়ে বুঁজিয়ে—তার উপরে কতকগুলি গাছপালা লাগিয়ে দিল। তারপরে পায়ের দাগগুলি মুছে দিয়ে, সেখানে যে কোন কালে কোন মানুষ গিয়েছিল—তার কোনই চিহ্ন না রেখে—সঙ্গীদের পথ চেয়ে দিন কাটাতে লাগল।

ছয় দিনের দিন সঙ্গীরা ফিরে এল। দূর থেকে জাহাজখানি দেখতে পেয়েই—এখনো ভালো সারতে পারেনি এই ভাব দেখিয়ে অনেক কষ্টে সে তীরের কাছে এগিয়ে গেল। জাহাজ এসে পৌছিলে তাদের কি রকম ব্যবসা হ'ল জিজ্ঞাসা করল এবং নিজে যেতে পারল না বলে দুঃখ করতে লাগল।

এডমণ্ডকে নিয়ে সেদিন সন্ধ্যাবেলা জাহাজ-খানি লেগহরণের পথে রওনা হ'ল। লেগ-হরণে পৌঁছে এডমণ্ড একজন ইহুদী শ্যাকরার কাছে কয়েকটা দামী পাথর বিক্রী করে—বেশ মোটা টাকা হাতে নিয়ে ফিরে এল।

এডমণ্ডের ভয় ছিল—পাছে তার মত গরীব নাবিকের কাছে এত দামী পাথর দেখে তারা তাকে চোর বলে সন্দেহ করে—কিন্তু যখন সেই ইহুদী দেখল সে সেগুলিকে বেশ সস্তায় পাচ্ছে—সে আর কিছু বল্ল না।

পরদিন ড্যান্টি জ্যাকোপোকে একখানি ছোট জাহাজ ও অনেক টাকা পুরস্কার দিল—তবে তার সঙ্গে এই সর্ত্ত হ'ল যে, সে প্রথমেই মার্সের্ল্স্ যাবে ও সেখানে খোঁজ নেবে—লুই ড্যান্টি নামে একজন বৃদ্ধ এখনো বেঁচে আছে কি না ও মার্সিডিস নামে একটি মহিলার সম্বন্ধে কেউ কিছু বল্‌তে পারে কি না।

এই উপহার পেয়ে জ্যাকোপো ভাবল সে কি স্বপ্ন দেখ্‌ছে। পাছে সে কোন রকম সন্দেহ করে এই ভয় পেয়ে ড্যান্টি তাকে বল্ল যে, লেগ্-হরণে পৌঁছাবার পরে হঠাৎ সে জান্‌তে পার্‌ল যে, তার এক কাকা তাকে অগাধ সম্পত্তির মালিক করে মারা গিয়েছেন। জ্যাকোপো তার কথা অবিশ্বাস ক'রল না।

এমিলিয়া জাহাজে তিন মাস থাকার সর্ত্ত পূর্ণ হওয়াতে এডমণ্ড কাজে ইস্তফা দিল। ক্যাপটেন ত তাকে কিছুতেই ছাড়বে না—কিন্তু পরে তার অগাধ সম্পত্তি পাবার ইতিহাস শুনে আর বাধা দিল না। পরদিন ভোরে জ্যাকোপো মার্সের্লসের পথে রওনা দিল—আর ঠিক হ'ল খবর দুটো নিয়ে সে মন্টি-ক্রীষ্টো দ্বীপে এডমণ্ডের সঙ্গে দেখা করবে।

জ্যাকোপোকে রওনা করে দিয়ে এডমণ্ড জেনোয়ার পথে গেল। সেখানে গিয়ে দেখল—একখানি সুন্দর ছোটখাটো জাহাজ বিক্রী আছে—এডমণ্ড মালিকের সঙ্গে দর বন্দোবস্ত করে তখনই সেখানা কিনে নিল। তারপরে তাকে শোবার কেবিনে এমন ভাবে একটা গুপ্ত সিন্দুক করে দিতে বল্ল—যেটা বাইরে থেকে দেখে কেউ যেন জান্‌তে না পারে। লোকটি খুসী হয়েই তাতে রাজী হ'ল—কারণ এডমণ্ড তাকে যে দাম দিয়েছে—জাহাজের দামটা আসলে তত টাকা নয়।

কয়েকদিন পরে এডমণ্ড তার নতুন জাহাজে জেনোয়া বন্দর থেকে রওনা দিল। তীরে লোকের মহা ভিড়। সবাই দেখছে সে কেমন বাহাদুরী করে সমুদ্রের দিকে একা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ ভাবল সে যাচ্ছে কর্সিকা দ্বীপে,—কেউ ভাবল এলবা দ্বীপে—কেউ ভাবল স্পেনে বা আফ্রিকায় কিন্তু মন্টিক্রীষ্টো দ্বীপের কথা কারও মনে হ'ল না।

দ্বিতীয় দিনের শেষাশেষি সময় সে মন্টি-ক্রীষ্টো দ্বীপে পৌঁছল। আগের বারে যেখানে নঙ্গর করেছিল সেখানে জাহাজখানি না রেখে ছোট একটি খালের মধ্যে গিয়ে জাহাজ বাঁধল।

দ্বীপটি পূর্ব্বের মতই নির্জ্জন। সে যাইবার পর আর কেউ এসেছে বলে মনে হ'ল না—গুপ্তধন নিরাপদেই আছে।

পরদিন ভোর হতেই গুপ্তধন সরাইতে আরম্ভ করিল ও সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত অর্থ তার কেবিনের গুপ্ত সিন্দুকে জমা হইল।

সাতদিন অপেক্ষা করার পর আট দিনের দিন সে দূরে একখানি জাহাজ দেখতে পেল। জাহাজখানি কাছে আসতেই বুঝতে পারল

সেটা জ্যাকোপোর জাহাজ। সে তখনই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা তাদের ডাকল—জাহাজের লোকেরা সেইরূপ ভাবে উত্তর দিল। প্রায় দু ঘণ্টা পরে জাহাজখানি তার জাহাজের পাশে এসে নঙ্গর করল।

জ্যাকোপো এডমণ্ডের জন্য বড়ই দুঃখের সংবাদ আনল। বৃদ্ধ ড্যান্টি মারা গিয়েছেন ও মার্সিডিসের খবর কেউ বলতে পারে না।

ড্যান্টি এই সংবাদ খুব শান্ত ভাবে নিল ও তীরে নেমে কিছুক্ষণ একলা ঘুরে এল। তারপরে আবার যাত্রার আয়োজন। জ্যাকোপোর জাহাজের দুজন নাবিক তাহাকে সাহায্য করতে আসল। সে তাহাদের মার্সেলসের পথে জাহাজ চালাতে হুকুম দিল।

এতদিন পরে ফ্যারিয়ার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হয়ে এডমণ্ড লোকালয়ে আবার স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করতে চলল।

বড় হ'য়ে তোমরা আলেকজাণ্ডার ডুমার বই পড়ে এডমণ্ড ড্যান্টির বিষয় আরো বেশী করে জান্‌তে পারবে।

শ্রীবিমলেন্দু সরকার

সমাপ্ত

পাড়াগাঁ

(১)

সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে, শ্যাম তাহার সহপাঠী রামকে, শ্যামদের দেশে বেড়াইতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল। রাম ও শ্যাম উভয়েই কলিকাতার বিদ্যাসাগর স্কুলে একত্রে পড়ে—দুই জনে খুব ভালবাসা। রাম সহরে ছেলে, শ্যামের বাড়ী পল্লীগ্রামে। প্রথমে রামের পিতা রামকে এই গ্রীষ্মের সময়ে পাড়াগাঁয়ে যাইতে দিতে রাজী হন নাই—কারণ, যদিও বেশ বর্ষা না পড়িলে পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়ার বাড়াবাড়ি দেখা যায় না তবু, অত্যন্ত গরমের সময়ে, পাড়াগাঁয়ে পুকুরের জল কমিয়া যায় বলিয়া, সেই জল পান করিয়া পেটের অসুখ, আমাশয় প্রভৃতি হইতে পারে। যাহা হউক, ছেলের পীড়াপীড়িতে রামের পিতা শেষে রাজী হইলেন এবং ছেলেকে বার বার বলিয়া দিলেন যে, যতদিন পাড়াগাঁয়ে থাকিবে, তৃষ্ণা পাইলে, ডাব পাড়াইয়া খাইও; অথবা পুকুরের জল ফুটাইয়া, তবে সেই জল পান করিও—কদাচ পুকুরের জল এম্‌নি খাইও না।"

(২)

আজ সোমবার—আজ থেকে ছুটি আরম্ভ। দুই বন্ধু আহারাদি সাঙ্গ করিয়া, ভদ্রপুর গ্রামে যাইবার জন্য, একত্রে ট্রেনে উঠিল। ট্রেনে উঠিবার আগে, শ্যাম কিছু ভাল সন্দেশ ও পাঁঠার মাংস কিনিয়া লইল দেখিয়া, রাম জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ দুইটি জিনিষ কি ভদ্রপুরে পাওয়া যায় না?" শ্যাম একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "না ভাই, না।" তাহাতে রাম দুঃখিত হইয়া বলিল, "আমি যাচ্ছি পল্লীগ্রামে—সেখানকার জিনিষই খাইব—সহরে ত ভাই বহুবার সন্দেশ ও মাংস

খাইয়াছি,—সহরের বাসি জিনিষ পাড়াগাঁয়ে বহিয়া লইয়া যাইতেছ কেন?" এই কথার পিঠে অনেক কথাই বলা হইল,—শেষে শ্যাম হার মানিল, কারণ, সন্দেশটা বাসি জিনিষ ও মাংসটা খোসখেয়ালে যখন-তখন খাওয়া উচিত নয়। শ্যাম বলিল, "সাহেবরা যে খায়?" তাহার উত্তরে রাম বলিল, "সাহেবরা অত্যন্ত পরিশ্রমী; তাঁহারা যাঁহার যেমন অবস্থাই হউক না কেন, সকালে ও বৈকালে নিয়মিত Exercise (অঙ্গচর্চ্চা) করেন ও তাঁহারা সিদ্ধ, ঝলসান মাংস খান। আর আমরা? আমরা কুড়েমি করিয়া বসিয়া কাটাই এবং খুব গর্‌গরে তৈল বা ঘি এবং প্রচুর গরম মসলা না দিয়া মাংস রাঁধি না এবং পুরা একবাটি না পাইলে তৃপ্ত হই না! সে কালের ক্ষত্রিয় রাজারা মৃগয়া করিয়া—অর্থাৎ হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিয়া, তবে সেই বন্য মৃগের মাংস খাইতেন। এইভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে বেলা পাঁচটায় ট্রেন ভদ্রপুরে থামিল।

(৩)

ভদ্রপুরে ট্রেন আসিবামাত্রেই শ্যাম মুখ বাড়াইয়া "ও ফকির-দা, এদিকে," বলিয়া হাতের ইসারা করিয়া, তাহাদের বাড়ীর ভৃত্য ফকিরকে ডাকিল। ভৃত্যকে "দাদা" বলায় রামের কি রকম ঠেকিল। সমস্ত মোটঘাট ফকির গরুর গাড়ীতে উঠাইল। গোরুর গাড়ীটির উপরে ছৈ (ছাদ) আছে, এবং ভিতরে খড়ের উপরে সতরঞ্চি পাতা ও বালিশ দেওয়া ছিল। দুই বন্ধুতে গাড়ীতে উঠিবার পরে, শ্যাম গাড়ীবানকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখো পীরু কাকা, খাঁদ খোঁদল দেখিয়া চালাইও। তোমার বাড়ীর সব খবর ভালো তো?" এইভাবে, শ্যাম কখনো পীরু গাড়ীবানের সঙ্গে, কখনো রামের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে চলিল। একদিকে মেঠো-হাওয়া ও নানাবিধ বুনো ফুলের গন্ধ ও পাখীর ডাক, অপরদিকে এঁদো পুকুরের দুর্গন্ধ ও এলেমেলো, ভাঙাচুরা মেঠো পথ ও ধূলা; কোথাও কচি ছেলেদের হুল্লোড়, কোথাও কুকুরের চীৎকার এবং গোরুদের হাম্বা রব—এই সব দেখিতে দেখিতে রাম শ্যামের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। শ্যামদের বৈঠকখানাটি পাকা ঘর—বাকী বাড়ীটা খুব উঁচু পোতার উপরে খড়ের ছাউনি দেওয়া আটচালায় পরিপূর্ণ। বাড়ীর সম্মুখে বাগান, ভিতরে প্রকাণ্ড উঠান ও পিছনে ছোট একটি বাগান পার হইয়া খিড়কীর পুকুর। মুখে কিছু না বলিলেও রাম খোড়ো ঘর দেখিয়া একটু বেশ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ, তাহার মনে পাড়াগাঁ বলিলেই সাপ, বিছা, কেন্নো প্রভৃতির আড্ডা বলিয়া ধারণা হইত। বাড়ীটির ভিতর বাহির ও আশ পাশ এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে, রাম দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল। বাড়ীতে পৌঁছিবামাত্রেই শ্যামের মা, পিতা, ভাই, বোন্ ও পাড়ার কত ছেলে, বৌ গৃহিণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথাযোগ্য প্রণামাশীর্ব্বাদ ও কুশল জিজ্ঞাসার পরে, উভয়কেই জলযোগ করান হইল। বাগানের টাট্‌কা-পাড়া, গাছ-পাকা আম, ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি ও কলিকাতার সন্দেশই প্রধান আহার্য্য ছিল।

(৪)

জলযোগের পরে, দুই বন্ধু ও বাড়ীর ও পাড়ার দুইচারজন মিলিয়া বেড়াইবার জন্য, "দীঘির পাড়ের" দিকে চলিল। সহরে যেমন বেড়াইবার রাস্তা ও যায়গা থাকে, পাড়াগাঁয়ে তেমন থাকে

না। কাহারো বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে, কোনও হরি-সভায়, কাহারো পোড়ো জমিতে, নদীর ধারে, বড় দীঘির পাড়—এই রকম যায়গাতেই পাঁচজনে একত্রে মেলামেশা করে। একথা সেকথার পরে রাম ভয়ে ও বিস্ময়ে দেখিল যে, সেই একই দীঘির ধারে মানুষ মলমুত্র ত্যাগ করিতেছে, জলে কুলকুচি করিতেছে, কাপড় কাচিতেছে, স্নান করিতেছে—আবার সেই জলই রান্নার জন্য তুলিয়া লইতেছে! এই দেখিয়া রামের মনে পড়িল, কেন তাহার পিতা না ফুটাইয়া জলপান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। খানিক বসিয়া থাকিতে থাকিতে মশার উৎপাত বাড়িল; এবং রামের জানা ছিল যে, মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়; কাজেই সকলে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। মশারা কামড়ায় না, মশকীরাই কামড়ায়। সকল মশকীদংশনের ফলে ম্যালেরিয়া হয় না—"এনোফিলিস্" নামক একটি বিশিষ্ট জাতের মশকী যদি কোনও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে কামড়াইয়া সুস্থলোককে কামড়ায়—তবেই ম্যালেরিয়া হয় —নতুবা নহে। সন্ধ্যার পরে বাড়ীতে আসিয়া কুলদেবতার সন্ধ্যারতি দেখিয়া ও তাহাতে যোগ দিতে পাইয়া, রাম মনে মনে অত্যন্ত সুখী হইল। কলিকাতায় তাহাদের বাড়ীতে এ সকল নাই; তাহা না হইলেও, এখানে সকলের সঙ্গে মিশিয়া, তাহার মনটা যেমন হালকা তেম্নি আনন্দপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে। পূজা-আরতির পরে, পাড়ার পাঁচটি লোক আসিয়া গল্পগুজব করিয়া চলিয়া গেলেন।—রাম দেখিল, সহরের চেয়ে পল্লীগ্রামের লোকগুলি মিশুক এবং বায়স্কোপ প্রভৃতিতে পয়সা খরচ করিয়া, গলদঘর্ম্ম হইয়া যা খানিক উত্তেজনা পাওয়া যায়, তাহার চেয়ে এই ব্যবস্থা, এই সামাজিকতা কত সুখের! রাত্রে, ঢেঁকিছাঁটা চাউলের সুঘ্রাণ অন্ন, টাট্‌কা মাছের পাঁচরকমের ব্যঞ্জন, কলিকাতা হইতে আনা মাংস, পুরু সরশুদ্ধ সুঘ্রাণ দুধ—এই সব ভোজনে যেমন তৃপ্তি বোধ হইল, তেমন বুঝি রামের ভাগ্যে বহুদিনই হয় নাই! পরে, মশারি টাঙাইয়া, দুই বন্ধু দুইটি আলাদা বিছানায় দাওয়ায় নিদ্রা যাইলেন।

(৫)

এই ভাবে দুইটি বন্ধুতে এক সপ্তাহকাল খুব আমোদে বেড়াইয়া, রাম কলিকাতার দিকে রওনা হইল। সারাটি পথ তাহার মনে শ্যাম ও শ্যামের বাড়ীর ও পাড়ার সকলের স্নেহ, যত্ন, আত্মীয়তার কথা তোলপাড় করিয়া তুলিল। সেই মেঠো প্রাণমাতান হাওয়া, সেই সরলতা সেই স্নেহ—মনকে বড়ই আকলি বিকুলি করিয়া তুলিল! তাহার পরে, পুকুরের টাট্‌কা মাছ, মোটা সরশুদ্ধ সুঘ্রাণ দুধ, ক্ষীর, ক্ষীরের খাবার, দৈ, ঘোল, টাট্‌কা ছানা, ঘি, মাখন, ঢেঁকিছাঁটা চাউল, সুগন্ধ গুড়, টাট্‌কা মুড়ি ও নারিকেল, খোসাশুদ্ধ কলাইদাল,—এ সকলের সুস্বাদের কথাও বারবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল! অবস্থার তুলনায়, শ্যামের চেয়ে রামরা ধনী—কেন না, তাহাদের ঘরে নগদটাকা, কোম্পানীর কাগজ, কৌচ-কেদারা, কার্পেট, ইলেট্রিক ফ্যান-লাইট, চাকর-দ্বারবান, গাড়ী ঘোড়া আছে; তাহারা নানা রকম বেশ ভূষাও করিতে পায়—অনাবশ্যক বেশী কাপড় চোপড়ও পরে; কিন্তু, মেটে ঘরে খালি গায়ে থাকিয়া, টাট্‌কা, প্রাণবন্ত (ভাইটামীনযুক্ত), সুস্বাদু ও ভেজালশূন্য খাদ্য খাইয়া, প্রতিবেশীর অযাচিত স্নেহ সেবা পাইয়া কত বেশী সুখে, স্বাস্থ্যবান অবস্থায় ও ইজ্জতের সঙ্গে যে

শ্যামরা থাকে তাহা দেখিয়া, রাম আহ্লাদে ভরিয়া গিয়াছিল। এই সামান্য এক সপ্তাহের "ভ্রমণ" কাহিনী তাহার ছয় মাসের গল্পের খোরাক জোগাইয়াছিল; এবং মনে প্রাণে সে পল্লীগ্রামকে ভালবাসিতে শিখিয়া ছিল।

ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্, এম্, এস্

রাইমণি মাসীর কাকাতুয়া

১

রাইমণি মাসীকে গাঁয়ের প্রায় সমস্ত লোক মাসী বলে ডাক্‌তেন। মাসী অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছিলেন। একখানি বাড়ীতে এক্‌লাই তিনি বাস করতেন। আগে তাঁর একখানি ঘর, একটি গরু, একটি বাছুর ছাড়া আর যে বেশী কিছু ছিল, তা ত মনে হয় না। এখন কিন্তু তিনি ঢের টাকা ধার দিয়ে, প্রত্যেক টাকায় মাসে চার পয়সা করে সুদ আদায় করে থাকেন। লোকেরা বলে মাসী কোন্ এক বনের ভিতরে ভাঙ্গা-বাড়ীতে মাটিখুঁড়ে দুই কলসী সোনার মোহর পেয়েছেন। তা, মাসীর কাছে গিয়ে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, "মাসী, তুমি কি মাটি খুঁড়ে সোনার মোহর পেয়েছ?" অমনি তিনি ভয়ানক রেগে বল্‌বেন, "পেয়েছি বই কি? সে সব জমা করে রেখেছি, তোদের বাপ ভায়ের শ্রাদ্ধে খরচ করবার জন্যে।"

মাসী রেগে উঠুন আর যাই বলুন না কেন, আমরা জানি, যথার্থই তিনি পড়োবাড়ীর মাটি খুঁড়ে ধন পেয়েছেন। কেমন করে পেলেন, সে কথাও বল্‌ছি। মাসীদের গাঁয়ের নাম বিনোদপুর। এক সময়ে গ্রামে বিস্তর লোক বাস করতেন। অনেকের বেশ টাকাকড়িও ছিল। তারপরে একবার মহামারী, অর্থাৎ ভয়ানক রোগ এসে গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে দিল। সেই হতে গাঁয়ের অনেক জায়গায় এক একটা খালি বাড়ী আর ভাঙ্গা দালান পড়ে আছে, সেখানে একটিও মানুষ নেই। বাড়ীর চারদিকে শুধুই জঙ্গল, আর সেই জঙ্গলে সাপ বাঘ মনের ফুর্ত্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বল্‌তে কি, এই গাঁয়ে এমনি বাঘের ভয়, যে, দিনেদুপুরে বাঘ মাঠে এসে গরুর বাছুর মুখে করে পালিয়ে যায়। সন্ধ্যেবেলা সুবিধা পেলে বাঘ মানুষকেও তাড়া করে। এই ত সে দিন হরে বাগ্দী রাত্রিকালে খেজুরের রস চুরি করতে গিয়ে বাঘের মুখে পড়ে মারা গেল। তার চীৎকার শুনেই লোকেরা খেজুর বাগানের দিকে ছুটলো। তা ছুটে আর কি হবে? সেয়ানা বাঘ, তাড়াতাড়ি তার তাজা রক্ত খেয়েই প্রস্থান করলো। তখন কে আর বাঘকে খুঁজে পায়? দু-চার জন মানুষ খালি বন্দুক নিয়ে হৈ হৈ করতে লাগ্‌লো। এ দিকে বাঘ বাসায় গিয়ে তার বাচ্ছাদের খেতে দিল।

বলেছি না মাসীর একটি গরু আর বাছুর আছে। মাসী একদিন সন্ধ্যেবেলা নিজেই মাঠ থেকে সেই গরু বাছুর নিয়ে বাড়ী আস্‌ছিলেন।

যেমন এক জঙ্গলের কাছে আসা, অম্‌নি এক বাঘিনী তার বাচ্ছা নিয়ে দাঁতের পাটি বের করে, লেজ নাড়তে নাড়তে জঙ্গলের ভিতর থেকে বের হতে লাগলো। বাঘের চোখে মাসীর চোখ পড়ামাত্র, তিনি গরু বাছুর ফেলে জঙ্গলের এক ভাঙ্গা বাড়ীতে গিয়ে ঢুকে পড়লেন। বাঘিনীর বোধ হয় গরু বাছুরটির উপরে যত লোভ, ততটা লোভ মাসীর উপরে ছিল না; তা থাক্‌লে মাসীর ভাঙ্গা বাড়ীতে ঢুকে পড়া কিছু মুস্কিল হয়ে দাঁড়াত।

মাসী ভাঙ্গা বাড়ীতে ঢুকে দেখতে পেলেন, একটি কুঠুরি বেশ ভালই আছে। তার দুটি দরজা বন্ধ করে দিলে বাঘের আর সেখানে ঢোক্‌বার জো নেই। মাসী ভয়ে ভয়ে দুটি দরজা বন্ধ করে, সে রাত্রে সেই ভাঙ্গা বাড়ীতেই থাক্‌বেন বলে মনে কর্‌লেন। কিন্তু তাঁর চোখে ঘুম কোথায়? গরু বাছুরের যে কি হয়, সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন। তার পরে চট করে তাঁর মনে এক বুদ্ধির উদয় হল। এই ভাঙ্গা বাড়ীতে ঢের দিন আগে এক সেকেলে ধনী বাস কর্‌তেন। তাঁর বিস্তর টাকা ও মোহর ছিল। অনেক দিন হল তিনি মারা গিয়েছেন। কে বল্‌বে, এই ভাঙ্গা বাড়ীর কোথাও তাঁর পোতা কোন ধন আছে কি না? মাসী প্রাণপণে পোতা ধনের খোঁজ কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু কোথায় ধন? কোথাও ত তার কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। মাসীকে যেন পড়ে-পাওয়া ধনের নেশায় ধরে গেল, তিনি কোমর বেঁধে লেগে গেলেন; যেমন করেই হো'ক এই ভাঙ্গা বাড়ীর ভিতরে তাঁর অন্ততঃ এক কল্‌সী সোনার মোহর পেতেই হবে।

কি বল্‌ব? ভারি আশ্চর্য্য কাণ্ড! মাসী একটি জায়গার মাটি খুঁড়ে যথার্থই দুই পিতলের কল্‌সীভরা সোনার মোহর পেলেন। তাঁর মন আনন্দে নেচে উঠ্‌লো। তখন মাসীর বাঘের ভয় চলে গেল। তিনি সেই রাত্রে দুই কল্‌সী মোহর নিয়ে আপনার বাড়ীতে চল্লেন। মাসীর মনে হল, দিনের বেলায় গাঁয়ের যত সব হতভাগা মানুষগুলো কল্‌সী দেখ্‌লেই জিজ্ঞেস কর্‌বে, "ও মাসী, কল্‌সী কোথায় পেলে? ওর ভিতরে কি?" তখন মিথ্যা বলেও ধন পাওয়ার কথা গোপন রাখা মুস্কিল হয়ে উঠ্‌বে। কাজেই মাসী রাত্রেই বাড়ী ফিরে এলেন। বাঘিনী তাঁর গরু বাছুরেরও কোন অনিষ্ট করতে পারে নি। গরুর প্রকাণ্ড দুই সিং ছিল; সেই সিং নিয়ে তেড়ে যেতেই বাঘিনী বাচ্চা নিয়ে সরে পড়্‌লো। আসল কথা, বাঘিনী ছোট ছিল, বড় হলে বাছুরটির আর রক্ষা থাকৃত না। মাসী বাড়ীতে এসে, গরু বাছুর দেখ্‌তে পেয়ে বড়ই খুসী হলেন।

এখন মাসী গঙ্গাস্নান কর্‌বেন বলে কলকাতা যান, আর সেখানে সোনার মোহর ভাঙ্গিয়ে টাকা নিয়ে গাঁয়ে ফিরে আসেন। তার পরে সেই টাকা মানুষকে ধার দিয়ে সুদ আদায় করেন। টাকা আদায় কর্‌তে তিনি কাবুলীওয়ালার চেয়ে একটুকু কম নন। টাকা না পেলে কাবুলি-ওয়ালা মানুষের মাথায় লাঠি মারে; কিন্তু মাসী ঠিক্ সময়ে টাকা না পেলে বলেন, "সে দিন ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলি, আজ আমার টাকা শোধ করে দিবি; যদি আমার সব টাকা না দিস্, তবে তোর ছেলের মাথা না খেয়ে কি আমি এখান থেকে খালি হাতে চলে যাব? মা কালী কি নেই? আমি বিধবা,

আমার টাকা না দিলে, তোর্ ঘরে তিনি মরণ নিয়ে আস্‌বেন; যমরাজ তোর ছেলেপিলে সবগুলিকে নিয়ে যাবেন।”

মাসীর এই রকম কথা শুনে পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের ভয়ে প্রাণ কেঁপে ওঠে। প্রাণ কেঁপে ওঠার কারণও আছে। মানুষেরা বলে, মাসী এক বাড়ীতে এই রকম শাপ দিয়ে আসার পরেই কলেরা হয়ে সে বাড়ীর দুটি ছোট ছোট ছেলেই মারা গেল। তাই মাসীর কথায় পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা ভয় পেয়ে হাতের বালা ও নাকের নোলক বেচে দেনা শোধ করে দেয়।

২

মাসী ত জুলুম করে মানুষের কাছে টাকা আদায় করেন, অথচ খরচের সময়ে তিনি ভয়ানক কৃপণ, হাতের ফাঁক দিয়ে একটি পয়সা বের হতে চায় না। গাঁয়ের স্কুলের ছেলেরা মাসীকে গিয়ে বলে, “মাসী, তুমি এক্‌লা মানুষ, কেউ ত নেই; মরে গেলে যক্ষ যে এসে তোমার ধন অধিকার কর্‌বে; তাতে তোমার কি লাভ হবে? তার চেয়ে ভাল কাজে টাকাকড়ি দান কর না কেন? খুব পুণ্যি হবে। আমরা সব ছেলেরা মিলে একটা লাইব্রেরী কর্‌ছি, ঢের বই কিন্‌তে হবে। তার জন্য কিছু টাকা কেন দান কর না?”

মাসী। কেন? এ গায়ের পুরুষগুলি কি সব মহামারীতে মরে গেছে না কি? আমি মেয়েলোক, আমার কাছে কেন এসেছিস্ বই কেনার জন্যে টাকা চাইতে?

আর একদল যুবক এসে বলে, “মাসী, জান ত? এ গাঁয়ের মানুষ মর্‌লে আমরাই বয়ে শ্মশানে নিয়ে পোড়াই। তুমি মলে, আমরাই ত কাঁধে করে পোড়াতে নিয়ে যাব। তাই বলি, এবার পূজার সময় আমাদের লুচি মেঠাই খাওয়াও। তা নইলে মরণের পরে তোমাকে বাড়ীতেই ফেলে রেখে দেব, শেয়াল শকুনি এসে তোমাকে টেনে ছিঁড়ে খাবে।”

মাসী। সকাল বেলায় আমি যখন উনান পরিষ্কার করি, তখন লুচিমেঠাই খেতে আসিস্ থালায় ভরে ছাই খেতে দেব না? পাড়ার যত হতভাগা ছেলেগুলা আমার কাছে এসেছে আবার ফলার খেতে?

গাঁয়ের অনেক ব্রাহ্মণ এসে বলেন, “মাসী, জলের অভাবে মানুষের যে কষ্ট, তুমি ত তা জান? একটা দীঘি কেটে দাও, সবাই জল খেয়ে তোমার নাম করে ধন্য ধন্য কর্‌বে, তোমারও তাতে স্বর্গলাভ হবে।”

মাসী। দীঘি কাটার চেয়ে গাঁয়ের লোকের শ্রাদ্ধের জন্য আমি টাকা রেখে দেব, তাতে আমার আরো বেশি পুণ্যি হবে।

মাসীর এই সব কথা শুনে এক দল দুষ্টু যুবক প্রতিজ্ঞা করলে, যেমন করেই হোক এবার দুর্গাপূজার সময়ে মাসীর বাড়ীতে লুচি মেঠাই খেতেই হবে। এই সব যুবক এমন দুষ্টু যে, তাদের অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। তারা ভেবে ভেবে মাসীকে জব্দ করার এক ফন্দি বের করলে। মাসীর একটি কাকাতুয়া পাখী ছিল। পাখীটি বড়ই সুন্দর। মাসীর বাড়ী গেলে তোমাকে একটিবার পাখীর পানে চাইতেই হবে, চাইলেই চোখ জুড়িয়ে যাবে। মাসীর প্রাণে যতটুকু ভালবাসা আছে, সবটুকু তিনি ঐ পাখীকেই দিয়ে রেখেছেন। পাখীটি তাঁর পেটের ছেলের চেয়েও অনেক বেশি। ঐ কাকাতুয়াকে নাওয়াতে, খাওয়াতে, আদর

তোমাদের লুচি, তরকারি আর দই চিনি খাওয়াব। তোমরা খাবার সময় যে ছোটখাট এক একটি রাক্ষস ; পঞ্চাশখানা লুচি, আর এক গামলা ডাল তরকারি না হলে তোমাদের ক্ষুধা কিছুতেই যাবে না। একবার ভেবে দেখ ত, তোমাদের দলের সবগুলিকে খাওয়াতে আমার কত টাকা খরচ হয়ে যাবে ?"

বীরেনের দল তখন মাসীর কথাতেই একরকম রাজি হয়ে, তাঁকে মাঝখানে নিয়ে, ভূতের মাঠে গিয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু বটগাছের কাছে গিয়ে মাসীর পা আর চলে না, মুখ দিয়েও কথা বের হয় না। বীরেন বল্লে, "ভয় কি মাসী, মোটা মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ভূত এলে যে আমরাই তার মাথা ভাঙ্গব। ঐ দেখ, বটগাছের ডালের উপরে তোমার কাকাতুয়া ; তুমি একবার আদর করে ডাক না, তা হলেই তোমার কাঁধের উপরে এসে বস্‌বে।"

কাকাতুয়াকে দেখে মাসীর মুখে কথা ফুট্‌লো। তিনি বল্লেন, "আমার লক্ষ্মী কাকাতুয়া, এস, একবার কাছে এস।"

মাসীর কথা বলার পরেই হঠাৎ বটগাছের একখানা ডাল নড়ে উঠ্‌লো, ঝর্‌ঝর্‌ করে কতকগুলি শুক্‌নো পাতা নীচে পড়ে গেল। তার পরে পাখা নাড়্‌তে নাড়্‌তে মস্ত বড় এক পাখী উড়ে গেল, পাখী উড়ে যাবার পরে দুখানা, তিনখানা চারখানা—শেষকালে অনেকগুলি ডাল নড়ে উঠলো ; দুই তিনজন যেন গাছের সরু ডাল ভেঙ্গে ভেঙ্গে বীরেনদের গায়ে ফেল্‌তে লাগ্‌লো। বীরেনরা হাঁক ছেড়ে বল্লে, "কে আমাদের মাথায় ডাল ভেঙ্গে ফেলছে ? প্রাণের ভয় নেই বুঝি ? আয় না কোন্ ভূত নেমে আস্‌বি, সাহস থাকে ত গাছের নীচে নেমে আয়, লাঠির চোটে আজ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করে যাব না ?"

বীরেনের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বটের গাছের উপর থেকে ঝপাং করে প্রথমে একটি, তার পরে একটি, তার পরে একটি, এম্নি করে তিন ভূত লাফিয়ে পড়্‌লো। বীরেনরা ভূত দেখে পঁচিশ হাত দূরে সরে গেল ; মাসীর আর পা নড়ে না, তিনি যেখানকার মানুষ সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তিন ভূত মাসীর চারিদিকে ঘুরে ঘুরে ধেই ধেই নৃত্য করতে লাগলো। প্রথম ভূত বল্লে,—

ঘরে আছে ধন পড়ে পাওয়া,
ও মাসী, তুই মাংস খাওয়া ;
মাংস খাওয়া, মাংস খাওয়া।"

দ্বিতীয় ভূত বল্লে—

সুদের টাকা পাও যে রোজ,
ভূতদের একটা দাওনা ভোজ—
ভূতেদের একটা দাওনা না ভোজ।"

তৃতীয় ভূত বল্লে—

"ভোজ যদি না খেতে পাই,
আজ তা হলে রক্ষা নাই।
ভাঙ্‌ব মাসী তোমার ঘাড়,
রক্ত খাব কাকাতুয়ার।"

মাসী চেঁচিয়ে বল্লেন, "বাবা বীরেন, আমায় ফেলে কোথায় যাচ্ছ ? আমি বলছি এই দুর্গা পূজার সময়ে সব ছেলেদের নিমন্ত্রণ করে, মাংস পোলাউ আর দই সন্দেশ খওয়াব ; তোমরা ভূতের হাত থেকে আমাকে আর আমার কাকাতুয়াটিকে রক্ষে কর।"

বীরেনরা মাসীর কাছে এসে বল্লে, "মাসী তুমি এই বটের গাছ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে বল, "যথার্থই আমাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে

আমার টাকা না দিলে, তোর্ ঘরে তিনি মরণ নিয়ে আস্‌বেন; যমরাজ তোর ছেলেপিলে সবগুলিকে নিয়ে যাবেন।"

মাসীর এই রকম কথা শুনে পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের ভয়ে প্রাণ কেঁপে ওঠে। প্রাণ কেঁপে ওঠার কারণও আছে। মানুষেরা বলে, মাসী এক বাড়ীতে এই রকম শাপ দিয়ে আসার পরেই কলেরা হয়ে সে বাড়ীর দুটি ছোট ছোট ছেলেই মারা গেল। তাই মাসীর কথায় পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা ভয় পেয়ে হাতের বালা ও নাকের নোলক বেচে দেনা শোধ করে দেয়।

২

মাসী ত জুলুম করে মানুষের কাছে টাকা আদায় করেন, অথচ খরচের সময়ে তিনি ভয়ানক কৃপণ, হাতের ফাঁক দিয়ে একটি পয়সা বের হতে চায় না। গাঁয়ের স্কুলের ছেলেরা মাসীকে গিয়ে বলে, "মাসী, তুমি একলা মানুষ, কেউ ত নেই; মরে গেলে যক্ষ যে এসে তোমার ধন অধিকার কর্‌বে; তাতে তোমার কি লাভ হবে? তার চেয়ে ভাল কাজে টাকাকড়ি দান কর না কেন? খুব পুণ্যি হবে। আমরা সব ছেলেরা মিলে একটা লাইব্রেরী কর্‌ছি, ঢের বই কিন্‌তে হবে। তার জন্য কিছু টাকা কেন দান কর না?"

মাসী। কেন? এ গাঁয়ের পুরুষগুলি কি সব মহামারীতে মরে গেছে না কি? আমি মেয়েলোক, আমার কাছে কেন এসেছিস্ বই কেনার জন্যে টাকা চাইতে?

আর একদল যুবক এসে বলে, "মাসী, জান ত? এ গাঁয়ের মানুষ মর্‌লে আমরাই বয়ে শ্মশানে নিয়ে পোড়াই। তুমি মলে, আমরাই ত কাঁধে করে পোড়াতে নিয়ে যাব। তাই বলি, এবার পূজার সময় আমাদের লুচি মেঠাই খাওয়াও। তা নইলে মরণের পরে তোমাকে বাড়ীতেই ফেলে রেখে দেব, শেয়াল শকুনি এসে তোমাকে টেনে ছিঁড়ে খাবে।"

মাসী। সকাল বেলায় আমি যখন উনান পরিষ্কার করি, তখন লুচিমেঠাই খেতে আসিস্ থালায় ভরে ছাই খেতে দেব না? পাড়ার যত হতভাগা ছেলেগুলা আমার কাছে এসেছে আবার ফলার খেতে?

গাঁয়ের অনেক ব্রাহ্মণ এসে বলেন, "মাসী, জলের অভাবে মানুষের যে কষ্ট, তুমি ত তা জান? একটা দীঘি কেটে দাও, সবাই জল খেয়ে তোমার নাম করে ধন্য ধন্য কর্‌বে, তোমারও তাতে স্বর্গলাভ হবে।"

মাসী। দীঘি কাটার চেয়ে গাঁয়ের লোকের শ্রাদ্ধের জন্য আমি টাকা রেখে দেব, তাতে আমার আরো বেশি পুণ্যি হবে।

মাসীর এই সব কথা শুনে এক দল দুষ্টু যুবক প্রতিজ্ঞা করলে, যেমন করেই হোক এবার দুর্গাপূজার সময়ে মাসীর বাড়ীতে লুচি মেঠাই খেতেই হবে। এই সব যুবক এমন দুষ্টু যে, তাদের অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। তারা ভেবে ভেবে মাসীকে জব্দ করার এক ফন্দি বের করলে। মাসীর একটি কাকাতুয়া পাখী ছিল। পাখীটি বড়ই সুন্দর। মাসীর বাড়ী গেলে তোমাকে একটিবার পাখীর পানে চাইতেই হবে, চাইলেই চোখ জুড়িয়ে যাবে। মাসীর প্রাণে যতটুকু ভালবাসা আছে, সবটুকু তিনি ঐ পাখীকেই দিয়ে রেখেছেন। পাখীটি তাঁর পেটের ছেলের চেয়েও অনেক বেশি। ঐ কাকাতুয়াকে নাওয়াতে, খাওয়াতে, আদর

তোমাদের লুচি, তরকারি আর দই চিনি খাওয়াব। তোমরা খাবার সময় যে ছোটখাট এক একটি রাক্ষস; পঞ্চাশখানা লুচি, আর এক গামলা ডাল তরকারি না হলে তোমাদের ক্ষুধা কিছুতেই যাবে না। একবার ভেবে দেখ ত, তোমাদের দলের সবগুলিকে খাওয়াতে আমার কত টাকা খরচ হয়ে যাবে?"

বীরেনের দল তখন মাসীর কথাতেই একরকম রাজি হয়ে, তাঁকে মাঝখানে নিয়ে, ভূতের মাঠে গিয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু বটগাছের কাছে গিয়ে মাসীর পা আর চলে না, মুখ দিয়েও কথা বের হয় না। বীরেন বল্লে, "ভয় কি মাসী, মোটা মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ভূত এলে যে আমরাই তার মাথা ভাঙ্গব। ঐ দেখ, বটগাছের ডালের উপরে তোমার কাকাতুয়া; তুমি একবার আদর করে ডাক না, তা হলেই তোমার কাঁধের উপরে এসে বস্‌বে।"

কাকাতুয়াকে দেখে মাসীর মুখে কথা ফুট্‌লো। তিনি বল্লেন, "আমার লক্ষ্মী কাকাতুয়া, এস, একবার কাছে এস।"

মাসীর কথা বলার পরেই হঠাৎ বটগাছের একখানা ডাল নড়ে উঠ্‌লো, ঝর্‌ঝর্ করে কতকগুলি শুক্‌নো পাতা নীচে পড়ে গেল। তার পরে পাখা নাড়্‌তে নাড়্‌তে মস্ত বড় এক পাখী উড়ে গেল, পাখী উড়ে যাবার পরে দুখানা, তিনখানা চারখানা—শেষকালে অনেকগুলি ডাল নড়ে উঠলো; দুই তিনজন যেন গাছের সরু ডাল ভেঙ্গে ভেঙ্গে বীরেনদের গায়ে ফেল্‌তে লাগ্‌লো। বীরেনরা হাঁক ছেড়ে বল্লে, "কে আমাদের মাথায় ডাল ভেঙ্গে ফেলছে? প্রাণের ভয় নেই বুঝি? আয় না কোন্ ভূত নেমে আস্‌বি, সাহস থাকে ত গাছের নীচে নেমে আয়, লাঠির চোটে আজ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করে যাব না?"

বীরেনের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বটের গাছের উপর থেকে ঝপাং করে প্রথমে একটি, তার পরে একটি, তার পরে একটি, এম্নি করে তিন ভূত লাফিয়ে পড়্‌লো। বীরেনরা ভূত দেখে পঁচিশ হাত দূরে সরে গেল; মাসীর আর পা নড়ে না, তিনি যেখানকার মানুষ সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তিন ভূত মাসীর চারিদিকে ঘুরে ঘুরে ধেই ধেই নৃত্য কর্‌তে লাগলো। প্রথম ভূত বল্লে,—

ঘরে আছে ধন পড়ে পাওয়া,
ও মাসী, তুই মাংস খাওয়া;
মাংস খাওয়া, মাংস খাওয়া।"

দ্বিতীয় ভূত বল্লে—

সুদের টাকা পাও যে রোজ,
ভূতদের একটা দাওনা ভোজ—
ভূতেদের একটা দাওনা না ভোজ।"

তৃতীয় ভূত বল্লে—

"ভোজ যদি না খেতে পাই,
আজ তা হলে রক্ষা নাই।
ভাঙ্‌ব মাসী তোমার ঘাড়,
রক্ত খাব কাকাতুয়ার।"

মাসী চেঁচিয়ে বল্লেন, "বাবা বীরেন, আমায় ফেলে কোথায় যাচ্ছ? আমি বলছি এই দুর্গা পূজার সময়ে সব ছেলেদের নিমন্ত্রণ করে, মাংস পোলাউ আর দই সন্দেশ খওয়াব; তোমরা ভূতের হাত থেকে আমাকে আর আমার কাকাতুয়াটিকে রক্ষে কর।"

বীরেনরা মাসীর কাছে এসে বল্লে, "মাসী তুমি এই বটের গাছ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে বল, "যথার্থই আমাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে

খাওয়াবে, আর সুদের টাকা আদায় করতে গিয়ে গরীব দুঃখীর উপরে জুলুম কর্‌বে না, তা হলে এখনি আমরা ভূত তাড়িয়ে তোমাকেও বাঁচাব, তোমার কাকতুয়াটিকেও গাছের উপর থেকে ধরে তোমার হাতে দেব।"

মাসী তৎক্ষণাৎ বটের গাছ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন। যুবকেরা লাঠি হাতে করে ভূতদের তাড়া করতেই তারা পালিয়ে গেল। তখন বীরেন সান্যাল নিজেই বট গাছের উপরে উঠে, কাকাতুয়াটিকে নিয়ে এসে বল্লে, "মাসী, এই নাও তোমার কাকাতুয়া। কেমন, খুসী হলে ত?"

মাসী বাড়ীতে ফিরে এসে সুস্থির হলেন, যতক্ষণ ভূতের মাঠে ছিলেন, ততক্ষণ তাঁর আর খুসী হয়ে কথা বল্‌বার মতন অবস্থা ছিল না। তিনি সত্য সত্যই দুর্গাপূজার সময়ে গাঁয়ের ছেলে নিমন্ত্রণ করে বেশ এক ভোজ দিলেন, তাতে তাঁর বেশ দু-টাকা খরচ হয়ে গেল। শুধুই তা নয়, কে বলবে, কেমন করে মাসীর প্রকৃতি বদলে গেল, তিনি আর সুদের টাকার জন্যে গরীবদের উপরে জুলুম করতেন না। তা ছাড়া গ্রামের কয়েকজন ভালমানুষকে ডেকে বল্লেন, "তোমাদের হাতে টাকা দিচ্ছি, তোমরা দেখে শুনে ভাল জায়গায় একটি দিঘি কাটাও লোকের জল কষ্ট যেন দূর হয়।"

মানুষগুলি খুসী হয়ে, অত্যন্ত পরিশ্রম করে মস্ত বড় এক দিঘি কাটালেন, তার নাম "রাইমণি দিঘি" রাখলেন। আজ আর রাইমণি মাসী বেঁচে নেই, কিন্তু হাজার হাজার লোক সেই দিঘির নির্ম্মল জল পান করে, মাসীর উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকেন।

এইখানে একটি কথা ভেঙ্গে বলা আবশ্যক। বটগাছের উপর থেকে যারা লাফিয়ে পড়েছিল, তারা সত্য সত্যই ভূত নয়, বীরেনের দলের তিন ছেলে মুখোস পরে ভূত সেজে গাছের উপরে বসেছিল। বীরেনদের এ কাজটা কিন্তু মোটেই ভাল হয় নাই।

শ্রীঅমৃত লাল গুপ্ত

খেলনা

(Hilaire Belloc)

কান্হাইয়া ছিল ঘরে বছর চারেক,
দেবতা পাঠাল তারে খেলনা অনেক,
সোণাদিয়ে কেনা যারে চলেনা বাজারে,
জুড়ি যার মেলেনাক শতেকে হাজারে॥
তবু সে খেলনা নিয়ে খেলেনি গোপাল,
বাঁশের বাঁশরী লাগি, হায় রে কপাল
কত মেহনৎ আর কতনা যতন,
যেন সে অমূল্য নিধি কৌস্তুভ রতন॥
কান্হাইয়া, বাঁশী খানি তব বৃন্দাবনে,
ভুলিয়া কোথায় ফেলে গেলে আনমনে?
স্বপনে বলিয়া দাও, খুঁজে তারে আনি,
আদরে অধরে রেখে, বলি মোর বাণী॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

লোহার সিন্ধুকেই আছে, ওতে আমাদের সর্ব্বস্ব, মনে রাখিস্, ও গেলে আর দেশে যেতেও হবে না। ঘর ছেড়ে তোরা কোথাও যাস্নি, আমি বরং জেলে পাড়া থেকে মঙ্ বাথান্‌কেও পাঠিয়ে দবো ”। মাধুরী বল্‌ল, “তাই দিয়ো মা, আমরা তিনজনে বেশ গল্প কোরব, খেলব। তুমি কিন্তু সন্ধ্যার আগেই এসো ”।

মা চলে যেতেই মাধুরী আর হ্লা-পে ঘরের বারাণ্ডায় একটা চাটাই পেতে লুডো খেল্‌তে লাগল। খেল্‌তে আজ আর তাদের মন বস্‌ছে না, কেবলই ঘুরে ফিরে দেশে যাওয়ার কথাই উঠ্‌ছে। মাধুরী বল্‌ছে “যদি টাকার বাকসটা কেউ চুরী কোরে নিয়ে যায় তো বেশ মজা হয়না রে হ্লা-পে? তাহোলে আমাদের দেশে যাওয়াও হয়না, আমার বিয়েও দিতে পারবে না। সোণা না থাক্‌লে কি নিয়ে মা গয়না গড়াবে?” মঙ্ হ্লা-পে চোখ রাঙিয়ে বল্লে “এই তোর বুদ্ধি? সাধে কি বলি “কালার” মেয়ে, কত আর হবে? তোর বাপ কত কষ্ট কোরে, গায়ের রক্ত জল কোরে টাকা গুলো জমিয়েছে, কতকাল পরে দেশে যাবে, নিজের দেশ। কত আনন্দ। কত আহ্লাদে তার বুক ভরে রয়েছে? আর তুই স্বচ্ছন্দে সে টাকা চোরের হাতে তুলে দিতে চাইছিস্? তুই কিনা বর্ম্মিনী, তাই দেশের জন্যে তোর টান নেই, বুঝিস্‌না তোর বাপের দুঃখ ”।

মাধুরী অভিমানে বলল “আহা। তুই বুঝি আর চাস্‌না যে আমাদের দেশে যাওয়া না হোক্? ভারী সাধু সাজ্‌লি।”

হ্লা-পে বলল “তোদের রাখতে চাই বোলে কি তোর বাপের সর্ব্বনাশ কোরবো? তোর বাপ যে আমার বাপের মত। তাঁর জন্যে আমার প্রাণ দিতে রাজী। তুইও নিশ্চয় তোর বাপের ধন রক্ষা করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবি, কি বলিস্?”

মাধুরী উৎসাহে বলল “হাঁ, নিশ্চই, তোর কাছে যে বিদ্যে শিখেছি তার সদ্ব্যবহার করবার সুযোগ পেলে ছাড়বনা কখনো।”

খেলতে খেলতে দুজনে বরাবর রাস্তার দিকে চাইছে, বা-থান্ বা মাধুরীর মা কারও দেখা নেই। মেঘ কোরেছে, বৃষ্টি আস্‌বে মনে হোচ্ছে। মাধুরী বলল, “হ্লা-পে, দ্যাখ্, অন্ধকার হোয়ে এলো, মা এলেননা, কেন জানি ভয় ভয় কোরছে।”

হ্লা-পে বল্‌ল, “ভয় কিরে? তবে আমি ভাবছি, সকালে মায়ের শরীরটা ভাল নয় দেখে এসেছি, যদি মায়ের অসুখ বেড়ে থাকে। হয়ত তোর মা আমার মাকে একা ফেলে আস্‌তে পারছেনা, তুই একটু পারবি একা থাক্‌তে, আমি চট্ কোরে খবর নিয়ে আসি। বরং পথে কাউকে পেলে তোর কাছে পাঠিয়ে দেবো।”

মাধুরী বলল ‘‘না ভাই, আমাকে একা ফেলে যাসনি তুই। মাও তো বল্লেন বাথান্‌কে পাঠাবেন, কই সেও তো এলনা। নিশ্চয়ই ওদিকে কোনো বিপদ হোয়েছে। কিন্তু তুই যেতে পাবি না।”

হ্লা-পে একটু চিন্তিত হোলো। তার মন বল্‌তে লাগল যেন তার মায়ের অসুখ বেড়েছে। মাধুরীর মাও হয়ত তাকে নিয়েই ব্যস্ত। কি কোরবে সে? মাধুরীকে নিয়ে যাবে কিনা ভাবতে লাগল। অবশেষে সে প্রস্তাব কোরলে, টাকার বাকসটা বের কোরে সঙ্গে নিয়ে দুজনে গেলে হয়না?

খাওয়াবে, আর সুদের টাকা আদায় করতে গিয়ে গরীর দুঃখীর উপরে জুলুম করবে না, তা হলে এখনি আমরা ভূত তাড়িয়ে তোমাকেও বাঁচাব, তোমার কাকতুয়াটিকেও গাছের উপর থেকে ধরে তোমার হাতে দেব।”

মাসী তৎক্ষণাৎ বটের গাছ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন। যুবকেরা লাঠি হাতে করে ভূতদের তাড়া করতেই তারা পালিয়ে গেল। তখন বীরেন সান্যাল নিজেই বট গাছের উপরে উঠে, কাকাতুয়াটিকে নিয়ে এসে বল্লে, “মাসী, এই নাও তোমার কাকাতুয়া। কেমন, খুসী হলে ত?”

মাসী বাড়ীতে ফিরে এসে সুস্থির হলেন, যতক্ষণ ভূতের মাঠে ছিলেন, ততক্ষণ তাঁর আর খুসী হয়ে কথা বল্‌বার মতন অবস্থা ছিল না। তিনি সত্য সত্যই দুর্গাপূজার সময়ে গাঁয়ের ছেলে নিমন্ত্রণ করে বেশ এক ভোজ দিলেন, তাতে তাঁর বেশ দু-টাকা খরচ হয়ে গেল। শুধুই তা নয়, কে বলবে, কেমন করে মাসীর প্রকৃতি বদলে গেল, তিনি আর সুদের টাকার জন্যে গরীবদের উপরে জুলুম করতেন না। তা ছাড়া গ্রামের কয়েকজন ভালমানুষকে ডেকে বল্লেন, “তোমাদের হাতে টাকা দিচ্ছি, তোমরা দেখে শুনে ভাল জায়গায় একটি দিঘি কাটাও লোকের জল কষ্ট যেন দূর হয়।”

মানুষগুলি খুসী হয়ে, অত্যন্ত পরিশ্রম করে মস্ত বড় এক দিঘি কাটালেন, তার নাম “রাইমণি দিঘি” রাখলেন। আজ আর রাইমণি মাসী বেঁচে নেই, কিন্তু হাজার হাজার লোক সেই দিঘির নির্ম্মল জল পান করে, মাসীর উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকেন।

এইখানে একটি কথা ভেঙ্গে বলা আবশ্যক। বটগাছের উপর থেকে যারা লাফিয়ে পড়েছিল, তারা সত্য সত্যই ভূত নয়, বীরেনের দলের তিন ছেলে মুখোস পরে ভূত সেজে গাছের উপরে বসেছিল। বীরেনদের এ কাজটা কিন্তু মোটেই ভাল হয় নাই।

শ্রীঅমৃত লাল গুপ্ত

খেলনা

(Hilaire Belloc)

কাম্বাইয়া ছিল ঘরে বছর চারেক,
দেবতা পাঠাল তারে খেলনা অনেক,
সোণাদিয়ে কেনা যারে চলেনা বাজারে,
জুড়ি যার মেলেনাক শতেকে হাজারে॥
তবু সে খেলনা নিয়ে খেলেনি গোপাল,
বাঁশের বাঁশরী লাগি, হায় রে কপাল
কত মেহনৎ আর কতনা যতন,
যেন সে অমূল্য নিধি কৌস্তুভ রতন॥
কাম্বাইয়া, বাঁশী খানি তব বৃন্দাবনে,
ভুলিয়া কোথায় ফেলে গেলে আনমনে?
স্বপনে বলিয়া দাও, খুঁজে তারে আনি,
আদরে অধরে রেখে, বলি মোর বাণী॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

লোহার সিন্দুকেই আছে, ওতে আমাদের সর্ব্বস্ব, মনে রাখিস্, ও গেলে আর দেশে যেতেও হবে না। ঘর ছেড়ে তোরা কোথাও যাস্নি,
আমি বরং জেলে পাড়া থেকে মঙ্ বাথান্‌কেও পাঠিয়ে দবো”। মাধুরী বল্ল, “তাই দিয়ো মা, আমরা তিনজনে বেশ গল্প কোরব, খেলব। তুমি কিন্তু সন্ধ্যার আগেই এসো”।

মা চলে যেতেই মাধুরী আর হ্লা-পে ঘরের বারাণ্ডায় একটা চাটাই পেতে লুডো খেল্‌তে লাগল। খেল্‌তে আজ আর তাদের মন বস্‌ছে না, কেবলই ঘুরে ফিরে দেশে যাওয়ার কথাই উঠ্‌ছে। মাধুরী বল্‌ছে “যদি টাকার বাকসটা কেউ চুরী কোরে নিয়ে যায় তো বেশ মজা হয়না রে হ্লা-পে? তাহোলে আমাদের দেশে যাওয়াও হয়না, আমার বিয়েও দিতে পারবে না। সোণা না থাক্‌লে কি নিয়ে মা গয়না গড়াবে?” মঙ্ হ্লা-পে চোখ রাঙিয়ে বল্লে “এই তোর বুদ্ধি? সাধে কি বলি “কালার” মেয়ে, কত আর হবে? তোর বাপ কত কষ্ট কোরে, গায়ের রক্ত জল কোরে টাকা গুলো জমিয়েছে, কতকাল পরে দেশে যাবে, নিজের দেশ! কত আনন্দ! কত আহ্লাদে তার বুক ভরে রয়েছে? আর তুই স্বচ্ছন্দে সে টাকা চোরের হাতে তুলে দিতে চাইছিস্? তুই কিনা বর্ম্মিনী, তাই দেশের জন্যে তোর টান নেই, বুঝিস্‌না তোর বাপের দুঃখ”।

মাধুরী অভিমানে বলল “আহা! তুই বুঝি আর চাস্‌না যে আমাদের দেশে যাওয়া না হোক্? ভারী সাধু সাজ্‌লি!”

হ্লা-পে বলল “তোদের রাখতে চাই বোলে কি তোর বাপের সর্ব্বনাশ কোরবো? তোর বাপ যে আমার বাপের মত। তাঁর জন্যে আমার প্রাণ দিতে রাজী। তুইও নিশ্চয় তোর বাপের ধন রক্ষা করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবি, কি বলিস্?”

মাধুরী উৎসাহে বলল “হাঁ, নিশ্চই, তোর কাছে যে বিদ্যে শিখেছি তার সদ্ব্যবহার করবার সুযোগ পেলে ছাড়বনা কখনো।”

খেলতে খেলতে দুজনে বরাবর রাস্তার দিকে চাইছে, বা-থান্ বা মাধুরীর মা কারও দেখা নেই। মেঘ কোরেছে, বৃষ্টি আস্‌বে মনে হোচ্ছে। মাধুরী বলল, “হ্লা-পে, দ্যাখ্, অন্ধকার হোয়ে এলো, মা এলেননা, কেন জানি ভয় ভয় কোরছে।”

হ্লা-পে বল্‌ল, “ভয় কিরে? তবে আমি ভাবছি, সকালে মায়ের শরীরটা ভাল নয় দেখে এসেছি, যদি মায়ের অসুখ বেড়ে থাকে। হয়ত তোর মা আমার মাকে একা ফেলে আস্‌তে পারছেনা, তুই একটু পারবি একা থাক্‌তে, আমি চট্ কোরে খবর নিয়ে আসি। বরং পথে কাউকে পেলে তোর কাছে পাঠিয়ে দেবো।”

মাধুরী বলল “না ভাই, আমাকে একা ফেলে যাসনি তুই। মাও তো বল্লেন বাথান্‌কে পাঠাবেন, কই সেও তো এলনা। নিশ্চয়ই ওদিকে কোনো বিপদ হোয়েছে। কিন্তু তুই যেতে পাবি না।”

হ্লা-পে একটু চিন্তিত হোলো। তার মন বল্‌তে লাগল যেন তার মায়ের অসুখ বেড়েছে। মাধুরীর মাও হয়ত তাকে নিয়েই ব্যস্ত। কি কোরবে সে? মাধুরীকে নিয়ে যাবে কিনা ভাবতে লাগল। অবশেষে সে প্রস্তাব কোরলে, টাকার বাকসটা বের কোরে সঙ্গে নিয়ে দুজনে গেলে হয়না?

মাধুরী বললে, চাবি তো আমার কাছে নেই সে মা কি বাবার কাছে আছে, জানিনা।”

এক পশলা বৃষ্টি হোয়ে গেল, অন্ধকার আরও ঘনিয়ে এলো। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের রেখা ঝিল্‌মিলিয়ে উঠে বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে আধ-অন্ধকার ঘরখানিকে চম্‌কিয়ে তুলছে।

একখানি তক্তাপোষের উপর গালে হাত দিয়ে দুজনে বসে, কত ভাবছে, কি কোরবে?

হ্লা-পে উঠে পড়ে বলল, “না মাধুরী আমার নিশ্চিত মনে হোচ্ছে, আমার মায়ের কিছু হোয়েছে। নইলে তোর মা আস্‌ছেনা, জেলে পাড়ার কোন একটা লোক কোন খবর দিতেও এলনা। তুই দরজায় খিল দিয়ে বোস্‌, দা'খানা হাতের কাছে রাখ। ভয় পাচ্ছিস্‌ না তো? এতদিন ধরে এতো শেখালুম তোকে, সব মাটি হোল? যদিই এমন দরজা ভেঙ্গে কেউ ঘরে ঢোকে, তবে তাকে টুক্‌রো কোরে ফেল্‌বি, তবু ঘর ফেলে পালাবিনা কিন্তু। এখন রাত আটটা মোটে, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরব, না হয় কাউকে নিশ্চয় পাঠাব। দ্যাখ, পারবি তো থাক্‌তে? আমার মনটা যেন কেমন কেঁদে উঠছে, নিশ্চয়ই আমার মায়ের কিছু হোয়েছে। ওরে মাধুরী, আমায় ছেড়ে দে, আমার মা ছাড়া যে আর কেউ নেই।” বলতে বলতে হ্লাপের দুই চোখ দিয়ে ঝরঝর কোরে জল গড়িয়ে পড়ল।

মাধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে “যা তুই হ্লা-পে আমি পারব একা থাকতে। মায়ের যে কি বুদ্ধি! আমাদের এই ভাবে ফেলে বেশ নিশ্চিন্ত রয়েছেন!

হ্লা-পে বল্‌ল “তোর মা জানেন আমি আছি তোর কাছে, কোন ভয় নেই। তোকে ফেলে যাওয়া উচিত হবে কিনা বুঝতে পাচ্ছিনা ঠিক, কি যে করি?”

মাধুরী হ্লা-পেকে এক ঠেলা দিয়ে বলল “আর ভেবে কাজ নেই, বেশী রাত্তিরে আমি থাক্‌তে পারবনা, এখন যাবি তো যা, খুব শীগগীর আসবি কিন্তু, মায়ের মতন যেন করিস না।”

মাঙ্‌ হ্লা-পে মাধুরীকে খুব সাবধানে থাকবার অনেক উপদেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মাধুরী খানিকক্ষণ রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। অন্ধকারে হলাপেকে যখন আর দেখা গেল না তখন দরজাটা ভাল করে খিল বন্ধ কোরলো। জানালাগুলো টেনে দেখ্‌লে ভাল বন্ধ আছে কিনা। তারপর দা খানা হাতে ধরে ২।৪ বার নাড়া চাড়া কোরে তক্তপোষের উপর রেখে বস্‌ল। রাজপুত রমণীদের বীরত্বের কাহিনী সে পড়তে খুব ভালবাস্‌ত। মনে সাহস বাড়াবার জন্যে দেয়ালের কুলুঙ্গী থেকে “রাজপুতনার ইতিহাস” খানা টেনে নিয়ে শুয়ে শুয়ে পড়তে লাগ্‌লো। একটু তন্দ্রা এসেছে, হাত থেকে বই খানা গড়িয়ে পড়ে যেতেই একটু চমকে উঠলো। কিসের একটা শব্দ কানে এলো। উঠে বসে ঘরের চারিদিক তাকিয়ে দেখলো। যে কোণটিতে লোহার সিন্দুকটা ছিল, তার পাশে কিসের একটা ছায়া নড়ে উঠল। ভয়ে তার বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ কোরতে লাগল। প্রদীপের মিট্‌মিটে আলোয় ঘরখানার সব যায়গা ভাল কোরে দেখা যায় না। আলোটা উস্কে দিতেই একটা মানুষের মূর্ত্তি পরিষ্কার হোয়ে উঠলো। মাধুরী তার দা খানা পাটীর নীচে লুকিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল এবং গম্ভীর স্বরে বর্ম্মা ভাষায় জিজ্ঞাসা করল “তুই কে? কেমন কোরে ভিতরে এলি?” লোকটা

প্রকাণ্ড একখানা ঝক্‌ঝকে দা উঁচু কোরে ধরে বল্‌ল "যদি বাঁচতে চাও তো যেখানে আছ, চুপ কোরে বসে থাক"। মাধুরীর সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ কোরে কাঁপতে লাগলো, মুখে তার কথা সরল না, হাত পা যেন অবশ হোয়ে এলো। সে তক্তা-পোষের উপর বসে পড়ল। সেই লোকটা দাখানা মাটীতে রেখে লোহার সিন্ধুকের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এক গোছা চাবির থেকে একটার পর একটী পরীক্ষা কোরতে লাগল। কড়াৎ শব্দে চাবি খুলে গেল, দরজা খুলে ভিতর থেকে একটী ছোট হাত বাক্স বের কোরে মাটীতে রাখলো, তারপর আবার সিন্ধুকের ভিতরের একটী দেরাজ খুলে, তার ভিতর থেকে এক তাড়া কাগজ পত্র বের কোরে নিয়ে কি সব দেখতে লাগল। মাধুরী পিছন থেকে বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে এসে লোকটার ঘাড়ের উপর এক কোপ মার্‌ল, ডান হাতখানা তার কেটে পড়ে গেল, ধড়াস্ কোরে মেঝের উপরে তার শরীরটা লুটিয়ে পড়ল। মাধুরী তার কোমরের উপর জোরে জোরে আরও দুই একটা কোপ বসিয়ে, দা-খানা ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর কাগজের তাড়াটা আর হাত বাক্সটা তুলে নিয়ে দরজার খিল খুলে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে লাগলো। কোথায় যাবে সে কিছুই জানে না। যত সে দৌড়ায়, ততই যেন মনে হয় তার পিছনে পায়ের শব্দ, এই বুঝি কে তাকে ধরে, এই বুঝি তার বুকের থেকে তার বাবার এত কষ্টের ধন সব ছিনিয়ে নিয়ে যায়! নিজের প্রাণের ভয় আর তার নেই! বাপের ধন রক্ষাই এখন তার কাছে সব চেয়ে বড় জিনিস।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশান্তিময়ী দত্ত।

আজব ব্যাপার

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

বিকাল বেলা বাজার ক'রে,
দুই বলদের গাড়ী চ'ড়ে,
শহর থেকে ফেরেন বাবু,
ঝাঁকড়ানিতে হ'য়ে কাবু।
চলতে হবে অনেকক্ষণ,
বাবুর বাড়ী 'মধুবন'।
উদয়গিরির পথের মাঝ,
আঁধার ক'রে নাম্‌ল সাঁঝ।
বনবাদাড়ে বাঘের ভয়,
সাবধানেতে যেতে হয়;
ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে যান,
সজাগ আছে গাড়োয়ান।

পোলের কাছে যেমনি এল
বলদ দুটো থম্‌কে গেল,
নড়বেনা আর কিছুতেই।
সাম্‌নে চাহেন বাবু যেই,
দেখেন তাদের অপেক্ষাতে
প্রকাণ্ড বাঘ থাবা পাতে!
চম্‌কে ওঠে বাবুর প্রাণ,
চম্‌কে ওঠে গাড়োয়ান,
ভয়েতে বুক দুরু দুরু;
গাড়ীর বলদ করলে সুরু
পিছন হটে হটে যেতে।
ফেলবে নাকি পগাড়েতে?

এমন সময় আজব ব্যাপার
হঠাৎ লোহার বেড়টা চাকার
ছুটকে গিয়ে, গড়গড়িয়ে
পড়ল খানায় ঝন্‌ঝনিয়ে।
ব্যাঘ্র ভাবেন বিষম বিপদ!
এ কোন্ জীব এ কোন্ আপদ?
হুহুঙ্কারে এক লাফেতে
ঢুক্‌ল সে তার জঙ্গলেতে।

'যম ত ঘাড়ে পড়ল বুঝে,
ত্রস্ত বলদ চক্ষু বুঁজে,
হুড়হুড়িয়ে নিয়ে গাড়ী
সটাং সোজা দিল পাড়ি;
হোচট খেয়ে, আবার উঠে,
প্রাণের ভয়ে চল্‌ল ছুটে,
থাম্‌ল না, না যতক্ষণ
পৌঁছাল সে মধুবন।

শ্রীসুখলতা রাও।

পঞ্চুলাল

সে অনেক কালের কথা। সেই সন তারিখ কারু মনে নাই—পুঁথি কেতাবেও কেউ লিখে রাখে নি। তখন আদ্যিকালের বুড়ীদের ঘরে ঘরে চল্‌তো চরকার ঘ্যানর ঘ্যানর আওয়াজ—ঠিক যেন সাপুড়ের সাপ খেলানো বাঁশীর সুর! সেই সুরের ভাঁজে পাঁজের তুলো টেকোর জিভ দিয়ে বেরুয়ে আস্‌তো মাকড়শার আঁসের মতো; তার হাজারো গজ সুতো হ'লে নলির আধখানা ভরতো; আর তাতে কাঁচুলী তৈরী করে পরীরা ফুরফুরে হাওয়ায় ঘুরে বেড়াতো।

সেই যে তেপান্তরের মাঠ—তোমরা রূপকথায় পড়েছ, সেই মাঠ পেরিয়ে মস্ত বড় বন, তারপর খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তার ওপারে মস্ত বড় ঝাউ বন। তার শন শন আওয়াজ বনের মাথার উপর দিয়ে যখন ভেসে আসে, মনে হয়, ঘুমের দেশে কোন বন্দিনী রাজকন্যার করুণ বিলাপ একটানা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মতোই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই বনে চল্‌বার সোজা পথ নেই;—অজগরের মতো আঁকা বাঁকা একটা সরু পথের দাগ চল্‌তে চল্‌তে কোথায় যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে! তার দু'ধারে ঘন বনের ছায়া। ছায়া নয়—যেন ভূতের দল গাঁদা হয়ে সার বেঁধে পড়ে আছে; একটু সাড়া পেলেই ওরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে মহা সোর গোল বাঁধাবে। কাজেই কোন পথিকই ভয়ে সেই পথ দিয়ে যেতে সাহস করে না।

বনের ওপারে মস্ত বড় এক রাজার রাজত্ব। সেখানে লোকজনের সুখের অন্ত নাই। সেদেশে কত রকমেরই গাছপালা। সেখানে বৃষ্টি যখন সুরু হয় তখন ডাঙ্গার মানুষ ভেলায় আর জলের মাছ গাছের ডালে ঝুল্‌তে থাকে। কিন্তু শস্য হয় প্রচুর। সেখানে আমন ধানের শীষ বেড়ে তাল গাছের সমান উচু হয়। তালের কাদির সঙ্গে ধানের শীষ মাড়াই হোলে চেন্‌বার যো নেই—এত বড় সেই ধানের বীজ। কাজেই সেখানে লোকের খাওয়া পরার ভাবনা মোটেই নেই—সুখ সৌভাগ্যের তো কথাই নেই!

সেই পুরানো দিনের কথা হোলেই আজ-কালের লোকেরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে 'রাম

রাজত্বের' তুলনা দেয়। যেখানে কোনক্রমে যাবার যদি একটা উপায় থাক্‌তো তা হোলে গঙ্গাস্নানের যাত্রীর মতোই সেখানে বার মাসই লোকের ভিড় থাক্‌তো।

সেদেশে ছিল এক কৃষক, তার স্ত্রী আর তাঁদের আদুরে একটি ছেলে। ছেলেটির নাম পঞ্চুলাল। বাপ মা আদর ক'রে ডাকেন পঞ্চু।

কিছুদিন পরে কৃষকটি মারা গেল। রেখে গেল তাঁর সারা জীবনের পুঁজি পাট্টা মাত্র কুড়িটি মোহর।

সেবার ভারি দুর্বৎসর। মাস কাবারে ঘরের চাল ডাল নূন তরকারী ফুরিয়ে যেতেই, মা পুঁজির দশটি মোহর বের করে এনে ছেলের হাতে দিয়ে বল্‌লেন,—বাছা, বাজার থেকে এ বছরের জন্য তেল নূন লঙ্কা চাল ডাল সব কিনে নিয়ে এস—ঘরে যে কিছুই নাই।

দশটি মোহর ট্যাঁকে গুঁজে পঞ্চু বের হয়ে পড়লো। বাজারে ঢুকেই দেখে একটা জায়গায় মস্ত গণ্ডগোল। লোক চারদিকে সার বেঁধে দাড়িয়ে তাম্‌সা দেখছে। পঞ্চু সেই ভিড়ের ভিতর উঁকি মেরে দেখলো একজন লোক একটা কুকুরকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে বেদম প্রহার কচ্ছে। সেই মারের চোটে যন্ত্রনায় কুকুরটি মাটিতে কুক্‌ড়ে পড়ে ভীষণ চীৎকার সুরু করেছে।

পঞ্চুলাল সেই লোকটিকে বল্‌লো,—তুমি যে কুকুরটিকে মেরে খুন করে ফেল্লে হে? প্রাণে তোমার একটু মায়া দয়াও কি নেই?

লোকটি উত্তর দিল,—তাতে তোমার কিহে বাপু? কুকুরটা যে একটা আস্ত মাংসের টুক্‌রো চুরি করে খেলে তার কি? এখন তো ভারি দরদ দেখাতে এসেছ।"—বলেই লোকটি পুনরায় কুকুরটি পেটাতে চাবুক তুল্‌লো।

পঞ্চু এক হাতে সেই চাবুক ধরে ফেলে বল্‌লে,—মেরো না ভাই—অবোধ জীব। কুকুরটিকে বরং আমার কাছে বিক্রী করেই ফেল, আমি দাম দিচ্ছি।

লোকটি এক গাল হেসে বল্‌লে,—বেশ কথা। দশটি মোহরের এক কানা কড়ি কম হোলেও কুকুরটিকে আমি ছাড়ছি না।

পঞ্চু উত্তর দিল,—বেশ, তাতেই আমি রাজী। এই নেও তোমার মোহর—এই বলে দশটি মোহর সেই লোকটির হাতে গুঁজে দিয়ে বল্‌ল,—এইবার কুকুরটি আমায় দাও।

লোকটি এমন সস্তায় দশটি মোহর হাতে পেয়ে এক গাল হেসে কুকুরটি পঞ্চুর হাতে দিয়েই দে ছুট।

পঞ্চু সেই কুকুরটি সঙ্গে করে বাড়ী ফিরে এলো। সারা রাস্তায় কুকুরটি বারবার পঞ্চুর পায়ের উপর লুটিয়ে এবং জিভ দিয়ে আঙুল চেটে কেবলি কৃতজ্ঞতা জানালো।

কুকুরের মস্ত বড় কান দুটি দুপাশে ঝুলে পড়েছে কান ঢাকা সাহেবী টুপির মতো। সেজন্য পঞ্চু তার নাম রাখলো—"কান ঝোলা।"

বাড়ী পৌঁছতেই মা জিজ্ঞাসা করলেন,—পঞ্চু বাজারের এত সওদা পত্র কোথায় রেখে এলে? কেন সঙ্গে করে আননি?

পঞ্চু উত্তর দিল,—"মা, সঙ্গেই এনেছি।

মা বললেন,—কই, কিছুই তো দেখছি না?

পঞ্চু জবাব দিল—"মা, জিনিষপত্রের বদলে এই কানঝোলাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি" বলেই পঞ্চু পিছনের কুকুরটির দিকে ফিরে তাকালো। তারপর বললো,—কি সুন্দর বলতো? মোহর দিয়ে একে কিনে এনেছি মা।

মা রেগে বললেন,—নিজেদের মুখে দিতেই যাদের ভাত জোটে না তাদের আবার কুকুর

পোষার সখ। একেও তো দুটো খেতে দিতে হবে? আর জিনিষপত্র কই—তা-ই বল।

পঞ্চু উত্তর দিল—মা সব মোহরই তো ওতে খরচ হয়েছে, তাই জিনিষপত্র আর কেনা হয় নি।'

মা ভারি রেগে পঞ্চুকে অনেকক্ষণ গালমন্দ দিলেন, তারপর বললেন,—এক কড়ি রোজগারের মুরোদ নেই, তার হোল রাজা রাজড়ার সখ। ঘরে তো আজ এক ছটাক চালও নেই—কালকের উপায় কি? সামান্য কিছু খেয়ে দেয়ে মা ছেলের রাতটা কোন রকমে কাটলো। পঞ্চু নিজের খাবার থেকে অর্দ্ধেকটা কানঝোলাকে দিল।

পরদিন সকাল বেলা মা পুঁজির বাকি দশটি মোহর এনে পঞ্চুর হাতে দিয়ে বলল,---এই আমাদের শেষ সম্বল; বাজারে গিয়ে ফর্দ্দ দেখে জিনিষগুলি সব একে একে কিনে ফেলো। দেখো, কেউ না ঠকিয়ে নেয়, এক পয়সা অপব্যয় না হয় সাবধান।

পঞ্চু এই মোহর নিয়ে তাড়াতাড়ি গাঁয়ের হাটে এসে উপস্থিত হোল। সেখানে মেছো হাটার পাশেই অনেক লোক জড় হয়েছে। পঞ্চু উঁকি মেরে দেখতে গেল, দেখলো---একটা কালো বেড়ালের গলায় দড়ি বেধে সেটাকে ঝামার উপর দিয়ে হেঁচড়ে নিয়ে চলেছে একটা নির্দ্দয় ছোট ছেলে।

পঞ্চু বলল,---থামো খোকা, বেড়ালটিকে এমন কষ্ট কেন দিচ্ছ ভাই?

ছেলেটি উত্তর দিল,---বেড়ালটা আমার মাছ নিয়ে পালিয়েছে। বেটাকে এবার হাতে নাতে পেয়েছি---আচ্ছা রকম সাজা দিব। ঐ ডোবার জলে ডুবিয়ে তবে ছাড়বো।

পঞ্চু উত্তর দিল---না ভাই, এই বেচারা প্রাণীকে মেরে লাভ নেই---ছেড়ে দেও ভাই ওকে। দেখচো, ওর মুখ থেঁতলে রক্ত বেরুচ্ছে। বরং ওকে আমার কাছে বিক্রী করে ফেল, আমি ওকে পুষবো।

ছেলেটি ভারি সেয়ানা। সে জবাব দিল, দশটি মোহর না পেলে একে আমি ছাড়ছিনা কিন্তু।

পঞ্চু তাড়াতাড়ি দশটি মোহর ছেলেটীর হাতে গুজে দিয়ে বেড়ালটীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো।

মা জিজ্ঞাসা করলেন,---কি পঞ্চু, বাজারের সওদাপত্র কোথায় ফেলে এলে?

পঞ্চু উত্তর দিল,---কিছুই আনিনি মা। মা আশ্চর্য্য হয়ে বললেন,—বাজার থেকে কি তবে শুধু হাতে ফিরে এলি?

পঞ্চু উত্তর দিল,---শুধু হাতে নয় মা, এই বেড়ালটীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি এর নাম লেজফুলো।

মা বললেন,---পোড়া কপাল আমার একেও তো আবার পেট ভরাতে হবে, আর কি এনেছিস্ তাই বল।

পঞ্চু জবাব দিল,---মা, এর দরুন সব মোহর গুলিই গেল ফুরিয়ে---কি আর করি মা। বেড়ালটীকে না কিনে আনলে ওর যে প্রাণ যেত।

মা ভয়ানক রেগে বললেন,---বেরো আহাম্মুখ ছেলে, বাড়ী থেকে। দেখি, কোথায় তোর ভাত কাপড় জোটে।

পঞ্চু কানঝোলা আর লেজফুলোকে সঙ্গে করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো। *

(ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন

* রুষ দেশীয় উপকথা।

সিংহ কি হিংস্র ?

আফ্রিকার দক্ষিণে ট্রান্সভাল দেশে ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক নামে একটী বন আছে। সেই বনে নানা রকম জন্তু থাকে, তাদেরে মারা হয় না। তাদেরে শুধু শীকার করবার জন্য রাখা হয়েছে। যখন যার ইচ্ছা জন্তুদেরে গুলি করে মারতে পারেনা। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি নিয়ে তবে শীকার করা যায়।

গবর্ণমেণ্ট একজন বৃদ্ধ সৈন্যকে ঐ জঙ্গলের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছেন। তাঁর অধীনে আরও অনেক লোক আছে, তারা জঙ্গল পাহারা দেয় যেন কেহ বিনা অনুমতিতে কোন জন্তু না মারে।

সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটা সুন্দর রাস্তা তৈরী হয়েছে। সে রাস্তা দিয়ে মোটর যাতায়াত করে। যাঁহারা আফ্রিকার বন্য পশু ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে চান, তাঁরা এই রাস্তা দিয়ে যান। অবশ্য হিংস্র বন্য পশুদের নিকট দিয়ে গেলে বিপদের আশঙ্কা আছে। যিনি এই বনের তত্ত্বাবধায়ক তিনি খুব দক্ষ শীকারী। আর জন্তুদেরে খুব ভালবাসেন। ঐ জঙ্গলে অনেক সিংহ আছে।

তত্ত্বাবধায়ক বলেন যে লোকে মনে করে সিংহ ভয়ানক হিংস্র কিন্তু তা নয়। সিংহ বড় অলস, আর মোটেই হিংস্র নয়। তার পেটটি ভরা থাকলে সে কাহারও অনিষ্ট করে না। তবে রাত্রিকালে যদি অনাহারে কষ্ট পায়, দিনের বেলায় যদি কেহ তাহাকে গুলি করিয়া আহত করে কিম্বা তাকে তাড়াতে তাড়াতে কোণঠাসা করে কিম্বা তার বাচ্চাদের অনিষ্ট করতে আসে, তখনই সিংহ ও সিংহী ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করে রেগে মানুষকে মেরে ফেলতে যায়। ঐ বনে সিংহেরা প্রচুর খাবার জিনিষ পায়, কাজেই তারা শান্ত হয়ে থাকে। সেই দেশবাসীরা নিরাপদে দিনে ও রাত্রে ঐ বনের মধ্য দিয়া যাতায়াত করে। বিশ বছরের মধ্যে কখনও শোনা যায় নাই যে, কোন সিংহ অকারণে কাহাকেও আক্রমণ করেছে।

দর্শকেরা যখন ঐ বনের মধ্য দিয়ে যান তখন তাদের একটা করে বন্দুক দেওয়া হয়। বন্দুক সঙ্গে থাকাতে বিপদের আশঙ্কাও আছে। কেন তা শোন। দর্শকেরা প্রায়ই দেখতে পান যে সিংহেরা রাস্তার ধারে বা মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে; কখন কখন মোটর কি জিনিষ দেখবার জন্য খুব কাছে আসে। তারা তখন মানুষের মাংস খাবার ইচ্ছা মনে নিয়ে আসে না, শুধু কৌতুহলের বশবর্ত্তী হয়ে আসে। এত নিকটে সিংহকে দেখে ভয়ে কেহ গুলি করে, আর সে গুলিতে সিংহ যদি শুধু আহত হয়, তবে তখন সে ভয়ানক হিংস্র হয়ে উঠে, আর তখনই সকলের প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা হয়। বিশেষতঃ ঐ বনের রক্ষকদের ভয় হয়, কারণ তাহারা সর্ব্বদা ঐ স্থান দিয়ে যাতায়াত করে।

অনেকেই সিংহের হিংস্র স্বভাবের গল্প শুনেছেন, কাজেই তাকে কাছে দেখলেই গুলি করার জন্য বন্দুকটা উঠিয়ে ধরেন। সিংহ যদি মরে না যায়, শুধু আহত হয়, তার শুশ্রূষার জন্য ত কেহ

তাহাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় না। সে আহত হয়ে নিজের খাবার খুঁজতে বনে ঘুরে বেড়াতে পারে না, কাজেই অনাহারে কষ্ট পায়। তখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে আর মানুষকে একটুও ভয় করে না। মানুষকে পথে দেখলেই তাকে আক্রমণ করে।

আর একটা কথা দর্শকদের মনে রাখা উচিত। সিংহীর সামনে তার বাচ্চাদের যদি এতটুও অনিষ্ট করবার চেষ্টা করা যায়, তবে সিংহী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে, অনিষ্টকারীর প্রাণ নেয়। এমন কি কেহ যদি শুধু সিংহী ও তার বাচ্চাদের ফটো তোলবার জন্য ক্যামেরাটা একটু কাছে নিয়ে আসে, তখন সে মনে করে, যে লোকটি তার বাচ্চাকে মেরে ফেলতে এসেছে। সে ভীষণ চিৎকার করতে থাকে, আর শত্রুকে আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। বাচ্চারা যত ছোট হয়, আর অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকে, সিংহী তাদের নিরাপদে রাখবার জন্য তত বেশী ব্যস্ত ও ভীত হয়, ও বেশী হিংস্র হয়ে উঠে। যদি কখনও যেতে যেতে পথে সিংহী আর তার ছোট্ট বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা হয়, তখন নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত। তাহলে সিংহী প্রথমে একটা চিৎকার দিয়ে যখন দেখবে যে লোকটি আক্রমণ করতে আসছে না, তখন একবার এদিকে তাকিয়ে ও আর একবার তার বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে চলে যাবে

যতক্ষণ মানুষ মোটরে চলতে থাকে, ততক্ষণ সে বুঝতে পারেনা যে মোটরের মধ্যে মানুষ থাকতে পারে। যদি কেহ মোটরে যেতে যেতে পথের মাঝে দেখতে পায় যে, সিংহী তার ছোট ছোট বাচ্ছা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখন মোটরটি থামিয়ে ফেলতে হয়, না হলে আস্তে আস্তে পিছনে ফিরিয়ে নিতে হয়। আর আরোহীরা সকলেই যেন চুপ করে থাকে, দরকার হলে নিতান্ত পক্ষে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলবে। এরকম করলে তবে প্রথমে সিংহটা কিছুক্ষণ ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করতে পারে কিন্তু যখন দেখবে যে তার কোন অনিষ্ট করা হবে না, তখন বাচ্চাদের পিছন পিছন সে চলবে আর ফিরে দেখবে যে কেহ তার অনুসরণ করছে কিনা। যদি তখন কেহ মোটর থেকে গুলি করে তবেই মুস্কিল। সিংহী তখন ভীষণ রাগ করে আক্রমণ করতে আসবে।

সিংহেরা দর্শককে বিনা কারণে কখন আক্রমণ করে না। তারা যদি বোকামী করে, গুলি করে নিজেদের বিপদ নিজেরা ডেকে না আনে, তবে কোন ভয়ই নাই

ধাঁধা

১। একটা জন্তু, তার মাথা কাটলে মানুষ হয়ে যায়—বলত জন্তুটার নাম কি ?

২। একটা যন্ত্র তার মাথা কাটলেই সব অন্ধকার—বলত সে যন্ত্রটা কি ?

৩। একটা জানোয়ারের মাথা কাটলে হাত থেকে যায়—জানোয়ারের নামটা কি ?

আশ্বিন মাসের ধাঁধার উত্তর

১। মেঘ।

। (ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

(খ) রামমোহন রায়।

(গ) রামকৃষ্ণ পরম হংস।

নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাগণ ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন—

শ্রীমান সঞ্জীবকুমার মুখার্জ্জী, লক্ষ্ণৌ

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, বিষ্ণুপুর

শ্রীসনৎকুমার বন্দোপাধ্যায়, হরিনারায়ণপুর

শ্রীউমা রায় ও সুনীল রায়, পাটনা

কুমারী কমলা দাস, ডিব্রুগড়

শ্রীমতী শোভাময়ী বসু, বালিগঞ্জ

কুমারী মনিমালা চৌধুরী, দ্বারভাঙ্গা

শ্রীবিমলকুমার রক্ষিত, রোল্যাণ্ড রোড কলিকাতা।

দিলীপ, হেনা প্রতিপ, কলিকাতা

কুমারী ইলারাণী সেন, মুঙ্গের

রাণী, তোতা, উমা, গোরা, কাটিহার

বালকবালিকাগণ, অনাথ আশ্রম, ঢাকা

শ্রীদেবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রেঙ্গুন

শ্রীননীলাল দে, রংপুর

শ্রীমান সুকৃতিভূষণ ঘোষ

শ্রীমান সুবিনয় সেনগুপ্ত

কুমারী করুণালীলা বসু, কলিকাতা

শ্রীস্মৃতিকণা সেন, রেঙ্গুন

শ্রীমতী বীনাপাণি চৌধুরী, বেলগাঁ, ফরিদপুর

শ্রীমীরা চৌধুরী ও অশোক চৌধুরী, পাটনা

শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী দত্ত, রেঙ্গুন

শ্রীবারীন্দ্র দে, কেদার দে, রেণুকা দে, নির্ম্মলা দে নিলিমা দে, ওয়েষ্ট কমাষ্ট রেঙ্গুন।

শ্রীজগদিন্দ্রকুমার ভৌমিক।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মুকুলের গ্রাহকগ্রাহিকাগণের লেখার প্রতিযোগিতা

পুরস্কার ৫০৲ টাকা।

আগামী পূজার ছুটীর পর মুকুলের গ্রাহক ও গ্রাহিকা ছেলেমেয়েদের লেখার প্রতিযোগিতা হইবে। নিম্নলিখিত প্রত্যেক বিভাগে নির্দ্দিষ্ট পুরস্কারগুলি দেওয়া হইবে।

১। গল্প—সর্ব্বোৎকৃষ্ট গল্পের জন্য প্রথম পুরস্কার পাঁচ টাকা। আরো উৎকৃষ্ট পাঁচটী গল্পের জন্য এক একটাকা মূল্যের কোন দ্রব্য দেওয়া হইবে।

২। কবিতা—প্রথম পুরস্কার পাঁচ টাকা। পরবর্ত্তী পাঁচটী কবিতার জন্য এক একটাকা মূল্যের কোনপ্রকার দ্রব্য দেওয়া হইবে।

৩। ছড়া—প্রথম পুরস্কার পাঁচ টাকা। পরবর্ত্তী পাঁচটী ছড়ার জন্য এক একটাকার মূল্যের দ্রব্যাদি পুরস্কার দেওয়া হইবে।

৪। ভ্রমণ বৃত্তান্ত—সহর, গ্রাম, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি কোন স্থানের বর্ণনা, কিম্বা ভ্রমণবৃত্তান্তের জন্য প্রথম পুরস্কার পাঁচ টাকা। পরবর্ত্তী পাঁচটী রচনার জন্য এক একটাকা মূল্যের দ্রব্যাদি পুরস্কার দেওয়া হইবে।

৫। ধাঁধাঁ—সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুইটী ধাঁধার জন্য প্রথম পুরস্কার পাঁচ টাকা। আরো পাঁচটী উৎকৃষ্ট ধাঁধাঁর জন্য এক একটাকা মূল্যের দ্রব্যাদি দেওয়া যাইবে।

প্রতিযোগিতার নিয়ম।

১। মুকুলের গ্রাহক ও গ্রাহিকা ভিন্ন অন্য কাহারও লেখা প্রতিযোগিতার জন্য গৃহীত হইবে না। প্রত্যেক লেখায় গ্রাহক গ্রাহিকার নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বরটী দিতে হইবে, নতুবা লেখা প্রতিযোগিতায় লওয়া হইবে না।

২। আগামী কার্ত্তিক মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে লেখাগুলি মুকুল কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৩। গল্প ও ভ্রমণবৃত্তান্ত মুকুলের দুই পৃষ্ঠার, কবিতা ও ধাঁধাঁ মুকুলের এক পৃষ্ঠার বেশী না হয়।

৪। কোন পুস্তক হইতে গৃহীত গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি পুরস্কার যোগ্য বিবেচিত হইবে না।

৫। পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখাগুলি ক্রমশঃ মুকুলে প্রকাশিত হইবে। অপর লেখাগুলি ফেরত দেওয়ার ভার আমরা লইতে পারিব না।

৬। কোন বিভাগের লেখাগুলি পুরস্কার যোগ্য বিবেচিত না হইলে সেই বিভাগে পুরস্কার দেওয়া বন্ধ থাকিবে।

৭। একজনে দুই কিম্বা ততোধিক বিভাগের জন্য লেখা পাঠাইতে পারেন, কিন্তু একটীর বেশী পুরস্কার পাইবেন না। মুকুলের কর্ত্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই শেষ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

৮। মুকুলের নূতন পুরাতন সকল গ্রাহক গ্রাহিকা প্রতিযোগিতায় লেখা পাঠাইতে পারেন। আগামী ১৫ই কার্ত্তিকের মধ্যে যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাহাদের লেখাও প্রতিযোগিতায় গৃহীত হইবে।

মুকুল কার্য্যাধ্যক্ষ—২৯৪ নং দর্গা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা।

মুকুল

—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭—

বালকবালিকাদের সচিত্র মাসিকপত্র

শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী বি-এ, কর্ত্তৃক

সম্পাদিত

মুকুলের লেখক-লেখিকাগণ

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, শ্রীযুক্ত প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু, রায় বাহাদুর জলধর সেন, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডাঃ বনোয়ারীলাল চৌধুরী প্রমুখ।

— বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র—

—ঠিকানা—

২৯৪নং দর্গা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা

বিষয়-সূচী

অগ্রহায়ণ—১৩৩৭

মুকুলের নিয়মাবলী

১। মুকুল বাংলা মাসের ৭ই তারিখে বাহির হয়। ১৫ই তারিখের মধ্যে কোন গ্রাহক মুকুল না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খবর লইয়া কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র লিখিবেন।

২। মুকুলের বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। ভি-পিতে দুই টাকা চারি আনা। ষাণ্মাসিক এক টাকা চারি আনা। প্রতি সংখ্যা তিন আনা। বৎসরের মধ্যে যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু বৈশাখ মাস হইতেই কাগজ লইতে হয়।

৩। মুকুলের গ্রাহক গ্রাহিকা ছেলে-মেয়েদের লেখা মুকুলে প্রকাশিত হয়। লেখা মনোনীত না হইলে তাহা ফেরত দেওয়ার জন্য ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। প্রেরিত ধাঁধার সঙ্গে উত্তর লিখিয়া না দিলে তাহা প্রকাশিত হয় না।

৪। মুকুলের নমুনার জন্য এক আনার ডাক ষ্ট্যাম্প পাঠাইতে হয়।

টাকাকড়ি চিঠি পত্র নীচের ঠিকানায় মুকুল আফিসে পাঠাইতে হইবে।

মুকুল কার্য্যাধ্যক্ষ—২৯৪নং দর্গা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা

ফটোগ্রাফির সাহায্যে জলমধ্যস্থ জান্তব ও উদ্ভিজ্জ জীবনের বহুরহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমরা সমুদ্রগর্ভের অনন্ত বর্ণ-বৈভবের শতাংশের একাংশও উপভোগ করিতে পারি নাই। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়া এস, জার প্রিচার্ড নামক এক দুঃসাহসী আমেরিকান চিত্রকর সকল বাধাবিঘ্ন অবহেলা করিয়া বিশ হাত জলের নীচে বসিয়া একপ্রস্থ চিত্র অঙ্কন করিয়া সেগুলি স্থলজগতের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

তিনি টাহিটি দ্বীপমালার সন্নিকটস্থ প্রবাল লাগুনগুলির নিকটে একস্থানে ডুবুরীর-বেশে জলগর্ভে বসিয়া এই সকল চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহার "ক্যানভাস" বিশেষ করিয়া জল-সওয়া করিয়া তুলি ও রং সহ তাঁহার নিকট নামাইয়া দেওয়া হয়। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রমালা জলজগতের জান্তব ও উদ্ভিজ্জ জীবনের অদ্ভুতত্বের জীবন্ত প্রতিলিপি। ক্যামেরা যেন সে চিত্রের নিকট প্রাণহীন ও সৌন্দর্য্যরসহীন।

১৩০২ সনে প্রবর্ত্তিত

“ছোট প্রাণে আমাদের দাও ভালভাসা,
ছোট ছোট মুখে দাও স্বরগের ভাষা।”

৩য় বর্ষ] (নবপর্য্যায়) অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ [৮ম সংখ্যা

মহাকাল

আমি কাল! মহাকাল! অনাদি অব্যয়;
আমাতেই আদি অন্ত, সৃষ্টি স্থিতি লয়।
আমি ধরি ভীমরূপ, জগত নাশিতে
সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, মৃত্যুরে শাসিতে।
প্রাণ মাঝে প্রাণ আমি, কর্ম্মেতে বিহরি
ব্রহ্মাণ্ড পালনে আমি, মধুরূপে ক্ষরি।
রুদ্রমুখ ভয় আমি, অভয় সুন্দর
বরাভয় রূপে চরি বিশ্ব চরাচর।

দণ্ডে পলে করে জীব আমারি প্রমাণ
যুগ পরে যুগ হয় আমাতে প্রয়াণ।
দিন মাস ঋতু চক্র মোর বুকে ঘোরে
জন্ম মৃত্যু, হাসি কান্না, সুখ দুঃখ ডোরে।
অনাদি অক্ষয় আমি, অনন্ত অব্যয়
নাহি জরা মৃত্যু মোর, শোক তাপ ক্ষয়।

শ্রীরমলা দেবী

শ্যামদেশের কথা

শ্যাম এসিয়ার মধ্যে পূর্ব্ব-উপদ্বীপের অন্তর্গত একটী বিস্তীর্ণ নদীমাতৃক দেশ। এখানে অনেক নদ-নদী আছে। তন্মধ্যে মেনাম, সেবাং, মেকৃলাঙ্গ, পিতৃয়ু ও শান্তিবন প্রধান। পাহাড়-পর্ব্বত যাহা আছে তাহা খুব উচ্চ নহে,ও উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত। জল-বায়ু অনেকটা আমাদের দেশের মত। বর্ষায় সমস্ত দেশ জলপ্লাবিত হইয়া যায় ও জমিতে প্রচুর পলি পড়ে। কাজেই ধান্য, ইক্ষু, তুলা, তামাক, গোলমরিচ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। অরণ্যজাত দ্রব্য, যথা শ্বেত ও রক্তচন্দন, বাহাত্বরী কাষ্ঠ, গঁদ প্রভৃতি পাওয়া যায়। শ্যামবাসীরা আপনাদিগকে থৈ জাতি বলিয়া থাকে। থৈ শব্দের অর্থ স্বাধীন।

বর্ত্তমান রাজধানী বাঙ্কক সহর মেনাম নদীর তীরে অবস্থিত। সহরের মধ্যে অনেক খাল আছে। চীনাদের মত বহুলোক পুরুষানুক্রমে নৌকায় বসে করে। লোকে সহরের এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাইবার জন্য অনেক সময় নৌকায় চড়িয়া যাতায়াত করে। হাট-বাজারও নৌকায় বসে। হাট বা বাজারের সময় অনেক গুলি নৌকা পাশাপাশি ভাবে লাগিয়া থাকে। ক্রেতারা স্বচ্ছন্দে এক নৌকা হইতে অপর নৌকায় গিয়া পছন্দমত জিনিস ক্রয় করে। নদী এখানে প্রায় আধ মাইল বিস্তৃত। ইটালীর ভিনিস সহরের অবস্থা অনেকটা এইরূপ, সুতরাং অনেকে ইহাকে প্রাচ্যের ভিনিস নগরী বলেন।

বাঙ্ককে যথেষ্ট নদী ও খাল আছে বলিয়া এখানে রাস্তা ঘাট আদৌ নাই ইহা যেন কেহ মনে না করেন। সেখানে আমাদের দেশের বড় বড় সহরের মত রাস্তা আছে ও তাহাতে ট্রাম, বাস, রিক্স প্রভৃতি চলাচল করিতেছে। তবে প্রাচীনত্বের নিদর্শণ স্বরূপ গরুর গাড়ীরও অভাব সে দেশে নাই। রাস্তার তুইপার্শ্বে ছোট ছোট কাষ্ঠ নির্ম্মিত বহু ঘর আছে। এই গুলি বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন।

সহরের প্রায় অর্দ্ধেক লোক চীনা। তাহারাই এখানকার প্রধান শিল্পজীবি। শ্রমিকের কার্য্যে তাহারাই অগ্রণী। রাস্তা ঝাঁট দেওয়া হইতে দোকানদারী করা পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই চীনারা করিয়া থাকে। তাহারা বরফ, আইসক্রীম, সোডা, ভাত, তরকারী প্রভৃতি রাস্তায় বা বাজারে ফেরী করিয়া বেড়ায়। পথে বাহির হইলেই নীল রঙের পোষাকপরিহিত চীনা মজুর দেখিতে পাওয়া যায়। শ্যামের অধিবাসীরা বেশ শান্তিপ্রিয় ও ও পরিশ্রমী। কৃষিই তাহাদিগের প্রধান উপজীবিকা। তাহারা পল্লীগ্রামে সুখে সচ্ছন্দে বাস করে।

শ্যামে এখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত। এখানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আনুমানিক ৫৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের তুই জন ব্রাহ্মণ কুমার শ্যামরাজ্য স্থাপন করেন। শ্যামবাসীরা বলে যে অরণারত বা অরুণারথ তাহাদিগের প্রথম রাজা। প্রাচীন রাজধানী যুধিয়া বা অযুধিয়া (অযোধ্যা ?) নগরী বাঙ্কক হইতে ৫৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানেও এবং দেশের নানাস্থানে বহু প্রাচীন শিবমন্দির

বৃহত্তর ভারতের মন্দির

দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমান হয় যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এখন এখানে বহু বৌদ্ধ শ্রমণ ও সন্ন্যাসীর বাস। তাঁহারা হলদে পোষাক পরিয়া তালবৃন্ত ও লৌহ পাত্র হস্তে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। পাত্রপূর্ণ হইলে আশ্রমে ফিরিয়া যান। সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধ আচার-ব্যবহার পালন করেন ও ব্রাহ্মণদের মত নানাপ্রকার দৈব কার্য্যও করিয়া থাকেন। দেশের সকল লোকেই অন্ততঃ কিছু কালের জন্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, ব্রহ্মদেশের মত তাঁহারাই তথাকার লোক—শিক্ষক। বালকেরা তাঁহাদেরই নিকট সামান্য রকম লেখা পড়া ও ধর্ম্মকর্ম্মাদি পালন করিতে শিখে।

কথিত আছে রাজা অরুণারথই শ্যামে প্রথম বর্ণমালা প্রচলন করেন। এখানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ

ভেদে অনেকগুলি স্বর ও ৪৩টি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে কম্বোজের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া শ্যাম স্বাধীন হয়। তাহারই স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ শ্যামবাসীরা নিজেদের ভাষাকেও থে ভাষা বলিয়া থাকে।

শ্যামে নানাপ্রকার বীরত্বকাহিনীপূর্ণ হিতোপদেশক গল্প প্রচলিত আছে। তথাকার প্রচলিত অনেক গল্প রামায়ণ ও মহাভারত হইতে গৃহীত। পালি ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদি হইতেও অনেক গল্প লওয়া হইয়াছে।

পল্লীগ্রামের ছেলেরা লিখিবার জন্য কেবল শ্লেট ব্যবহার করে। কাগজের ব্যবহার কম। ছাত্রেরা গুরুর নিকট আসন করিয়া বসিয়া পাঠ গ্রহণ করে। আজকাল ব্যাঙ্কক সহরে নব্যধরণের স্কুল স্থাপিত হইয়াছে ও তাহাতে ইউরোপীয় শিক্ষকগণ ইংরাজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা দিয়া থাকেন।

শ্যামে রাজার খুব সম্মান। তাঁহাকে ইহারা দেবতার চক্ষে দেখিয়া থাকে। বহুপূর্ব্বে লোকে রাজদর্শন পর্য্যন্ত করিতে পারিত না। রাজা রাস্তায় বাহির হইলে লোকে মাথা নীচু করিয়া ধূলার উপর শুইয়া পড়িত। আজকাল এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এখন রাজাকে দেখিলে তাহারা মাথা নত করিয়া অভিবাদন করে, রাণী কিন্তু এখনও পর্দ্দানসীন ভাবেই থাকেন, কখনও বাহির হইবার আবশ্যক হইলে ঘেরাটোপ দেওয়া পাল্কীতে চড়িয়া বেড়ান। বুদ্ধদেবের জন্ম ও মৃত্যুর দিনে অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমায় ও কৃষিপর্ব্বে শ্যামে খুব আমোদ ও উৎসব হয়। সেইসময় রাজা ও তাঁহার মন্ত্রীগণ উৎসবে যোগদান করেন। কৃষিপর্ব্বের সময় প্রধান মন্ত্রী হল চালনা করেন ও রাজকুমারীগণ বীজ বপন করেন। লোকে সেই বীজ ২।১টি কুড়াইয়া লইয়া নিজের বীজের সহিত মিশাইয়া লয়।

তথায় অনেক লোকে শ্বেত হস্তীর পূজা করিয়া থাকে। জাতীয় পতাকায় পর্য্যন্ত শ্বেত হস্তী অঙ্কিত আছে। ২।৪টি শ্বেত হস্তী এখনও সে দেশের বনেজঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে তাহাদিগকে শ্বেতহস্তী বলে কিন্তু সেগুলি দেখিতে আদৌ শ্বেতবর্ণের নহে, অনেকটা ধূসর বর্ণের। সাধারণ কাল হস্তীও সেখানে পাওয়া যায় ও আমাদের দেশের মত খেদা নির্ম্মাণ করিয়া লোকে বন হইতে আবশ্যক মত হস্তী ধরিয়া আনে। যাতায়াতের জন্য হস্তীর আবশ্যক হয়, তাহা ছাড়া ব্রহ্ম দেশের মত সেখানেও হাতীতে বড় বড় গাছ, বন জঙ্গল ও পাহাড় হইতে টানিয়া আনে।

শ্যামের অধিবাসীরা দেখিতে অনেকটা ব্রহ্মবাসীদের মত। আকারে চীনাদের অপেক্ষা ছোট। ইহাদিগকে দেখিয়া মঙ্গোলীয় জাতি বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশের সাঁওতাল, কোল ভীলদের মত এখানেও বন্য জাতি আছে। ইহাদিগের আচার ব্যবহার অনার্য্যদিগের মত এবং ভাষাও স্বতন্ত্র।

শ্যামের ছোট ছোট হলদে রঙের শিশুগুলি দেখিতে বড় সুন্দর। তাহাদের গায়ের রঙ্ হলদে নহে। মশা ও মাছির উৎপাত হইতে শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক সময় মাতারা শিশুকে হলুদমিশ্রিত একপ্রকার প্রলেপ মাখাইয়া দেন। সেখানে ঘরে ঘরে দোলনা আছে। শিশুগুলি দোলনায় শুইয়া থাকে। কাঁদিলে মা আদর করিয়া দোলনা নড়াইয়া দেন ও শিশু ঢুলিতে ঢুলিতে ঘুমাইয়া পড়ে।

শিশুরা সেদেশে হাঁটিবার সঙ্গে সঙ্গেই সাঁতার কাটিতে শিখে। কথাটা শুনিয়া অনেকেরই

আশ্চর্য্যবোধ হইবে। ছোট ছোট শিশুর গলায় কর্ক বা শোলা বাঁধিয়া তাহাকে জলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। শিশু জলে ভাসে ও হাত-পা নাড়িয়া সাঁতার কাটিতে শিখে। জল দেখিয়া ছেলেরা আদৌ ভয় করে না। তাহারা প্রাতে উঠিয়াই বাটীর নিকটবর্ত্তী কোনও নদী বা খালে কিছুক্ষণ স্ফুর্ত্তির সহিত স্নান ও সাঁতার কাটিয়া আসে। স্নানের পর আহার করে।

ছেলেরা ছোট ছোট কাপড় মালকোচা দিয়া পরে। উহা দেখিতে অনেকটা হাফপ্যাণ্ট পরার মত হয়। তবে পল্লীগ্রামে ও সাধারণ গৃহস্থঘরের ছেলেরা ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত কাপড় খুব কমই পরে। মেয়েরা অল্প বয়স হইতেই কাপড় পরিতে আরম্ভ করে ও বড় হইলে জ্যাকেট ও চাদর ব্যবহার করে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়ের মাথায় টিকির মত চুলের গুচ্ছ থাকে। ১০।১১ বৎসর বয়সে আমাদের দেশের উপনয়ন সংস্কারের মত এই চুলের গুচ্ছ মুণ্ডন করা হয়। এই উপলক্ষে সকলেই সাধ্যমত ধুমধাম করে। গৃহের মধ্যে এক উচ্চ মঞ্চ বা বেদীর উপর, যে বালক বা বালিকার মস্তক মুণ্ডন করা হইবে তাহাকে বসান হয়। পুরোহিত ও সন্ন্যাসীগণ উচ্চ আসনে বসিয়া থাকেন ও নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধু-বান্ধবগণ মেঝের উপর সপে বসেন। সকলে আসন গ্রহণ করিলে বালক বা বালিকাটী প্রথমে পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে দাঁড়ায়। তখন সন্ন্যাসীরা মন্ত্র আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ পরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রধান কোনও ব্যক্তি এক-এর তিন অংশ চুল মুণ্ডন করিয়া দেন। বাকী দুই-এর তিন অংশ চুলের গুচ্ছ বাটীর বয়োবৃদ্ধ দুই জনে মুণ্ডন করিয়া দেন। তাহারপর ঐ মুণ্ডিত মস্তকে পুরোহিত জলধারা দিয়া বালক বা বালিকাকে স্নান করান। এইরূপে উৎসব শেষ হয়, কিন্তু ২।৩ দিন ধরিয়া নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ, ভোজ ও উৎসব চলিতে থাকে। মস্তক মুণ্ডন উৎসব হইয়া গেলে বালকেরা আমাদের মত চুল রাখে ও ছোট ছোট করিয়া ছাঁটে।

ছেলেরা কাদা লইয়া খেলা করিতে বড় ভালবাসে। পরস্পরের প্রতি কাদা ছুঁড়িয়া মারে ও পরে নদীতে গিয়া সাঁতার কাটে। উচ্চস্থান হইতে জলে লাফাইয়া পড়ে। বড় বড় গাছে—এমন কি নারিকেল গাছে পর্য্যন্ত—অবলীলাক্রমে চড়িতে পারে। প্রায় সকলেই অল্প স্বল্প রাঁধিতে পারে। আমাদের মত মাছ, ভাত, তরিতরকারী প্রভৃতি আহার করে। ছেলে-বুড়া সকলেই তামাক খায়। বালকেরা একটু বড় হইলে ধান্য বা ইক্ষু ক্ষেত্রে কাজ করে। গরু বা মহিষের পৃষ্ঠে চড়িয়া গৃহপালিত পশু চরাইয়া বেড়ায়। মেয়েরা চাউল ছাঁটা, রন্ধন করা, পিষ্ঠক প্রস্তুত করা, গৃহপালিত পশুপক্ষীর রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রভৃতি নানাপ্রকার গৃহকার্য্য শিক্ষা করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শ্যামে প্রচুর বারিপাত হয়। যখন কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকে ও বিদ্যুৎ চমকায় তখন বালক বালিকারা বলাবলি করে যে আকাশ-দেবতা ও তাঁহার স্ত্রীতে ঝগড়া লাগিয়া গিয়াছে। সেইজন্য রাগে তাঁহারা হুড়মুড় করিয়া শব্দ করিতেছেন। আবার বৃষ্টিপাত হইলে তাহারা বলে যে স্বর্গে আকাশ কন্যা ও পরীরা স্নান করিতেছেন। আর সেই জলধারায় ধরা অভিষিক্ত হইতেছে।

শ্রীভীমাপদ ঘোষ, এম-এ,

ছোটা

ছোট্ট একটি ছেলে। যেমন দেখতে তেমনি তার বুদ্ধি! গোল গোল চোক দুটি সর্ব্বদাই চারদিকে ঘুরছে, বড় চঞ্চল বড় চপল। এক জায়গায় একটুখানি চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই তার মা তাকে ছোটা বলে ডাকে। তার মা একজন ডাক্তারের কাছে কাজ করে। এটি একটি হাঁসপাতালেরই মত। তাদের বাড়ীতে এমন আর কেউ নেই যে তার কাছে ছোটাকে রেখে কাজে আসে। কাজেই ছেলেকে সঙ্গে করেই আনতে হয়।

কিন্তু এখানে এসেই ত আর ছোটার ছোটা স্বভাব বদলে গেল না। মেয়েদের দিকে তার একটুও ভাল লাগে না। সকল সময়েই বাইরে বেরিয়ে এসে পুরুষদের কাছে থাকে। চারিদিকে কেবলই ঘুরে বেড়ায়। নূতন কোন লোক এলেই সেই দিনই তার সঙ্গে ছোটার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে যায়। চাকরাণীর ছেলে হ'লেও সব মায়ের কাছেই ত তার ছেলে অতি আদরের। সব মা-ই আপন ছেলেকে ভাল কাপড়ে পরিষ্কার সুন্দর রাখেন। তার উপর ছোটা তার মায়ের এক মাত্র ছেলে। তার মা বড় দুঃখী। তার বাবা নেই। সমস্ত দিন খেটে খেটে সন্ধ্যায় ঘরে এসে সে তার এই চঞ্চল ছেলেটিকে কোলে বুকে নিয়ে কত আদর করে, কত চুমা খায়। হাঁসপাতালে তার দুষ্টামির জন্য যেদিন বকৃতে হয়, সে দিন ছোটাকে বুকে ধরে তার মা কতই না কাঁদে। ছোটা জিজ্ঞাসা করে—"হাঁ মা, তোর চোখে জল কেন?"

মা আর তার কি উত্তর দেবে! শুধুই কাপড়ে চোখ মুছে হাসবার চেষ্টা করে; চুমার উপর চুমা দিয়ে যতই ছোটকে বোঝাতে চায় যে সে কাঁদছিল না, ততই দুচোখ ছেপে জল ছুটে আসে। ছোটাও কেঁদে ফেলে, বলে "কাঁদিস না মা, কাঁদিস না।" তার ছোট ছোট হাত দুটি দিয়ে মায়ের চোখের জল মোছাবার চেষ্টা করে।

খাবারের জন্য যা লাগে তা ছাড়া আর সবই ছোটার জামা কাপড় কিন্‌তেই তার মায়ের মাইনের টাকা সব ফুরিয়ে যায়। একবার মাসের শেষে ছোটা একটা জামার বায়না ধরে ছিল; তা' দিতে না পেরে তার মা কেঁদে ফেল্লে। ছোটাকে বুকে নিয়ে বল্লে "আজ তোর বাপ বেঁচে থাকলে কত জামা পেতিস রে।"

ছোটা জামার কথা ভুলে গিয়ে বল্লে "আমার বাবা কোথা মা?"

তার মা চোখ মুছে উপরের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বল্‌লে, "স্বর্গে।"

"আমিও যাব মা সেখানে।"

"দুর, ও কথা বল্‌তে নাই।"

সেই হ'তে ছোটা কখনও কোন জিনিস তার মার কাছে চায় নি। আট নয় বৎসর বয়স হ'লে কি হয়; বুদ্ধি তার বয়সের চেয়ে খুব বেশি।

সারারাত ছোটা এমনি মায়ের কোলে বুকেই থাকে। দিনে হাসপাতালে ছোটাছুটি করে, সকলের সঙ্গে মেসে, কথা বলে। তার মধুর কথায়, ব্যবহারে সকলেই তাকে খুব ভালবাসে।

সে যে মেথরের ছেলে তা কেউ বুঝতেই পারে না। কেউ কেউ আদর করে কমলা, বিস্কুট এনে দেয়।

যখন তার বয়সী কোন ছেলে আসে তখন সে তাকে এক মুহূর্ত্তেই আপন করে নেয়।

আজ দুটি ছেলে এসেছে। বেশ ছেলে দুটি। তারা দু ভাই। বাবার সঙ্গে এসেছে। বিশেষ কিছু অসুখ নয় বলে তারা চুপ করে থাকে না। আসবার সময়ই ছোটা তাদের দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু বাবা কাছে আছে বলে যেতে একটু কেমন কেমন করছিল। দু' ভাই যখন বের হয়ে এল তখনই ছোটা ছুটে এসে দু' হাতে দু'জনের হাত ধরে বল্লে—"কি ভাই তোরা বুঝি আজ এই প্রথম এলি ?"

হাঁ ভাই তুই বুঝি এখানে রোজ আসিস্ ?"

"না, আমার ত অসুখ করেনি। আমার মা যে এইখানেই থাকে।"

এইভাবে একটু মধ্যেই তিনজনের আলাপ জমে উঠলো। দিন দিন তাদের বন্ধুত্ব বাড়তে লাগলো। ছেলে দুটি রোজই সঙ্গে কিছু না কিছু খাবার আনে। তিনজনেই ভাগ করে খায়। একদিন বিস্কুট আর কমলা তিনজনে বসে খেতে আরম্ভ করেছে এমন সময় তাদের বাবা হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ছোটা যেন কেমন হ'য়ে গেল ; তার হাত আর মুখে ওঠে না৷৷ বাবা ছোটার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলে যে সে এখানকারই 'আয়া'র ছেলে। শুনেই রেগে নিজের ছেলেদের বললেন "কে তোদের এমন করে খেতে বল্‌লে !"

ছোট ছেলে উত্তর দিলে "কেন বাবা, আমরা ত রোজই এমনি করে খাই। আবার ও যেদিন খাবার পায় সেদিন তাও সকলে খাই। তাতে কি বাবা।"

বাবা বল্‌লেন "ওযে মেথরের ছেলে।"

"কেন বাবা ও কি তবে ওর মার ছেলে নয় !"

"তুই ও সব বুঝবি না। ওর ছোঁয়া খেলে জাত যাবে !"

ছোট ছেলের স্বভাব, একবার যা ধরে তার মীমাংসা না হ'লে ছাড়ে না, বল্‌লে "সে আবার কি বাবা। আমাদের জাত কোথায় আছে ? আর ও যদি আমাদের জাত নেয় আমরাও ওরটা নিয়ে নোবো।"

বড় ছেলে এ পর্য্যন্ত কোন উত্তর দেয় নাই। এখন বলিল "কেন বাবা, কাকা যে জুতোর দোকান করেন, তা বলে কি তাঁর ছোয়া খেলে জাত যায় ?"

বাবা মহা গোলে পড়িলেন। ছেলেদের যে কি করিয়া বুঝাইবেন তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। শেষে বলিলেন "তোরাত আর অত কথা বুঝবি না। তোর কাকা ত জাতে মুচি নয় ; কাজই করছে মাত্র। তাতে কি ? আর এরা জন্ম হতেই যে মেথর।"

বড় ছেলে বলিল "তাহলে বাবা, ওরা ভাল কাজ করলেও সেই মেথরই থাকবে, আর আমরা যত খারাপ কাজ করিই না সেই বামুনই থাকবো ?"

এবার তাদের বাবা তত সহজে উত্তর দিতে পারিলেন না।

ছোটা ইহার মধ্যে মার কাছে চলিয়া গিয়াছে। তাহার মা দেখিল ছেলের মুখ বড় মলিন। কিন্তু তখন তাহার সময় কোথায় যে কিছু জিজ্ঞাসা করে ? বাড়ী ফিরিয়া আসিলে ছোটা জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ মা, সেই ছেলেগুলির সঙ্গে আমিত

রোজই খাই। কিন্তু আজ তাদের বাবা দেখে ওদের এত ধমকে দিলেন কেন। আর বলছিলেন আমরা ছোটজাত। হাঁ মা জাত কি?"

তাহার মা এতক্ষণে সকল কথা বুঝিতে পারিয়া, তাহার মুখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল "ওঁরা সব বড় লোক কিনা, তাই গরীবদের নীচে রেখে দেন, আর বলেন ছোট জাত। টাকার কাছে জাত নাই বাবা। ভগবানের কাছে কি কোন জাত আছে। যে ভাল লোক তারাই তাঁর কাছে ভাল, তুমি ভাল হও বাবা তা'হলেই সব হবে।'

ছোটা মার গলা জড়াইয়া বলিল "আমি আজ হতে ভালো হবো মা।"

শ্রীকরালীকুমার কুণ্ডু

ছেলেবেলার খাবার

নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য শিশুদের কথা তোমাদিগকে শুনাইয়া লাভ নাই। তোমাদের মধ্যে যাহারা পড়িতে শিখিয়াছ, তাহাদের আহারের সম্বন্ধেই দু'চার কথা বলিতেছি।

তোমাদের বয়সে, দেহের বৃদ্ধি (যাহাকে লম্বায় "বাড়-বাড়ন্ত" হওয়া বলে) ও পুষ্টি (অর্থাৎ, দেহের সকল অংশের সমান ও ঠিক্-মত গ'ড়ে উঠা) এই দুইটিই হইল প্রধান লক্ষ্যস্থল। তাহার সঙ্গে, বিশেষ করিয়া, দাঁতের যথার্থ গঠন হওয়াও চাই। কাযেই, তোমাদের এমন জিনিষ খাওয়া উচিত, যাহার দ্বারা, দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি (এবং সেই সঙ্গে দাঁতের উন্নতি) ঠিক্ মত হইতে পারে। এখানে বলিয়া রাখি যে, অতি শৈশবে, গায়ে প্রচুর পরিমাণে চর্ব্বি থাকিলেও, যত বড় হওয়া যায়, "মোটা হওয়া" (বা গায়ে অযথা পরিমাণে চর্ব্বির বৃদ্ধি পাওয়া) তত অবাঞ্ছনীয় হইয়া পড়ে। "হাড়ে মাসে" হওয়াই সকলের উচিত,—মোটা হওয়াটা একটা রোগ বলিয়া জানিবে।

জীবজন্তু মাত্রেই পরিশ্রম করিবে—এবং পরিশ্রম-লব্ধ আহার্য্য খাইবে, এইটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। অলসভাবে বসিয়া খাইবার জন্য কোনও জন্তু সৃষ্ট হয় নাই। পরিশ্রম করিতে গেলে, হাড় ও মাংস (মাস্‌ল্ বা মাংসপেশী) খুব দৃঢ় ও পুষ্ট হওয়া চাই—চর্ব্বিবৃদ্ধি বরং নড়াচড়ার বাধা সৃষ্টি করে, তবু সাহায্য করে না। এই জন্য এমন খাবার খাওয়া উচিত যাহা খাইলে হাড় ও মাংস এবং দাঁত বেশ পুষ্টি লাভ করিতে পারে।

তোমাদের বয়সের পক্ষে, দুধের মত খাদ্য আর একটিও নাই। খাঁটি দুধ ও দুধের সার ননী, (ক্রীম, টপ্-মিল্ক বা নবনী)—শৈশবের পক্ষে অমৃত তুল্য। সকল রকম খাদ্য খাইয়া দিনে রাতে একসের দুধ খাওয়া সকল বালকেরই উচিত। চা পান করা উচিত নয়। তবে, পয়সায় না কুলাইলে, মধ্যে মধ্যে ছানা, ছাতু, এবং প্রত্যহ কিছু-কিছু অঙ্কুর বাহির হইয়াছে এমন কাঁচা ছোলা বা মুগের ডাল ভিজান গুড় দিয়া খাওয়া উচিত। ডিম (যথাসম্ভব কাঁচা বা হাফ্ বয়েল্ বা পোচ্) ও মাংস চলিতে পারে।

কিন্তু শৈশবে আমাদের পক্ষে রোজ ডিম বা মাংস খাওয়া উচিত নয়। ডাল খুব বেশী-বেশী খাইতে অভ্যাস করিবে। পাঁচ-মিশালী-ডাল ক্ষীরের মত ঘন করিয়া এমন রাঁধিতে হইবে যে, প্রত্যেক দানাটা গলিয়া যায় অথচ আস্ত থাকে—ছেলা বেলা থেকে এরকম ডাল খাওয়ার অভ্যাস করিবে। মাছ জুটিলে, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়া যায়।

তোমরা অনেকে শাক খাইতে শিখ না—অথচ শাকের মত উপকারী খাদ্য কমই আছে। শাক ভাজা ও তরকারী বা ঝোলে শাক ত খাইবেই; সেই সঙ্গে পালম শাক, বাঁধা কপির কচি পাতা, স্যালাড্ নামে শাক, কাঁচা পেঁয়াজ কলি, সেলারি নামক ঐ জাতীয় শাক, কাঁচা গাছ-ছোলা, কাচা মূলা, কাঁচা শশা, কাঁচা সর্ষের শাক, কাঁচা লঙ্কা (অল্প-স্বল্প), কাঁচা বিলাতি বেগুন—শৈশব হইতে প্রত্যহ ইহাদের একটা-না-একটা কাঁচা খাওয়ার অভ্যাস করিবে।

ধব্‌ধবে ময়দা না খাইয়া হাতে-ভাঙা লাল-আটার রুটি বা লুচি খাইবে। ধব্‌ধবে কলে-মাজা চাউলের ভাত না খাইয়া, ফেন্-সুদ্ধ আতপ চাউলের বা ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের ভাত খাইবে, ধব্‌ধবে কলের চিনি না খাইয়া গুড় খাইবে। লজেঞ্জ, কেক্, পাঁউরুটি, চোকোলাট ফেলিয়া ভাল সন্দেশ রসগোল্লা খাইবে, ঘরের তৈয়ারি হালুয়া বা মিষ্টান্ন খাইবে।

চাউল কড়াইএর মত শক্ত জিনিষ খুব চিবাইয়া খাইবে দাঁত ভাল থাকিবে। ইক্ষু দাঁতে ছাড়াইয়া খাইবে। সকল রকম সময়ের ফল খুব খাইবে—রক্ত পরিষ্কার রাখিতে ফলের মত উপকারী সামগ্রী কম। কতকগুলা বাসী ময়রার দোকানের খাবার না খাইয়া চীনাবাদাম, আখ-রোট, পেস্তা প্রভৃতি পাইলেই খাইবে। কাঁচা, ডাঁশা, গাছপাকা সকল ফলই তোমরা খাইতে ভালবাস—এবং নির্ব্বিবাদে তাহা খাইবে।

যে সংসারে দুধ প্রচুর নাই, সে সংসারে শিশুমানুষ হওয়া বিড়ম্বনা। শিশু বেশীর ভাগ সময় কোথায় থাকিবে?—মাঠে, উন্মুক্ত হাওয়ায় প্রচুর সূর্য্যকিরণের মাঝে। ছেলে মানুষ করিতে হইলে গোরুকেও ছেলের সঙ্গে সমান যত্নে লালন-পালন করিতে হয়। শিশুকে শৈশব হইতে আপনার আনন্দে আপনার ছন্দে গড়িয়া উঠিতে দিতে হয়। ধনীর সন্তান হইলেও ছেলেদিগকে কতকগুলা জামাজোড়া পরান ভুল!

দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, শুঁটি—শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সাহায্য করে। শাক কোষ্ঠ সাফ রাখে ও হাড় পুষ্টি করে। ফল রক্ত পরিষ্কার করে। কঠিন দ্রব্য চিবাইলে দাঁত ভাল থাকে—নিত্য নরম জিনিষ খাইলে, দাঁত সহজেই খারাপ হয়।

ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্

সান্ত্বনা

খোকনমণির অশ্রুজলে গো—
হাজার মাণিক মুক্তা ঝলে গো।
চোখের কোনে দোল্ খেয়ে,
গালের বুঝি কোল্ বেয়ে,
মিশায় বুকের পুষ্পদলে গো।

কয়েক ফোঁটা খরচ হোলো তাই—
খোকার তাতে দুঃখ কিছু নাই।
একটি শুধু চুম্বনে,
চোখের পাতা সবক্ষণে,
রইবে সরস সর্ব্বপলে গো।

শ্রীরথীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

উপহার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সামনে, পিছনে, ডানে, বাঁয়ে নিবিড় অন্ধকার। মাথার উপরে মেঘের ঘোর গর্জ্জন, বাতাসের শন্ শন্ শব্দ। তবু মাধুরী ঝড়ের বেগে ছুটেছে, দিক্ ঠিক্ কোরতেও পারছে না। হঠাৎ সে একটা গর্ত্তের মধ্যে পড়ে গেল, ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে এক ঝলক বিদ্যুতের আলোয় সে দেখতে পেল, সেটা একটা পুরানো ভাঙ্গা কূয়ো। তাদের বাড়ী থেকে অল্প দূরেই একটা কূয়োর জল শুকিয়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে ঘাস, খড়, কাঠ কুটো প্রভৃতি জঞ্জাল ফেলে সেটাকে বন্ধ করবার চেষ্টা হোচ্ছিল, এ সেই কূয়োটা। সে যেন একটা আশ্রয় পেলো। উত্তেজনায় ক্লান্তিতে, ভয়ে তার দেহ অবশ হোয়ে পড়ছিল। সে বাক্সটী কোলে কোরে সেই ভিজে খড় কাঠের স্তূপের উপরই বসে পড়ল। কূয়োর পাড়ে ২।৪ খানা তক্তা পড়েছিল, সেগুলো টান দিয়ে কূয়োর মুখটা প্রায় ঢেকে দিল। তার হাত পা ছড়ে দরদর ধারে রক্ত পড়ছিল, বৃষ্টির শীতল ধারায় সেগুলো ধুয়ে গেল, যন্ত্রণাও কমে গেল। তবু মনে তার শান্তি নেই। কেবলই ভাবছে, যদি ঐ চোরটা বেঁচে থাকে, অথবা তার দলের আর কোনো লোক ধারের কাছে লুকিয়ে থাকে, তবে তো তাকে আবার ধরে ফেল্‌বে। এখন তো দা খানাও কাছে নেই, আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই।

ঘণ্টাখানেকের উপর এই ভাবে সে বসে রইল। জোরে এক পশলা বৃষ্টি হোয়ে গেছে, এখন ঠাণ্ডা বাতাসে তার সর্ব্ব শরীর হিম হোয়ে যাচ্ছে, আর কতক্ষণ থাকলে হয়ত সে মরেই যাবে। হয়ত হলাপে মাকে নিয়ে এতক্ষণে ফিরেছে। মা হয়ত তার জন্যে কত কাঁদ্‌ছেন, হলাপে নিশ্চয় তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। যদি খুঁজে না পায়, তবে তো সারা রাতই এভাবে তাকে থাক্‌তেই হবে। ভোরের আলো না

হোলে, কখনই এখান থেকে বের হওয়া নিরাপদ হবে না।

মাধুরী কতক্ষণ যে এই ভাবে বসেছিল, সে নিজেও তা বুঝ্‌তে পারেনি। গাছে গাছে পাখীর কাকলি শোনা যাচ্ছে, জঙ্গলী মোরগ গুলো চীৎকার কোরে রাত্রি শেষ প্রহরের ঘণ্টা বাজাচ্ছে, কূয়োর মুখের ঢাকা তক্তাগুলির ফাঁক দিয়ে দিয়ে ভোরের আলো উঁকি মেরে মাধুরীকে আশ্বাস দিল, রাত ভোর হোয়েছে। মাধুরী ভাব্‌ছে এখনো উঠবে কিনা। ছোট হাত বাক্সটী আর কাগজের তাড়া গুলি শাড়ীর আঁচল দিয়ে কোমরের সঙ্গে এঁটে বেঁধেছে, হঠাৎ শুন্‌তে গেলো "মাধু, মাধু কোথাও আছিস্ না কি তুই ? তোর মা যে তোর জন্য কেঁদে কেঁদে মরে গেল "! মাধুরী কান পেতে ২।৩ বার ভাল কোরে শুন্‌লো। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এ মঙ্‌ বা-থানের গলা। সে সাহস কোরে আস্তে আস্তে এক একখানা তক্তা সরিয়ে মুখ বার কোরে ডাকলো "বা-থান শীগ্‌গীর আমায় তোল এসে"। বাথান্ একটা পাহাড়ের উপর থেকে ডাকছিল, মাধুরীর গলা পেয়ে চারদিকে খুঁজতে লাগল,কিন্তু কূয়োর দিকে তার নজর পড়ল না। মাধুরী আবার ডাক্‌ল, বাথান জিজ্ঞাসা কোরল "মাধু, তুই কোথায় ?" মাধুরী বলল, "এখানে নীচে, এই ভাঙ্গা কূয়োটার মধ্যে।" বাথান দৌড়ে নেমে এসে মাধুরীকে দুই হাতে টেনে তুল্‌ল। উঃ। মাধুরীর চেহারা কি ভীষণ হোয়েছে। মুখ ফ্যাকাসে, চোখ দুটো বসে গেছে, হাত পা হিম আর বিবর্ণ যেন কেউ তাকে সারা রাত্রি বরফে ডুবিয়ে রেখেছিল। মঙ্‌ বাথান্ তার নিজের গায়ের গরম এঞ্জি (বর্ম্মাদের কোট) খুলে সযত্নে মাধুরীর গায়ে পরিয়ে দিয়ে, তাকে ধরে ধরে বাড়ীতে নিয়ে এলো। সারা রাস্তা কারও মুখে কথা নেই। কেবল মাধুরী একটীবার জিজ্ঞাসা কোরলে "চোরটা মরেছে" ? বাথান বল্লে, "হ্যাঁ—তোর দায়ে রক্তের দাগ দেখেই আমরা বলেছিলুম নিশ্চয় মাধুরীই ওকে মেরে কোথাও লুকিয়ে আছে।" ঘরে পৌঁছে মায়ের হাতে সেই কাগজের তাড়াটী ও হাতবাক্সটী দিয়ে মাধুরী বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল। ঘর লোকে লোকারণ্য। পুলিশ তদন্ত হোচ্ছে, জেলে পাড়ার প্রায় সব বর্ম্মাই উপস্থিত, কেবল মঙ্‌হ্লা পে ছাড়া। সবাই মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছিল, কেমন কোরে চোর ঘরে ঢুক্‌লো, কেমন কোরে সে চোরটাকে মারল, কোথায় লুকালো ইত্যাদি। মাধুরীর কিন্তু গলার স্বর বন্ধ, সে যেন কিছুই বলিতে পারেনা কেবল ফ্যাল ফ্যাল্ কোরে চেয়ে থাকে।

একবার মাকে জিজ্ঞাসা করল "মা, কো-হ্লা পে (হ্লাপে দাদা) কই ?" মা বল্লেন "আহা তার মা মরে গেছে। সে মায়ের কবরের ব্যবস্থা কোরছে। আমাদের জন্যেই তো সে মাকে শেষ দেখা দেখতে পেলেনা। আমি যখন মা-খিমার ঘরে গেলুম, সে তখন জ্বরে বেঁহুস। আমি গায়ে হাত দিতেই বললে "কালাম্মা, (বাঙ্গালী বা ভারতবাসীর 'মা') আমার হ্লাপে কই ? আমি আর বাঁচবনা, তার কেউ রইল না এ সংসারে, তুমি তাকে দেখো একটু, তুমি দেশে গেলে তাকে সঙ্গে নিয়ে যোয়ো, সে যে তোমাকে বড় ভালবাসে, 'মা' বলে।" আমি তখন জেলে পাড়ায় খোঁজ করলুম, কেউ বাড়ী নেই যে হ্লাপে কে ডেকে পাঠাই। ঐ মুমূর্ষু রোগীকে ফেলে আমিই যাই কি কোরে ? জেলেরা সন্ধ্যের আগে কেউ ফিরলনা। বা খান্ যখন এলো,

তাকে বল্লুম কাউকে ডেকে নে; এখানে বন্দুক, আমি আর তুই যাই চল্; হ্লাপে কে পাঠিয়ে দিই। মা-খি মা কি ছাড়ে আমায়? আমার হাত ধরে বলে তুমি বোসো এখানে, আমাকে ছেড়ে যেওনা। চটার সময় জেলেরা সবাই এলো, আমি ২।৩ জনকে পাঠালুম ঘরে থাকবার জন্যে; হ্লাপে কে আর তোকে পাঠিয়ে দিতে বল্লুম। তারা যাবার একটু পরেই জেলেনী বুড়ীর প্রাণটুকু চলে গেল। সেও চোখ বুজেছে, হ্লাপেও ঘরে পা দিয়েছে।

হ্লাপে তোকে একা ঘরে রেখে এসেছে শুনেই আমিও একজনকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলুম। মনটা যেন কেমন করছিল, যেন কি একটা অমঙ্গল ঘটেছে, বুঝতে পারছিলাম। এসে দেখি বর্ম্মারা চেঁচামেচি কোরছে, লোহার সিন্দুক খোলা তার পাশেই ঘরের মেঝেতে মস্ত বড় সিঁদ! এতো বড় গর্ত্ত কি আর একদিনে কেটেছে? সবাই বল্ছে অল্পে অল্পে অনেক দিন ধরে কেটেছে, আমরা আগে টের পাইনি। চোরটা মরে পড়ে রয়েছিল, কাটা হাত খানা দূরে পড়ে আছে।

লোকটার কোমরেও একখানা দা ঝোলানো ছিল। পাশে তোর দা খানা রক্তমাখা পড়ে আছে দেখে বাবাম ধরে "নিশ্চয় মাধু চোরকে কেটে গয়নার বাক্স নিয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে। আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনি যে তোকে আজ জীবন্ত দেখতে পাব। বাবা, ধন্যি মেয়েমানুষ তুই, তোর গুরু হ্লা-পে। আজ তার শিষ্য, গারীকার সোনার মেডেল পেয়েছে। হ্যাঁরে, তুই কাঁদছিস্, কেন? কিছু বলছিস্ না কেন, কি ব্যাপার ঘটেছিল?"

মাধুরী মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বল্ল, "মাগো, কো (দাদা) হ্লা-পে কে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল। তার যে কেউ নেই আর! সে আমাদের জন্যেই আজ তার মায়ের শেষ সেবাও কোরতে পেলোনা।"

মা বল্লেন "কেঁদোনা মা, সে যদি আমার সঙ্গে যেতে রাজী হয়, তবে নিশ্চয়ই আমরা তাকে নিয়ে যাবো। সে তো আজ থেকে আমারই ছেলে। তার মাও সে কথা বোলে গেছে।"

মাধুরী মায়ের যত্নে কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হোয়ে উঠলো এবং পুলিশের কাছে, প্রতিবেশীদের কাছে সব ঘটনা বল্ল। সকলেই তার উপস্থিত বুদ্ধি আর অসম সাহসের প্রশংসা কোরতে লাগ্ল।

দুপুর বেলা মাধুরীর বাবা জঙ্গল থেকে ফিরে এসে মেয়ের বীরত্বের কাহিনী শুনে স্ত্রীকে বল্লেন "দেখলে, মেয়েমানুষেরও দা', ছোরা চালাতে শেখা দরকার কিনা? এমন সন্তানের মা হোয়েছ বোলে আজ গৌরব অনুভব করছ না কি?"

সেইদিনই বিকেলবেলা মাধুরীরা রেঙ্গুন যাত্রা কোরলো।

নদীর ঘাট লোকে ভরে গিয়েছে, জঙ্গলের যত বর্ম্মা, বর্ম্মিনীরা ছুটে এসেছে "কালা" মেয়ে মাধুরীকে দেখতে। মঙ বাথান, মঙ হ্লা-পে কোমরে দা ঝুলিয়ে, হাতে বন্দুক নিয়ে মাধুরীদের আশেপাশে চল্ল, নিরাপদে তাদের রেঙ্গুনের জেটীতে জাহাজে তুলে দিতে।

জাহাজের ডেকে রেলিংএর কাছে দাঁড়িয়ে মাধুরীর মা নীচের জেটির দিকে চেয়েছিলেন। লোকের ভিড় ঠেলে যখন মঙহ্লাপে সাম্নে এসে দাঁড়ালো, চোখের জল মুছতে মুছতে তিনি বল্লেন, "বাবা, যাবিনা মায়ের সঙ্গে? তোর আদরের বোনটি অথোরে কাঁদ্ছে কেবিনে শুয়ে শুয়ে। বর্ম্মাদের প্রাণ বড় শক্ত রে!"

সুরেন্দ্র বাবু গৃহিণীকে তিরস্কার কোরো বল্লেন, "কেন মিছে চোখের জল ফেলছ? তোমার নিজের দেশ ছেড়ে কি তুমি ওর মায়ার পড়ে বর্ম্মা দেশে থাকতে পারছ? ও কেন ওর দেশ ছেড়ে "কালার সঙ্গে বিদেশ যাবে"? হ্লা-পে, তোর ঋণ শোধ কোরতে পারব না কোনদিন। কিন্তু বিদেশী হোয়েও তুই যে আমার কত বড় বন্ধু হইলি এ দেশে, একথা চিরদিন স্মরণ থাকবে আমার। বিদেশের বন্ধুই বড়। আশীর্ব্বাদ করি, এম্নি কোরে তুই তোর দেশের, তোর জাতির সেবায় প্রাণ ঢেলে দিস্।"

জাহাজ জলদ-গম্ভীর সুরে···ভোঁ কোরে বাঁশী বাজিয়ে আরোহীদের সতর্ক কোরে দিল। মাধুরী চমকিয়ে উঠে কেবিনের জানালার ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাক্‌ল "কো-হ্লা-পে—" খালাসীরা তখন সিঁড়ি তুলিতে ব্যস্ত, হ্লা-পে সিঁড়ি-বাঁধা দড়ি গুলি বেয়ে উঠে মাধুরীর কেবিনের জানালার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে, কোমরে ঝোলানো দা খানি খুলে নিয়ে হাত বাড়িয়ে মাধুরীর হাতে দিয়ে বল্‌লে "মাধু, বোন আমার, দাদাকে মনে রেখো, এই আমার স্মৃতি-চিহ্ন।"

শ্রীশান্তিময়ী দত্ত

ক্ষিতীঠাকুরের কথামালা

৩। ময়ূর ও দাঁড়কাক পুচ্ছ

একস্থানে কতকগুলি দাঁড়কাকের পুচ্ছ ও পালক পড়িয়াছিল। এক ময়ূর তাহা দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, আমার এই সুদীর্ঘ পুচ্ছ সুচিত্রিত ও সুদৃশ্য হইলেও আমি ইহার জন্য তেমন ইচ্ছামত উড়িতে পারি না। দাঁড়কাকের পুচ্ছ ও পালকগুলি কেমন কাটা ছাঁটা, আর কেমন ছোট; দাঁড়কাকেরা ঐ পুচ্ছ ও পালক পরিয়া কেমন ফিটফাট হইয়া থাকে এবং কেমন সহজে নিজেদের আহার সংগ্রহ করিতে পারে। এই ভাবিয়া ময়ূর নিজের সুদৃশ্য পালক ও পুচ্ছগুলি তুলিয়া ফেলিয়া দাঁড়কাকের পুচ্ছ ও পালকগুলি আপন গায়ে বসাইয়া দিল, এবং ময়ূরদের নিকট গিয়া "তোরা অতি নীচ অকেজো ও অতি অলস, আর আমি তোদের সঙ্গে থাকিব না; দাঁড়কাকেরা আমাদের চেয়ে কত উচ্চে উড়িতে পারে, আর কত দেশ বিদেশ হইতে কত আহার সংগ্রহ করে; আমিও তাহাদের মত উচ্চে উড়িয়া দূর দূরান্তর হইতে অনায়াসে খাদ্য সংগ্রহ করিব; তোদের পালকে দেখিতে এমনইবা কি সুন্দর দেখায়—রং বেরং—যেন চক্ষু ঠিকরাইয়া যায়; তদ্ব্যতীত, তোদের পুচ্ছগুলি সুদীর্ঘ, যেন দেহে এলাইয়া পড়িয়াছে; তোদের চালচলন পোষাক সকল বিষয়েই কেন কবিতার ঢং ফুটিয়া বাহির হইতেছে। দাঁড়কাকদের পালক ও পুচ্ছ কেমন দেখ দিকিন—সমস্ত ফিটফাট, কাটা-ছাঁটা—দেখিলে বুঝা যায় যে উহারা সত্যই কাজের লোক।" এই বলিয়া গালাগালি দিয়া দাঁড় কাকের দলে মিলিতে গেল।

দাঁড়কাকেরা দেখিবামাত্র তাহাকে ময়ূর বলিয়া বুঝিতে পারিল। ময়ূরের চাল চলনের ঢং তো বদলায় নাই, সেই থপথপাথপ ভাবভঙ্গী সবই ছিল, শুধু বাহিরে বাহিরে দাঁড়কাকের পালক দেহের উপর লাগাইলে কি হইবে?

দাঁড়কাকেরা সকলে মিলিয়া তাহার গাত্র হইতে একটি একটি করিয়া দাঁড়কাকের পালক ও পুচ্ছগুলি তুলিয়া লইল। এবং তাহাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ ও কাপুরুষ স্থির করিয়া এত ঠোকরাইতে আরম্ভ করিল যে, ময়ূর জ্বালায় অস্থির হইয়া পলায়ন করিল।

অনন্তর সে পুনরায় আপন দলে মিলিতে গেল। তখন ময়ূরগণ উপহাস করিয়া বলিল, "ওরে নির্ব্বোধ, তুই নিজের সুন্দর পোষাক ছাড়িয়া আমাদের অপেক্ষা কিছু বেশী খাদ্য পাইবার লোভে দাঁড়কাকের পালক গাত্রে পরাইয়া দাঁড়কাক হইয়াছিস ভাবিয়াছিলি এবং অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কাপুরুষের মত আমাদিগকে ঘৃণা করিয়া ও গালাগালি দিয়া দাঁড়কাকের দলে মিলিতে গিয়াছিলি; সেখানে অপদস্থ হইয়া আবার আমাদের দলে মিলিতে আসিয়াছিস। তুই অতি নির্ব্বোধ, নির্লজ্জ ও কাপুরুষ।" এইরূপে যথোচিত তিরস্কার করিয়া তাহারা সেই ময়ূরাধমকে তাড়াইয়া দিল।

[১। যাহার যে অবস্থা, সে যদি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কাহারও নিকট অপদস্থ ও অপমানিত হইতে হয় না।

২। সামান্য কিছু বেশী লাভের আশায় ও লোভে নিজের সুন্দর পরিচ্ছদ, নিজের নিজত্ব এবং আত্মীয় স্বজনের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে কাপুরুষতাই প্রকাশ পায়, কষ্টই পাইতে হয় এবং অনেক স্থলেই একুল ওকুল দুইকুলই নষ্ট হয়।]

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খোকার উক্তি

মাঠের পানে ঐ ছাখ্ মা চেয়ে,
আপন মনে খেল্‌বে কেমন
ছোট্টো হু'টী মেয়ে ॥
ধূলোবালি মেখেছে হাতে পায়ে,
কাদা মেখে, মেখেছে নিজ-গায়ে,
গ'ড়ছে কেমন খেলাঘরখানি,
মাঝে মাঝে ফেল্‌ছে ভেঙ্গে-চুরে,
গান গাইছে সুর মিলিয়ে সুরে,
খেল্‌ছে আবার ধূলোবালি আনি ॥
ওই ছাখ মা বাড়ী তৈরী করা
ছেড়ে দিয়ে, খেল্‌চে চোরে ধরা,
মাঠে ওই অন্য ছেলের সনে,
পুলিস্ ওরা সেজেছে হু'টী মেয়ে,
চোর ধ'র্‌তে যাচ্ছে ধেয়ে ধেয়ে
আশা ভরা আনন্দিত মনে ॥
কাণের পাশে হুলছে হু'টী ফুল
হল্‌দে রঙের, চাঁপার মতো হুল,
বাতাসে উড়্‌ছে চুলগুলি,
ছোট্টো ছেলে টুনুকে ওরা ধ'রে
সবাই মিলে জটাপটী ক'রে
কোলের পরে নিয়েছে ওরা তুলি ॥

আমি কী না ছোট্টো আছি ব'লে,
ওদের মতো যেতে পারিনে চ'লে,
তাইতো ব'সে চেয়েচেয়ে-ই দেখি,
হবো যখন মস্তো বড়ো আমি,
ওপর থেকে নীচেয় যাবো নামি,
আমার সাথে তখনো যাবে কী ?
ওরা তো সব খেল্‌ছে বাজে খেলা,
লেখাপড়ায় ক'র্‌তেছে সব হেলা
মাঠের মাঝে দিনরাত রয় ব'সে,
পারেই-নাকো প'ড়্‌তে শুন্‌তে,
একেথেকে তিরিশ গুণ্‌তে
মিছিমিছি-ই পণ্ডিতেরে দোষে ॥
আমি যখন শিখ্‌বো লেখাপড়া,
ব'সে ব'সে লিখ্‌বো কতো ছড়া,
তাদের নিয়ে-ই ক'রবো আমি খেলা,
কাগজ যখন শেষ হ'য়ে যাবে,
আমায় আবার ফিরিয়ে পাবে,
ঘুমোবো ব'লে আস্‌বো রেতের বেলা ॥

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ সেন

বিজ্ঞানের কথা

সূর্য্য এবং সূর্য্যকিরণ

পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দুরত্বের কথা তোমাদের পূর্ব্বে বলিয়াছি। সূর্য্য কত বড় এবার তাহা তোমাদিগকে বলিব।

পূর্ব্বে লোকেরা মনে করিত সূর্য্য একটি ছোট অগ্নিময় গোলা পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে পৃথিবীর ব্যাস (diameter) ৮ হাজার মাইল কিন্তু সূর্য্যের ব্যাস (diameter) ৮ লক্ষ ৫২ হাজার মাইল। সূর্য্য এত বড় যে আড়াআড়ি ভাবে রাখিলে ১০৬টি পৃথিবী তাহার মধ্যে রাখা যায়। সূর্য্যের ভিতরটা যদি ফাঁপা বলিয়া মনে করা যায় তবে সূর্য্যের এই গর্ত্তটি পূর্ণ করিতে ১৩ লক্ষ ৩১ হাজার পৃথিবীর দরকার। সূর্য্য যে কত বড় তাহা কি এখন তোমরা ধারণা করিতে পারিতেছ?

এইরূপ একটি বৃহৎ বস্তু যে ভয়ানক উত্তাপ ও আলোক বিকীর্ণ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। সূর্য্য যতটা আলো এবং উত্তাপ বিকীর্ণ করে আমরা সবটা পাইনা। সূর্য্যের সব আলোক এবং উত্তাপ পৃথিবীর উপর পতিত হইলে, পৃথিবী ভস্মীভূত হইত। সূর্য্য যতটা আলোক এবং উত্তাপ বিকীর্ণ করে তাহার ২০০ শত কোটির ১ ভাগ আমরা—এই পৃথিবীর অধিবাসীরা পাই। এইটুকু আলোক এবং উত্তাপ যে পাই তাহাই কি ভয়ানক তাহা আমরা সর্ব্বদাই উপলব্ধি করিতেছি।

সূর্য্যের যতটুকু আলোক এবং উত্তাপ আমরা পাই ততটুকুও যদি পূর্ণ তেজে আমাদের উপর পড়িত তাহা হইলেও আমরা পুড়িয়া ছারখার হইতাম। কিন্তু ঈশ্বরের কি করুণার বিধান! আমরা যাহাতে সূর্য্যের পূর্ণ আলোক এবং উত্তাপ পাই অথচ তাহা যাহাতে আমাদের কোনো অনিষ্ট করিতে না পারে সেইজন্য এই পৃথিবী ঘেরিয়া জলকণাপূর্ণ একটি আচ্ছাদন আমাদের চারিদিকে বর্ত্তমান আছে। সূর্য্য কিরণ এই জলকণা সকল আকর্ষণ করিয়া বায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া দেয় বলিয়া সূর্য্যের উত্তাপ আমাদের উপর পূর্ণ তেজে পতিত হয়না। এবং এই কারণেই বাতাস ও ঠাণ্ডা ও মধুর বোধ হয়।

তোমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছ যে সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯ কোটি ১০ লক্ষ মাইল দূরে রহিয়াছে এবং সূর্য্যমণ্ডলে পৌঁছাইতে আমাদের ১৭১ বৎসর লাগে। এতদূর হইতে সূর্য্যের কিরণ কিরূপে আমাদের উপর পতিত হইয়া আমাদিগকে আলোক ও উত্তাপ দেয়? ইহা কি অত্যন্ত বিস্ময়-জনক ব্যাপার নহে? সূর্য্য কিরণ এতদূর হইতে কিরূপে আমাদের স্পর্শ করে?

মনে কর আমি এই বড় ঘরটির একপার্শ্বে একটি তক্তপোষের উপর দাঁড়াইয়া আছি আর তুমি ঘরের অন্য পার্শ্বে মেঝেতে দাঁড়াইয়া আছ।

আমি দুই রকম উপায়ে তোমাকে স্পর্শ করিতে পারি। প্রথমতঃ আমি এই তক্তপোষের উপর হইতে এই বলটি তোমার গায়ের উপর ছুড়িয়া দিয়া তোমাকে স্পর্শ করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ আমি এমন জোরের সহিত এই

তক্তপোষ নাড়াইতে পারি যে তাহাতে মেজেও কাঁপিতে থাকিবে। মেজে কাঁপিলে, তুমিও মেজের উপর দাঁড়াইয়া আছ বলিয়া একটি কম্পন অনুভব করিবে।

এই দ্বিতীয় উপায়ে যে তোমাকে আমি স্পর্শ করিলাম ইহা কিরূপে হইল? একটি কম্পন বা গতির একটি ঢেউ গিয়া তোমাকে স্পর্শ করিল।

আমি যে তোমার সহিত কথা বলি তাহা তুমি কিরূপে শোন?

আমার মুখ হইতে যে কিছু তোমার কানের ভিতর ছুঁড়িয়া দিলাম, আর তুমি আমার কথা শুনিলে তাহা নহে। তবে, আমি যে কথা বলি তাহা তুমি কিরূপে শোন? আমাদের চারিদিক ঘেরিয়া বায়ুমণ্ডল রহিয়াছে। আমি যখনি কথা বলি তখনি আমার মুখের সম্মুখে যে বায়ু রহিয়াছে তাহা আন্দোলিত হইয়া ঢেউ উঠে। বাতাসের মধ্যে এই ঢেউর কম্পন চলিতে চলিতে তোমার কাণে গিয়া যখন আঘাত করে তখনি তুমি আমার কথা শুনিতে পাও!

পুকুরে ছোট একটি ঢিল ফেলিলে যেমন ছোট ছোট ঢেউ উঠে, মানুষ কথা বলিলেই ঠিক তেমনি বাতাসের মধ্যে ছোট ছোট ঢেউ উঠে।

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি যে দূর হইতে কোনো বস্তু স্পর্শ করিতে হইলে দুইটি উপায়ে আমরা তাহা করিতে পারি। প্রথমতঃ তাহার দিকে কোনো জিনিস ছুঁড়িয়া দিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ ঢেউর পর ঢেউ তুলিয়া তদ্দারা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকুমুদিনী বসু
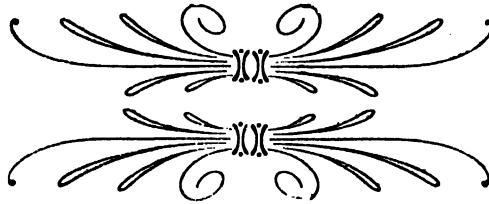
বিচিত্র সংবাদ

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে নির্জ্জন দ্বীপ হ'ল আটলান্টিক সাগরের ত্রিস্তানদাকুনা। সেখানে সারা বছরের মধ্যে একটি মাত্র জাহাজ যায়। মাল পত্তর দিয়ে আসে, আর চিঠি পত্তর নিয়ে যায়। এ দ্বীপটা ইংরেজদের অধিকারে। লোকজন এখানে খুবই কম। গেছে বছর যে জাহাজটী সেখানে গিয়েছিল তাতে যাত্রী জুটেছিল একজন পাদ্রী।

পৃথিবীর একটা জায়গায় পুরাণো টুপির বড্ড আদর। সে হচ্চে নিকোবর দ্বীপ। টুপি যত পুরাণো হবে তার আদর হবে তত বেশী। নূতন টুপির কোনো সুবিধে নেই সেখানে। সেখানে মাছ ধরার সময়ে দেখ্‌বে সমুদ্রের উপর নৌকার পর নৌকা আর তাতে সব পুরানো টুপি পরা লোক। পরণের কাপড় ত এতটুকু, গায়ে ত কিছুই নেই। শুধু সখের ঢেউ চোলেছে পুরোণো টুপির উপর দিয়ে।

প্রত্যেক বছর কলকাতা থেকে সেখানে লোক যায় প্রচুর টুপি নিয়ে, আর তার বদলে নারিকেল নিয়ে আসে। একটা পুরাণো টুপি তা যতই খারাপ হোক না কেন, পরতে যতই খারাপ লাগুক্ তার জন্যেও অন্ততঃ ৫০।৬০টা নারিকেল পাওয়া যাবে। অদ্ভুত তাদের পছন্দ নয় কি?

বোতলের উপর বসা—একটা লম্বা বোতল নাও। মুখের ছিপি খুলে সেই ধারটা মাটির উপর রাখো। এখন বস ত দেখি বোতলটার পরে। মনে হয় এ ত ভারি সোজা, কিন্তু কোর্‌তে মুস্কিল আছে। কিছুক্ষণ চেষ্টা কোর্‌লে হয়ত মিনিট খানেক বোতলটার উপর বস্‌তে পার্‌বে। বন্ধুদেরে বলো বস্‌তে। তারা ভাববে—আহা, কী কাজটাইরে! এ ত সবাই পারে। কিন্তু যেই বসা অম্‌নি কুপোকাত্‌।

নিউগিনির লোকেরা এক রকম মাকড়সার জাল দিয়ে মাছ ধরে। তারা গোটা চারেক পাতা দিয়ে একটা ঘুড়ি তৈরি করে। দুটো দড়ি তার সাথে বেঁধে দেয়। প্রথমটা হয় লম্বা—তা দিয়ে জেলে ঘুড়িটাকে ঠিক রাখে। দ্বিতীয়টি হয় ছোট, আর তার শেষে মাকড়সার জালের এক ঝোপা থাকে। জেলে তার নৌকোয় বসে ঘুড়ি উড়িয়ে দেয়—ঝোপা শুদ্ধ ছোট দড়িটা জলে ভাস্‌তে থাকে। মাছ ভায়া তা দেখে ত ঝোপটাকে গিল্‌তে আসেন। আর যাবেন কোথায়? দেখতে দেখতে মাকড়সার জালে যায় দাঁত বেঁধে।—সেখান থেকে আর নিষ্কৃতি মেলে না।

ভূমিকম্প

মুকুলের পাঠক-পাঠিকাদের অনেকেই হয়ত জীবনে দুই একবার ভূমিকম্প অনুভব করেছে। গত আষাঢ় মাসে শেষ রাত্রিতে যে ভূমিকম্প হয়েছিল তা বোধ হয় তোমাদের মনে আছে। কিন্তু কেন ভূমিকম্প হয়, তা অনেকেই জান না।

আকাশের বায়ুর কম্পন লোকে বুঝিতে পারে। বাতাসে গাছের পাতা নড়ে, ঝড়ে গাছের ডাল দোলে, কাজেই বায়ুর কম্পন ও অবিরাম সঞ্চালন সহজেই বোঝা যায়। নদীর জল চলে, সমুদ্রের জল ঢেউতে দোলে, কাজেই জলের নড়াচড়াও বুঝতে পারি। কিন্তু শক্ত মাটী, যে মাটীর উপর পা ফেলে স্থির হয়ে লোকে দাঁড়ায়, যে ভূমির উপর লোকে বড় বড় ঘরবাড়ী দালান কোঠা গড়ে, সেই মাটী কাঁপে একথা কল্পনা করতেও মানুষ শিহরিয়া ওঠে।

অথচ বৈজ্ঞানিকরা ও ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, ছোটখাটো মাটীর কম্পন ভূগর্ভে ঘন ঘন হয়; তবে যে কম্পনগুলি মাটীর উপরিভাগে পৌঁছছে এবং যেগুলি একটু বেশী জোরে হয়, সেইগুলিই আমরা জানতে পারি। আবার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যে কথা বলেন, সকল সময়েই তাঁহাদিগকে সেগুলির প্রমাণ দিতে হয়। এইজন্য তাঁহারা একটা যন্ত্র তৈয়ার করেছেন, যাহার সাহায্যে ভূমিকম্প জানতে পারা যায়। ইউরোপের বৈজ্ঞানিকরা ইহার নাম রেখেছেন "ভূকম্প. লেখনযন্ত্র" (Seismograph) এই যন্ত্রে ঘড়ির কাঁটার মত একটী কাঁটা আছে। কোথাও ভূমির কম্পন হইলেই এই কাঁটা কেঁপে ওঠে ও কাগজের বোর্ডের উপর আঁচড় পড়ে। আঁকাবাঁকা দাগগুলির আকৃতি দেখিয়া পণ্ডিতগণ নির্ণয় করেন যে, কোনদিকে কত দূরে কাঁপিয়াছে। কলিকাতায় আলিপুরের মানমন্দিরে এইরূপ একটী যন্ত্র আছে।

ভূমিকম্প কেন হয় তাহার কারণ নির্ণয় করিতে সকল দেশের পণ্ডিতগণকেই কতকটা অনুমানের সাহায্য লইতে হইয়াছে। আমাদের দেশের পৌরাণিক পণ্ডিতগণ অতি সুন্দর কল্পনার সাহায্যে ভূমিকম্পের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে জগৎ জলময়। সমুদ্রের জলে একটী প্রকাণ্ড কচ্ছপ ভাসিতেছে। সেই কচ্ছপের পিঠে একটী মস্ত হাতী দাঁড়াইয়া আছে। হাতীর মাথায় একটা সাপ ফণা ধরিয়া রহিয়াছে। সেই প্রকাণ্ড ফণার উপর এই পৃথিবী স্থাপিত হইয়াছে। সাপের ফণাটী এত বড় যে এই বিশাল পৃথিবী একটা সরিষার মত ছোট দেখায়। কচ্ছপ, হাতী কিংবা সাপ এই তিনটীর কোন একটী নড়িলেই পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়। আবার তিনটী একসঙ্গে নড়িলেত আর রক্ষা নাই। পৃথিবীতে পাপের বোঝা যত বেশী হয় ততই ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। এইটা হ'ল ভূমিকম্পের কাল্পনিক ব্যাখ্যা।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ভূমিকম্পের কারণ স্থির করিতে যাইয়া একটী অনুমান গোড়ায় সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। ফরাসী বৈজ্ঞানিক ল্যাপ্লেস বলেন, কোন এক অতীতকালে লোকে তাহা গণনা করিতে অক্ষম—অগ্নিময় সূর্য্যের এক অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ও সৌরপথে ঘুরিতে থাকে। এই বিচ্ছিন্ন অংশই পৃথিবী। সর্ব্বপ্রথমে

ইহা বায়বীয় অবস্থায় ছিল—জ্বলন্ত গ্যাস ও জলকণা পূর্ণ ছিল। ক্রমশঃ উহা ঠাণ্ডা হইয়া তরল অবস্থায় পরিণত হইল। ইহাই পৃথিবীর দ্বিতীয় অবস্থা। লক্ষ লক্ষ শতাব্দীপরে তরল পদার্থ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া কঠিন অবস্থায় পরিণত হইল। অনুমান কর একটী জ্বলন্ত ধাতুময় গোলক রহিয়াছে। উহার হালকা ভাগ গুলি গলিয়া বাহিরের দিকে আসিতেছে ও চারিদিকের শীতল বায়ুর সংস্পর্শ লাগিতেছে। ক্রমশঃ গোলকের চতুর্দ্দিকে একটু কঠিন প্রলেপ দেখা দিল। তার পর ক্রমশঃ এই "প্রলেপ" ঠাণ্ডা হইয়া শক্ত ও মোটা হইতে লাগিল। এইরূপ লক্ষ লক্ষ বৎসরে পৃথিবীর গোলকের চারিদিকে শক্ত মাটীর বেষ্টন হইল। এই মাটীর বেষ্টন যতই ঠাণ্ডা হইতে লাগিল ততই ক্রমে ক্রমে এই মাটীর উপর গাছপালা জীবজন্তুর জন্ম হইল। সর্ব্বশেষে পৃথিবীতে মানুষের জন্ম ও বাস সম্ভব হইল।

তাহ'লে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর গোলকের উপরিভাগে একটা শক্ত মাটীর বেষ্টন রহিয়াছে। আর সেই বেষ্টনের নীচে ভূগর্ভে জ্বলন্ত তরল পদার্থ আছে। আমরা মনে করতে পারি যে, একটা অগ্নিকুণ্ডের পাতলা বেষ্টনের উপর বাস করছি। ভূগর্ভে যে অগ্নিকুণ্ড আছে তাহাও প্রমাণিত হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, যতই মাটীর নীচে যাওয়া যায় ততই মাটীর তাপ বেশী হয়। ভূগর্ভের মধ্যভাগে অগ্নিকুণ্ড না থাকিলে এইরূপ হইত না। ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ, পৃথিবীতে অসংখ্য আগ্নেয় গিরির অবস্থান। আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে মুকুলে পরে লিখিব।

তোমরা জান, পৃথিবী কমলালেবুর মত গোল। কমলা লেবুর উপরিভাগে একটা পাতলা খোসা আছে। ঠিক সেইরূপ পৃথিবীর গোলকের উপরিভাগে একটা মাটীর বেষ্টন আছে। এই বেষ্টনটী একশত মাইলের বেশী চওড়া হইবে না। গোলকের তুলনায় ইহা কমলালেবুর খোসার মতই পাতলা। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে ভূমিকম্পের কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

যুগে যুগে ধীরে ধীরে পৃথিবীর (গোলকের) মাটীর বেষ্টন গঠিত হইয়াছে। এই বেষ্টনটী দিন দিন পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। যে পরিমাণে ভূগর্ভস্থ অগ্নিকুণ্ডের উপরিভাগ শীতল—অতএব সঙ্কুচিত হইতেছে, সেই পরিমাণে অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকস্থ মাটীর বেষ্টনীও অতিশয় বড় হইতেছে। ফলে এই মাটীর বেষ্টনীর ভাঙাগড়া, উঠানামা হইতেছে। কাঁচা কমলা শুকাইলে, কমলার খোসা যেমন কুঁকড়ে যায় অর্থাৎ খোসার উপরটা একটু উঁচু একটু নীচু হয়, মাটীর স্তরেও কতকটা এইরূপ হইয়া থাকে। মাটীর নীচে গভীর স্তরে অনবরত এইরূপ ভাঙন-গড়ন চলিতেছে; এই মাটীর সঞ্চালন একটু বেশী জোরে হইলেই, উহা মাটীর উপরিভাগে পরিচালিত হয় এবং ভূমিকম্প হয়।

ইহা ভিন্ন যে সমুদয় দেশে আগ্নেয়গিরি আছে কিংবা যে দেশগুলি আগ্নেয়গিরির নিকটে, সেই দেশগুলিতেও ঘন ঘন ভূমিকম্প হইয়া থাকে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতও দ্বিতীয় কারণ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

মুখের সৌন্দর্য্য

সেকালের একজন ভদ্রলোক অবসর-সময়ে বাগানে গোলাপ ফুলের চাষ করতেন। তিনি তাঁর মেয়েদের বলতেন, "দেখ, যে তার বাগানে সুন্দর গোলাপ ফুল পেতে চায়; তার অন্তরে গোলাপ ফুলের বিকাশ হওয়া উচিত।

প্রত্যেক মেয়েই চায় যে, সে যে ঘরে শোয়, বসে, লেখাপড়া করে, সে ঘরটি বেশ গোছান, পরিষ্কার সুন্দর হয়। শুধু কি দামী আসবাব-পত্র কিনে ঘর বোঝাই করলে ঘরগুলিকে সুন্দর মনে হয়? যে বাড়ীর লোকেরা অনেক দামী জিনিষপত্র কিনতে পারেন তাঁদের বাড়ী কি খুব সুন্দর করে সাজান মনে হয়? দামী কতকগুলি আসবাব-পত্রের উপরই ঘরের সৌন্দর্য্য নির্ভর করেনা। সামান্য কয়েকটী জিনিষেও ঘরটীকে সুন্দর সাজান যায়। যে মেয়েটী তার ঘরটি সুন্দর করে রাখতে চায়, তার অন্তরে সৌন্দর্য্যবোধ থাকা চাই। যার হৃদয়টা যে রকম তার কাজে ও ব্যবহারে তা প্রকাশ পায়।

যে মেয়ে মনে করে যে মুখে নানা রকম রূপটানের জিনিষ মাখলেই মুখের সৌন্দর্য্য ফুটে উঠে, সে মস্ত ভুল করে। সুন্দর মুখ ত কেনা যায় না, সুন্দর গোলাপ ফুল জন্মাবার জন্য যেমন কত যত্ন পরিশ্রম করিতে হয় তেমনি মুখখানা সুন্দর করতে হলেও যত্ন ও চেষ্টার দরকার। বয়সের সঙ্গে যে মেয়েটীর মনের সৌন্দর্য্য যত বাড়তে থাকে তার মুখখানিতে তার ছাপ পড়তে থাকে, আর সে তত সুন্দর হতে থাকে। বার বছর বয়সের সময় তোমার মুখ যেমন ছিল ষোল বছরে তার চেয়ে আরও সুন্দর হওয়া উচিত। বয়সের এই চারি বছর ব্যবধানে আত্মার সৌন্দর্য্য বাড়বার সময় পায়। মহৎ ভাবপূর্ণ বই পড়লে, সুন্দর জিনিষ সম্বন্ধে চিন্তা করলে, সৎকার্য্য করলে, অন্তরের সৌন্দর্য্য বাড়তে থাকে। আর অন্তরের সৌন্দর্য্য মুখখানিকে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুষমায় ভরে দেয়।

"সুন্দর তুমি অন্তরে জাগো,
অন্তর প্রেমে রঞ্জিত রাখো,
সুন্দর প্রেমে সুন্দর ধ্যানে
হয়ে থাকি চির সুন্দর।"

কথা রাখা

"সতু, সতু,"— মায়ের মিষ্টি ডাক মাঠের মাঝে এসে পৌঁছাল।

সতু তাড়াতাড়ি তার হাতের ব্যাটটা ফেলে দিয়ে, তার কোটটা তুলে নিয়ে বল্‌ল, "ওঃ! মা যে আমায় ডাক্‌ছেন।"

বিনয় বল্‌ল, "আরে এখনই যাস্ না, খেলাটা শেষ হোক্।"

সব বালক-খেলোয়াড়রা একসঙ্গে বলে উঠ্‌ল, "আরে খেলাটা শেষ হোক তবে যাস্, খেলা ফেলে যাবার কি দরকার?"

সতু (সত্যেন) বল্‌ল, "না ভাই, আমি এখনই যাচ্ছি। আমি মাকে বলে এসেছি যখনই তুমি ডাক্‌বে তখনই আস্‌ব।"

বন্ধুরা বল্‌ল, "চুপ করে থাক, যেন তুই মার ডাক্ শুন্‌তে পাস্ নাই।"

সতু বল্‌ল "কিন্তু আমি যে মার ডাক শুনতে পেয়েছি।"

"আরে তিনি জানতে পারবেন না যে, তুই শুন্‌তে পেয়েছিস।"

আর একজন বল্‌ল "আরে ওকে যেতে দাও। ওর দ্বারা যদি কোনো কাজ হবে! ও তার মায়ের আঁচলের সঙ্গে বাঁধা।"

সতু বল্‌ল, "ঠিক কথা, প্রত্যেক ছেলেরই মায়ের আঁচলের সঙ্গে বাঁধা হয়ে থাকা উচিত। আর আঁচলের সঙ্গের গেরোটা খুব শক্ত হওয়া দরকার।"

সুধীর বল্‌ল, "আমি ত ভাই, ছেলে মানুষের মত মায়ের ডাক শুনলেই দৌড়ে যাই না।"

সতু বল্‌ল, "মাকে যে কথা দিয়েছি সে কথা যদি মেনে চলি, সেটাকে আমি ছেলেমানুষী বলি না।" সতুর কালো কালো বড় চক্ষু দুটি কি এক অপূর্ব্ব সুন্দরভাবে জ্বল্‌জ্বল্ কর্‌তে লাগ্‌ল। সতু বল্‌ল, "মার কাছে যে কথা দিয়েছে, তা যে রক্ষা করে চলে, তাকেই আমি মানুষ বলি। যে ছেলে মায়ের কাছে কথা দিয়ে কথা রাখে না, সে অন্যের কাছে কথা দিয়েও রাখবে না—এ কথা খুব সত্য—তোমরা দেখে নিও।" এই বলে সত্যেন তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চলে গেল।

ছেলেরা যখন মাঠে খেল্‌ছিল, তার ত্রিশ বছর পরের কথা। সত্যেন্দ্র রায় বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী—তাঁর ব্যবসায়ী বন্ধুরা তাঁর সম্বন্ধে বলেন, "তাঁর কথাই হচ্ছে দলিল।" কেহ যদি সত্যেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কেমন করে সত্যেন-বাবু সকলের এমন বিশ্বাসের পাত্র হলেন?"

সত্যেন বল্‌তেন, "যখন আমি বালক ছিলাম তখন নানা রকম প্রলোভন সত্ত্বেও আমি কখনও আমার কথার অপলাপ করতাম না, যা কথা দিতাম তা রক্ষা কর্‌তাম—এ অভ্যাসটা ছোট বেলা থেকে করাতে বদ্ধমূল হয়ে গেছে।"

বালকের রচনা

প্রভুভক্তি

(একটি রুশ দেশীয় ঘটনা হইতে)

সে অনেক দিনের কথা—সাইবেরিয়ার একটি গ্রামে একজন রুশ ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করিতেন। লোকটি রুশ সরকারের প্রতিনিধি স্বরূপ সেখানে থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গে একটি পুরাতন ভৃত্য ছিল। তাহার নাম ছিল লুপার্সান্। এই ভদ্রলোকটি একদিন খবর পাইলেন যে রুশ সরকার তাঁহার জন্য আরো ভাল কাজ ঠিক করিয়াছেন। সেই কাজ করিলে তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তাড়াতাড়ি রওনা হইবার ব্যবস্থা করিলেন। একটি বড় শ্লেজের মধ্যে তাঁহার জিনিষ পত্র সব রাখিলেন। সেই শ্লেজের সহিত তিনটি তেজিয়ান ঘোড়া জুড়িয়া তাহাতে সকলে মিলিয়া চড়িলেন। লুপার্সান হইল চালক—গাড়ী 'মস্কো'র দিকে রওনা হইল।

তাঁহারা বরফ ঢাকা বনের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন, এমন সময় দেখিলেন যে দূরে অনেক গুলি ছোট ছোট কালো কালো কি দেখা যাইতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহাদের আর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে,ঐ গুলি একদল ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ে বাঘ। লুপার্সান্ ঘোড়াগুলিকে কষাঘাত করিল, আর ঘোড়া গুলি তীরের মত ছুটিল। কিন্তু ঘোড়া আর নেকড়ে বাঘ ত সমান ছোটে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই নেকড়ে বাঘ গুলি শ্লেজের কাছে আসিয়া পড়িল। লোকটি অনেকবার বন্দুক ছুঁড়িলেন, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। অবশেষে লোকটির গুলি সব ফুরাইয়া গেল। তখন তাঁহারা প্রায় মস্কোর নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তবুও নিরুপায় হইয়া তাঁহারা একটি ঘোড়াকে নেকড়ে বাঘদের কাছে ছাড়িয়া দিলেন। নেকড়েগুলি সেই ঘোড়াকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে শ্লেজ কিছুদূর আগাইয়া গেল বটে, কিন্তু বাঘেরা আবার নিকটে আসিয়া পড়িল। তখন বাঁচিবার উপায় আর কি? তখন সেই পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য লুপার্সান বলিল, "প্রভু, আমার কেহ নাই, আজ আমি আপনাদের বাঁচাইবার জন্য এইখানে নেকড়ে বাঘ গুলির মধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। আপনারা নির্বিঘ্নে মস্কোতে যান।" এই বলিয়াই প্রভুভক্ত লুপার্সান তাহার ছোট ছুরিটি লইয়া নেকড়ে বাঘ গুলির মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই সুযোগে লোকটি তাঁহার পরিবার সহ মস্কোতে পৌছিলেন। পরদিন লোকে যখন লুপার্সানকে খুঁজিতে এল,তখন তাহারা দেখিল যে লুপার্সানের ছিন্ন মৃতদেহ বরফের উপর পড়িয়া রহিয়াছে।

শ্রীমোহনকুমার মুখোপাধ্যায়

(বয়স—১০)

ধাঁধা

১। পৃথিবীর সভ্যদেশেই আছে মোর ঠাঁই
মানুষের কাছে শুধু আদর আমি পাই।
পণ্ডিতকে পথ দেখিয়ে আমি লয়ে যাই
মূর্খ লোকে আমায় চিনতে পারবে নাকো ভাই

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি হইতে বিখ্যাত কবির নাম বল :—

(ক) সুমন্ত দল কেন ধুমা দই !
(খ) বীন্দ্র নন সেচন।
(গ) ঈন্দ্রশ্ব গুর চপ্ত।

কার্ত্তিক মাসের ধাঁধার উত্তর—

১। বানর। ২। করাত। ৩। শূকর।

নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকগণ কার্ত্তিক মাসের ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন—

কুমারী সুমিত্রা ও সুচিত্রা দেবী, পাটনা, কুমারী উমা ও শ্রীমান সুনীল রায়, পাটনা, শ্রীমতী সুচারিনী সাটীয়ার পুরাতন মালদহ, শ্রীমান কনকেন্দ্রনাথ মিত্র, রঘুনাথগঞ্জ, কুমারী আরতি বিশ্বাস, তমলুক, শ্রীমান গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, বিষ্ণুপুর।

শ্রীমতী বিমলাবালা দে, মন্টু দে, বাবু দে, সন্তোষ দে, শ্রীমতী অনুপমা দেবী ও প্রতিভা দেবী, শ্রীমান্ সত্যব্রত দাস, শশাঙ্কমোহন ভট্টাচার্য্য, —বর্ম্মা। শ্রীদিলীপ, প্রতাপ, হেনা, অনুজা,—কলিকাতা। শ্রীমতী বীণাপানি চৌধুরী ও রেবতীশেখর চৌধুরী,—বেলগাছী। শ্রীমতী হিমানী দেবী, বাণী দেবী ও শ্রীমান দীপালিচরণ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা। শ্রীমতী মণিকা বিশ্বাস,—রঙ্গপুর। শ্রীমান বিমলকুমার রক্ষিত,—কলিকাতা। শ্রীমান জগদিন্দ্রকুমার ভৌমিক,—গিরিডি। শ্রীমান সন্তোষকুমার মজুমদার,—রেঙ্গুন। শ্রীমান ননীগোপাল বর্ম্মন,—ময়মনসিংহ। শ্রীমান দেবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় —বর্ম্মা। শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী দত্ত,—রেঙ্গুন।

১২০।২, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মুকুল

—পৌষ, ১৩৩৭—

বালকবালিকাদের সচিত্র মাসিকপত্র

শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী বি-এ, কর্ত্তৃক
সম্পাদিত

মুকুলের লেখক-লেখিকাগণ

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু, রায় বাহাদুর জলধর সেন, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডাঃ বনোয়ারীলাল চৌধুরী প্রমুখ।

—বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র—

—ঠিকানা—

২৯৪নং দর্গা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা

বিষয়-সূচী

পৌষ—১৩৩৭

মুকুলের নিয়মাবলী

১। মুকুল বাংলা মাসের ৭ই তারিখে বাহির হয়। ১৫ই তারিখের মধ্যে কোন গ্রাহক মুকুল না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খবর লইয়া কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র লিখিবেন।

২। মুকুলের বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। ভি-পিতে দুই টাকা চারি আনা। যাণ্মাসিক এক টাকা চারি আনা। প্রতি সংখ্যা তিন আনা। বৎসরের মধ্যে যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু বৈশাখ মাস হইতেই কাগজ লইতে হয়।

৩। মুকুলের গ্রাহক গ্রাহিকা ছেলে-মেয়েদের লেখা মুকুলে প্রকাশিত হয়। লেখা মনোনীত না হইলে তাহা ফেরত দেওয়ার জন্য ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। প্রেরিত ধাঁধার সঙ্গে উত্তর লিখিয়া না দিলে তাহা প্রকাশিত হয় না।

৪। মুকুলের নমুনার জন্য এক আনার ডাক ষ্ট্যাম্প পাঠাইতে হয়।

টাকাকড়ি চিঠি পত্র নীচের ঠিকানায় মুকুল আফিসে পাঠাইতে হইবে।

মুকুল কার্য্যাধ্যক্ষ—২৯৪নং দর্গা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা

১৩০২ সনে প্রবর্ত্তিত

"ছোট প্রাণে আমাদের দাও ভালভাসা,
ছোট ছোট মুখে দাও স্বরগের ভাষা।"

৩য় বর্ষ] (নবপর্য্যায়) পৌষ, ১৩৩৭ [৯ম সংখ্যা

ঈশ্বরের দান

এক দেশে ভিক্ষাজীবি ছিল দুইজন,
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি বাঁচাত জীবন।
প্রতিদিন রাজপথে বাহির হইয়া,
চীৎকার করিত জোরে একথা বলিয়া,
"সম্রাট সতত রহে যাহার সহায়
সেই সুখী একমাত্র বিশাল ধরায়।"
অপর বলিত "যার ঈশ্বর সহায়
তার মত সুখী কেহ নাহি এ ধরায়।"
একদা শুনিয়া রাজা তাদের বচন,
মনে ভাবে এরা ইহা বলে কি কারণ!
কৌতূহল হ'ল বৃদ্ধি ইহাতে রাজার
ডাকিল যে দেয় তারে, দোহাই তাঁহার।
দেখিয়া ভিক্ষুকে তাঁর দয়া উপজিল,
একখানা পাঁউরুটী তার হাতে দিল।
কতিপয় স্বর্ণমুদ্রা তার অগোচরে
সম্রাট ভরিয়া দিল রুটীর ভিতরে।
ভিক্ষুক লইয়া রুটী করিল প্রস্থান
ভাবিল রাজার ইহা কি আশ্চর্য্য দান।
"রুটী দিয়া নাহি মোর কোন প্রয়োজন
বিক্রয় করিলে ইহা পাব কিছু ধন।"
ইহা ভাবি রুটী খানা করিল বিক্রয়
যে গায় তাহার কাছে বিধাতার জয়।
ঈশ্বর-প্রেমিক ক'রে রুটীখানা ক্রয়
রুটীমধ্যে স্বর্ণমুদ্রা পেল কতিপয়।

তু' আনায় রুটী খানা করিয়া গ্রহণ
লভিল ইহার মাঝে বহুমূল্য ধন।
লভিয়ে এ ধন তার ঘুচিল ক্রন্দন
এখন করে না আর পথে সে ভ্রমণ।
আর যেই হত ভাগ্য পেয়ে এই ধন,
হারল অদৃষ্টদোষে না করে দর্শন,
ঘুচিল না, ঘুচিল না, অভাব তাহার
এখনও সে দেয় ধ্বনি রাস্তায় রাজার।
শুনিয়া সম্রাট পুন তাহার ক্রন্দন
ডাকিল জানিতে তার অভাব-কারণ।
জিজ্ঞাসিল রাজা তারে রুটীর বিষয়
সে বলিল, "রুটী আমি করেছি বিক্রয়।"
পেয়ে সেই ক্ষুদ্র রুটী আপনার দান
দিয়াছি তাহায় যে গায় ঈশ-নাম।
রাজা শুনি এই কথা আশ্চর্য্য তখন,
ভাবিল ধাতার কি অপূর্ব্ব লিখন।
বুঝিলেন সত্য রাজা সেই দিন হ'তে
ঈশ্বর সহায় যার সুখী সে জগতে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বড় কে ?

প্রথম দৃশ্য

[পারস্যের প্রান্ত দেশ—এলবার্জ পর্ব্বতের বরফে ঢাকা চূড়া দেখা যাইতেছে। পাহাড়ের নীচে শস্য-সম্পদপূর্ণ মাঠ-একটী নদী কুল্ কুল্ রবে বহিয়া যাইতেছে। আলেকজাণ্ডার পাহাড়ের দিকে চাহিয়াছিলেন। সময়—প্রভাত।]

আলেক্জাণ্ডার। [একজন গ্রীক সৈনিককে বলিতেছিলেন] এলবার্জ পাহাড়ের একটা অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আছে। কি সুন্দর বরফে ঢাকা এর চূড়াগুলি। সূর্য্য সোনার কিরণ ছড়িয়ে দিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। কি সুন্দর দৃশ্য ! আমি মুগ্ধ হয়েছি। কি বল ? সুন্দর নয় ?

সৈনিক। হাঁ, সম্রাট।

আলেকজাণ্ডার। অই দেখ—রূপার মত ক্ষুদ্র অই নদীটি মালার মত এঁকে বেঁকে শস্যসম্ভারপূর্ণ শ্যামল ধরণীর বুক দিয়ে আনন্দের বার্ত্তা বয়ে চলেছে। এদেশ আমার জয় করতেই হবে। মনে হচ্ছে আমার এ দিগ্বিজয় বিধার্তা সার্থক করে তুলবেন। কেমন ?

সৈনিক। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের কাছে পারস্যের মত ক্ষুদ্র দেশ জয় করা—সে তো শুধু একটা অঙ্গুলি-হেলন মাত্র। আপনার আগমন-বার্ত্তা এরি মধ্যে প্রচারিত হয়েছে। ভয়ে লোকজন পালিয়েছে। কাল গ্রামে গিয়ে দেখলুম কেউ নেই, নির্জ্জন পল্লী—কোন সাড়া নেই—শুধু গ্রামের কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ ক'রে প্রভুর নিমকের মান রক্ষা কচ্ছিল।

আলেকজাণ্ডার। [হাসিলেন] আচ্ছা, এখানকার সর্দ্দার কে,জান ? এ অঞ্চলের সর্দ্দারকে ডেকে পাঠাও, যদি সে যুদ্ধ চায়, যুদ্ধ করবো, যদি সে বশ্যতা স্বীকার করে তবে নীরবে আমি আমার সৈন্যদল নিয়ে ভারতের পথে অগ্রসর

হব। [একজন সর্দ্দারের প্রবেশ এবং আলেকজাণ্ডারকে অভিবাদন] কে তুমি?

আলি খাঁ। আমি এদেশের সর্দ্দার। নাম আমার আলি খাঁ। আজ প্রাতে সংবাদ পেলাম—দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার—আমার অধিকৃত এই প্রদেশে শিবির সংস্থাপন ক'রেছেন। এ সৌভাগ্যের আনন্দ-বার্ত্তা, আমার কৃতজ্ঞতা, তাই আমি জানাতে ছুটে এসেছি।

আলেকজাণ্ডার [সর্দ্দারের সহিত করমর্দ্দন করিলেন] তোমার এ আতিথেয়তায় বাধিত হ'লেম।—কিন্তু একটা কথা সর্দ্দার।

আলি খাঁ। কি সম্রাট?

আলেকজাণ্ডার। তুমি কি চাও?

আলি খাঁ। আমি! এ কথার অর্থ কি সম্রাট?

আলেকজাণ্ডার। অর্থ অতি সহজ। যদি তুমি যুদ্ধ চাও। তা হলে এক্ষুনি আমার আদেশে আমার সৈনিকেরা তোমার এ শান্তিপূর্ণ দেশে—অশান্তির আগুন জ্বেলে দেবে, তোমার প্রজার রক্তে এই শ্যামল শস্যপূর্ণ প্রান্তর ও বন রক্তের স্রোতে রাঙিয়ে দিবে। আর যদি আমার বশ্যতা স্বীকার কর, আমি তোমায় বন্ধু বলে আলিঙ্গন করবো—তোমাকে তোমার দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখে, শান্তভাবে আমার সৈন্য দল ভারত বিজয়ের পথে অগ্রসর হবে। বল, বল সর্দ্দার, কি তোমার চাই?

আলি খাঁ। আমি কি চাই সম্রাট? আমি এসেছি সম্রাটের ন্যায় মাননীয় অতিথিকে আমার দীন কুটীরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে, আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে, চলুন সম্রাট, এ গরীব দেশের গরীব সর্দ্দারের একান্ত গরীব কুটীরে, এই আমার প্রার্থনা!

আলেকজাণ্ডার। তুমি মহৎ। এস বন্ধু। [সর্দ্দারকে আলিঙ্গন করিলেন] চল। [সৈনিক দুই জন সঙ্গে চলিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[আলি খাঁর আবাস কুটীর সম্মুখে খর্জ্জুরবীথি]

[আলি খাঁ বিনীত ভাবে আলেকজাণ্ডারকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া গৃহ মধ্যে বিস্তারিত কার্পেটের উপর বসিবার ব্যবস্থা করিলেন ও নিজে এক পার্শ্বে বসিলেন। সম্রাট জীবনে বোধ হয় কোন দিন এমন দীনকুটীরে পদার্পণ করেন নাই।]

আলেকজাণ্ডার। কখনো এমন হৃদয়বান মহানুভব বন্ধুর রাজপ্রাসাদে এমন ভাবে অভ্যর্থিত হই নাই, একথা সত্য।

[একজন ভৃত্য একখানি রেকাবীতে করিয়া কতকগুলি স্বর্ণনির্ম্মিত-খর্জ্জুর আনিয়া উপস্থিত করিল। আলি খাঁ পাত্রখানি সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন]।

আলি খাঁ। এদীনের গৃহের সামান্য খাদ্য গ্রহণ করুন।

আলেকজাণ্ডার। (আশ্চর্য্য হইয়া) এ—একি বন্ধু! স্বর্ণনির্ম্মিত খর্জ্জুর! এদেশে তোমরা সোনার তৈয়রী খেজুর খাও না কি? (হাসিলেন)

আলি খাঁ। না সম্রাট! আমাদের দেশে যেমন গাছে গাছে ফল ফলে, নিশ্চয়ই আপনার দেশে তেমনি গাছে গাছে ফল ফলে।—কিন্তু আপনি ত গাছের ফলের সন্ধানে দিগ্বিজয়ে বাহির হননি।—কিন্তু আপনি চাইছেন পৃথিবীর সোনা, তাই সম্রাট, সোনার তৈয়ারী খেজুর আপনার যোগ্য খাদ্য বলে উপস্থিত করেছি। গরীব যে গাছের ফল ভালবাসে,—খেয়ে বাঁচে, রাজার কাছে নিশ্চয়ই তা যোগ্য নয়!

আলেকজাণ্ডার (গম্ভীর ভাবে)। আমি এদেশে তোমার সোনার জন্য আসিনি, এসেছি এদেশের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার জান্‌তে। এখানে ত যুদ্ধ করব না বন্ধু, এখানে এসেছি,

তোমার এই ভালবাসার ঋণ ভালবাসা দিয়ে শুধতে।

আলি খাঁ। আমি কৃতার্থ হলেম, সম্রাটের এইরূপ উদারতায়। (দুই জন কৃষক গোলযোগ করিতে করিতে প্রবেশ করিয়া সর্দ্দারকে, আলেজাণ্ডারকে অভিবাদন করিল)।

১ম কৃষক। বিচার করতে হবে সর্দ্দার। আমরা বড় মুস্কিলে পড়েছি।

২য় কৃষক। এক্ষুনি তোমায় মীমাংসা করে দিতে হবে।

আলি খাঁ। কি হয়েছে বল না?

১ম কৃষক। (দ্বিতীয় কৃষককে দেখাইয়া) আমি এর কাছ থেকে জমি কিনেছিলুম। কাল চাষ করতে গিয়ে আমি দুই ঘড়া সোনার মোহর পেয়েছি, পেয়ে ওকে দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু এযে কিছুতেই নেবে না বলছে। আমি কি করি বলত সর্দ্দার, কেমন করে এ মোহর আমি রাখব?

২য় কৃষক। বল ত কী অন্যায় কথা? সর্দ্দার, আমি ওর কাছে জমি বেচে দিয়ে টাকা গুণে নিয়েছি। ও জমি হয়েছে ওর, সে জমির মোহর আমি কেমন করে নি? ধর্ম্মে কক্ষনো সইবে না!

আলি খাঁ। (কিছুক্ষণ ভাবিয়া প্রথম কৃষকের প্রতি)—তোমার একটী ছেলে আছে —না?

১ম কৃষক। হ্যাঁ সর্দ্দার।

আলি খাঁ। (দ্বিতীয় কৃষকের প্রতি) তোমার একটী মেয়ে আছে না?

২য় কৃষক। হ্যাঁ সর্দ্দার।

আলিখাঁ। এক কাজ কর, তোমার ছেলের সঙ্গে (প্রথম কৃষকের প্রতি) তোমার (দ্বিতীয় কৃষকের প্রতি) মেয়ের বিয়ে দাও, আর ঐ মোহর ওদের যৌতুক দাও। কেমন ঠিক হয়েছে ত?

উভয় কৃষক। হ্যাঁ সর্দ্দার। (দুইজন প্রফুল্ল চিত্তে হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল)।

আলেকজাণ্ডার। (আশ্চর্য্য হইলেন)

আলি খাঁ। সম্রাট কি আমার এই বিচার অন্যায় বলে মনে করছেন?

আলেকজাণ্ডার। কক্ষনো নয়। তবে কি জানো সর্দ্দার, এইরূপ বিচার, এইরূপ মীমাংসা, আমার জীবনে এই প্রথম দেখলুম, পূর্ব্বে আর কখনো দেখিনি, আর আমি নিজেও কখনো করিনি।

আলি খাঁ। আপনার দেশে এমন অবস্থায় আপনারা কি রকম বিচার করতেন?

আলেকজাণ্ডার। সত্য কথা বলতে কি সর্দ্দার, আমরা এই দুইজনকেই বন্দী করে কারাগারে পাঠাতুম, আর এই দু'ঘড়া সোনার মোহর রাজভাণ্ডারে জমা হ'ত। এ টাকার একমাত্র অধিকার রাজার।

আলি খাঁ। (উচ্চৈঃস্বরে) রাজার?—সত্যি তাই! তোমার দেশে সূর্য্য কি আকাশে এমনি করে উঠে দিনের সৃষ্টি করেন?

আলেকজাণ্ডার। নিশ্চয়! যেমন তোমার দেশে আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন, তেমনি আমার দেশেও দেন—কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

আলিখাঁ। তোমার দেশে কি রাত্রিতে তারা ফোটে? চাঁদ হাসে?

আলেকজাণ্ডার। হ্যাঁ বন্ধু!

আলি খাঁ। দেবতার আশীর্ব্বাদের মত পৃথিবীকে সুজলা সুফলা করবার জন্য বৃষ্টির ধারা ঝরে পড়ে?

আলেকজাণ্ডার। নিশ্চয়!

আলি খাঁ। [বিস্মিত হইয়া কহিলেন] আশ্চর্য্য বটে! (খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া) আচ্ছা সম্রাট, —তোমাদের দেশে কি এদেশের মত তৃণভোজী নিরীহ পশু আছে, যারা মানুষের হিতৈষী বন্ধু, অথচ কেবলমাত্র তৃণ ভক্ষণ করে বেঁচে আছে?

আলেকজাণ্ডার। অনেক অনেক, সর্দ্দার।

আলি খাঁ। বুঝেছি সম্রাট! অই নিরীহ নির্দ্দোষ, মানুষের উপকারী জীবজন্তুর জন্যই দেবতা সূর্য্যকে—চন্দ্রকে—বৃষ্টিধারাকে তোমাদের দেশে আলো দিতে, ও বর্ষণ করতে দিচ্ছেন। নতুবা—ক্ষমা করবেন সম্রাট, মানুষের জন্য—যে দেশের মানুষ এত হীন এত নীচ—তাদের জন্য বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয় না। তারা বিধাতার দান গ্রহণের যোগ্য নয়।

[আলেকজাণ্ডার সবিস্ময়ে সর্দ্দারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন]

যবনিকা

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পঞ্চুলাল

১

মোহন বাঁশী

পঞ্চু বাড়ী থেকে বের হ'ল; পাশের গাঁয়ে গেল—সেখানে যদি কোন চাকরী জোটে—এই ভরসায়। পঞ্চু যেখানে যায়, সেই কুকুর আর বেড়ালটা তার সাথে সাথে চলে। পথে এক বামুন ঠাকুরের সঙ্গে হ'ল তার দেখা।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন,—কোথায় যাচ্ছ পঞ্চু এত তাড়াতাড়ি?

পঞ্চু উত্তর দিল,—মজুরী করবো ব'লে বের হয়েছি দা'ঠাকুর।

বামুন ঠাকুর বল্‌লেন,—তা' বেশ কথা; যদি মজুরীই কর, তা' হ'লে আমারও তো একজন চাকরের দরকার। এখানে মাইনেপত্রের কোন কথাই থাক্‌বে না; তিন বছর পুরো খাট্‌নি হ'লে আমি যা' দেবো তাতে তোমার গরলাভ হবে না।

পঞ্চু তখুনি বামুন ঠাকুরের সঙ্গে গেল চাক্‌রী করতে।

তিন বছর একলাগাও খেটে বামুন ঠাকুরকে ভারি খুসী করলো। পঞ্চুরও এবার মাইনে নেবার সময় হ'ল। বামুন ঠাকুর তাকে ডেকে একটা ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনটি থলে পাশাপাশি সাজানো।

বামুন ঠাকুর বল্‌লেন,—এই যে থলে তিনটি পাশাপাশি দেখ্‌ছো, তার প্রথমটিতে ভরা মোহর, দ্বিতীয়টীতে ভরা টাকা আর তৃতীয়টি ভরা আছে বালি। এখন এর কোনটি তুমি চাও?

পঞ্চু মনে মনে চিন্তা করলো, যদি আমি এই মোহরের থলি নি, তা' হ'লে খুবই ধনী হ'বো সন্দেহ নাই। টাকার থলি নিয়ে কিছুদিন সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাট্‌বে। আর যদি এই বালির থলেটাই তুলে নেই, তা' হলে আমি ধনীও হবো-না—গরিবও হবো না, যা' আছি ঠিক তাই

থাক্‌বো। ধনী হয়ে আমার কাজ নেই। এই বালির থলেটা নেওয়াই আমার পক্ষে মঙ্গল।

খানিক এই চিন্তা ক'রে পঞ্চু জবাব দিল,—দা' ঠাকুর, আপনার অনুমতি হ'লে এই বালির থলেটাই আমি নিতে চাই।

ঠাকুর বল্‌লেন,—বেশ, তোমার যেমন ইচ্ছে। টাকা মোহরে তোমার যখন লোভ নেই, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তোমার ভাল হবে।

* * *

পঞ্চু সেই বালির থলে কাঁধে ফেলে রওনা হ'ল। পিছনে তার সেই পুরানো কাল ঝোলা কুকুর আর লেজফুলো বেড়ালটাও সাথে সাথে চলেছে ছায়ার মতন।

অনেক পথ সে হেঁটে পার হ'ল; অনেক মাঠ ঘাট ছাড়িয়ে এল একটা বনের ধারে। গভীর বন—সেখানে মানুষ চলার পথ নেই বল্লেও চলে। সমস্ত বনটাই যেন ঘুমে নিঝুম হয়ে কত কাল থেকে রয়েছে।

সেই বনের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গায়

দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে। তার ভিতরে পরমা সুন্দরী এক কুমারী—যার রূপের জোড়া পৃথিবীতে নেই বল্‌লে ও চলে, কেবল রূপ কথায়ই তার বর্ণনা শোনা যায়। তার চারদিকে আগুনের হলকা দাউ দাউ করে হাজার সাপের মত যেন এক সঙ্গে জিভ বের কচ্ছে!

পঞ্চুকে দেখেই কুমারী চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো রক্ষা কর রক্ষা কর আমায়, হে কৃষাণ কুমার!

পঞ্চু তাড়াতাড়ি থলের সমস্ত বালি সেই আগুনের উপর ছড়িয়ে দিল। সঙ্গে সাঙ্গ আগুনও নিভে গেল।

কুমারী উদ্ধার পেয়ে পঞ্চুকে বললো,—আমি নাগকন্যা। এক রাক্ষস আমাকে পুড়িয়ে মারবার জন্য আগুনের ভিতর আমাকে এ ভাবে রেখে গিয়েছিল। তুমি আমাকে আজ প্রাণে বাঁচালে। আচ্ছা, এই বালির থলেটা তুমি ঘাড়ে করে নিয়ে যাচ্ছিলে কোথায়?

পঞ্চু উত্তর দিল,—তিন বছর চাকরী করে মোহর ও টাকার বদলে এই বালির থলেটাই আমি বেছে নিয়েছিলুম তাইতে আজ তোমার উদ্ধার হ'ল।

নাগকন্যা বল্‌ল,—তোমার এই উপকারের আমিও একটা সামান্য প্রত্যুপকার করবো।—এই বলে' একটা বাঁশের বাঁশী পঞ্চুর হাতে দিয়ে বল্‌ল,—এই যে বাঁশী দেখতে পাচ্ছ এর নাম হ'ল—মোহন বাঁশী। এর গুণ হচ্ছে, যখনি তোমার কিছু দরকার হবে এই বাঁশী বাজালে অমনি তা' তোমার হাতের কাছে এসে যাবে।

সম্রাটের মেয়েকেও যদি তুমি বিয়ে করিতে চাও, তা'ও তুমি করতে পারবে। কিন্তু সাবধান, এর কথা আর কেউ যেন টের না পায়, তা হ'লে তোমার ভয়ানক অনিষ্ট হবে মনে রেখো।

এই ব'লেই নাগকন্যা পায়ের আঙ্গুলে খুঁটে একটু মাটি আল্‌গা করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সাপের আকার ধারণ ক'রে গর্ত্তের ভিতর অদৃশ্য হ'ল।

পঞ্চু ভাবলো, যদি এই বাঁশী বাজিয়ে যা চাইবো তাই মিলে তবে একবার তার পরখ করেই দেখে নি!' কেন আর হেঁটে যাই—অতটা পথ—দেখি এতে কোন কাজ হয় কি না।

এই মনে ক'রে পঞ্চু যেই সেই বাঁশের বাঁশীতে ফু দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বারোটি—প্রকাণ্ড দৈত্য এসে হাজির। পঞ্চু এদের চেহারা দেখে ভয়েই চোখ বুজে রইলো। চোখ খুল্‌তেই দেখে একেবারে বাড়ীর দরজায় সে এসে হাজির। এত দূরের পথ চলে আস্‌তে তার আধ মিনিটও দেরী হ'ল না।

পঞ্চু বাড়ী পৌঁছেই দেখে মা তাকে জড়িয়ে দিয়ে ভারি দুঃখ কচ্ছে। বহু দিন পরে ছেলেকে ফিরে পেয়ে মায়ের আনন্দের অবধি ছিল না।

মা এবার পঞ্চুর সঙ্গের সেই কান ঝোলা আর লেজ ফুলা দুটি প্রাণীকেই আদর ক'রে ঘরে ঠাঁই দিল।

বাড়ীতে যখনি কোন জিনিষের দরকার হয়, চুপে চুপে সেই বাঁশী বের করে বাজায় আর পূর্ব্বের সেই বারো জন দৈত্য এসে সামনে দাঁড়িয়ে কুর্ণিস ক'রে জিজ্ঞাসা করে.—কুমার কুমার, কি চাই তোমার?

পঞ্চু তখনি ভাল ভাল সন্দেশ, মিঠাই মণ্ডা সরপুরিয়া, লাড্ডু, হালুয়া রাবরী, পায়েস, মিহিদানা, কালজাম, রাজভোগ, পান্তোয়া অনেক কিছুর নাম এক সঙ্গে করে ফেলে।

অমনি খুরি আর ভাড়ে ক'রে সেই সব জিনিষ সারে সারে পঞ্চুর সাম্‌নে এনে কে সাজিয়ে দেয়।

পঞ্চু অমনি মাকে ডেকে বলে,—মা, তোমার আরো কিছু জিনিষপত্র চাই কি?

মা এত সব খাবার এক সঙ্গে দেখে অবাক হয়ে বলে,—না বাছা, অত খাবার কে খাবে?—যথেষ্ট হয়েছে। আমরা চারটি প্রাণী—আর কত খাবো। ঢের হয়েছে।

পঞ্চুর সুখের অন্ত নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন

খুকুদের ছড়া

১। ছোট মুখে বড় কথা

বাঘ পালাল, বেড়াল এল, শিকার করতে হাতী।
মোগল পাঠান হদ্দ হোল ফার্শি পড়ে তাঁতি॥

২। বঙ্গবীরকে বাবুয়ানি শিখাইবার গান

ঘুম পাড়ানি মাশি-পিসি, ঘুমের বাড়ী যেও।
বাটা ভরে পান দেব গাল পুরে খেও॥

[এই উচ্চ (!) আদর্শের গান ভুলিয়া গেলেই ভাল হয়]

৩। বঙ্গবীরকে কাপুরুষতা শিক্ষার গান

খোকা ঘুমোল, পাড়া জুড়োল, বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়ে গেল খাজানা দিব কিসে?

৪। বঙ্গবীরকে পেটুক করিবার গান

গরম গরম খিচুড়ি।
খোকা খাবে ছু ঝুড়ি ॥ ১
খেয়ে দেয়ে বেড়াবে।
চড়ায় বালি ছড়াবে ॥ ২
মাসি যত বকবে।
খোকা তত রাগবে ॥৩
শেষে কেঁদে ফেলবে।
দিদি ধরে তুলবে ॥৪
(তখন) চুমুয় ধারা ঝরবে।
(খোকা) আদরে গলে পড়বে ॥৫

[এই সমস্ত ছড়া বাংলায় খোকাদের শৈশবাবধি আদর্শ হয়ে ওঠে। তাই দেখি, বড় হয়েও ছু গাল বেয়ে লাল পড়ে এমন পান খেতে বঙ্গবীর অভ্যস্ত হয়ে ওঠে; তাই বঙ্গবীর চিরকাল জুজু, অদৃষ্ট ও বীর-পদে দণ্ডায়মান কাহাকেও দেখিলে আতঙ্কিত হইয়া ওঠে। কিন্তু শুনিতে পাই মহারাষ্ট্র দেশে আজও শিবাজী প্রভৃতি বীরগণের চরিত্রে গ্রথিত ছড়াগুলি গাহিয়া মাতা শিশুদিগকে নিদ্রাদেবীর দেশে পাঠান; তাই সেখানে আজ পর্য্যন্ত প্রকৃত বীর জন্মগ্রহণ করিবার অবসর পায়। আমাদের দেশের কোন কবি যদি প্রতাপাদিত্য, মোহনলাল, রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রভৃতি ধর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীরগণের চরিত লইয়া ঘুম-পাড়ানি ছড়া রচনা করেন, তবে দেশের মহা কল্যাণ ও জাতির পরম উপকার সাধিত হয়। আমাদের দেশের ছড়াসাহিত্যের ইতিহাস জাগাইয়া রাখিবার জন্য আমি উপরের ছড়াগুলি পাঠাইলাম।]

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবীন জীবন

ক্ষুদ্র নদীর ধারে একটী প্রকাণ্ড লাল রঙের অট্টালিকা। অট্টালিকার চারি পাশে সুন্দর ফুল ও ফলের বাগান। বাগানের বৃহৎ ফটকটী সদর রাস্তার উপরেই উন্মুক্ত। এই অপ্রশস্ত পথটী নদীর সাথে সাথেই আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। নদীর পারেই, একটু দূরে অট্টালিকার ছুই দিকেই গৃহস্থের ছোট ছোট বসতবাড়ী। ফটকে একদল হিন্দুস্থানী দরোয়ান জটলা করিতেছে। ফটক পার হইয়া বাগানের ভেতর দিয়া একটু দূর অগ্রসর হইলেই বৃহৎ অট্টালিকার প্রবেশদ্বার।

জমিদার বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এই অট্টালিকার মালিক। তিনি দয়ালু, ন্যায়বান, সচ্চরিত্র ও বিদ্বান। এজন্য প্রজারা ও প্রতিবাসিগণ তাঁহার অনুরক্ত ছিল। জমিদার মহাশয় শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহীন হইয়াছিলেন। তাঁহার সংসারে তিনি, পত্নী সরমা ও নবজাত শিশু ভিন্ন দূর সম্পর্কীয়া ছুই একটী বৃদ্ধা ছিলেন। আর কতকগুলি ঝি ও চাকর এবং লোকজন এই বৃহৎ অট্টালিকার অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছিল। শিশু অমরকুমার সুস্থ, সবল ও সুন্দর। পিতামাতা তাঁহাদের একমাত্র পুত্রকে প্রাণ ঢালিয়া স্নেহ করিতেন। সে ছিল তাঁহাদের নয়নের মণি। সেই শিশুকণ্ঠে সুমিষ্ট "বাবা" ডাক

শুনিবার পূর্ব্বেই অমরের পিতাকে যুদ্ধে যাইতে হইল। তখন মোঘল নবাবের সহিত হিন্দুরাজার যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল। বিজয়কুমার শক্তিনগরের রাজার দক্ষিণহস্ত ছিলেন। শৌর্য্যে, বীর্য্যে, বুদ্ধিতে তাঁহার সমকক্ষ সে দেশে আর কেহ ছিলনা।

সর্ব্বগুণে ভূষিতা লক্ষ্মী স্বরূপা সরমা একাকীই প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকায় রহিলেন। স্বামীর অনুপস্থিতি কালে শিশু পুত্রই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা স্থল ছিল এবং সেই তাঁহার প্রাণে আনন্দ দিত। দিন রাত্রি তিনি এই চিন্তা করিতেন কবে অমরকে কোলে লইয়া স্বামীকে অভ্যর্থনা করিবেন।

একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি অমরকে কোলে করিয়া বাগানে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় অমরের ঝি সুখদা—তাহাকে কতকগুলি তাজা সুন্দর সুগন্ধি লাল গোলাপ ফুল দিল। শিশু হাসিতে হাসিতে গোলাপ ফুল ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল। ইহা দেখিয়া মার খুব আনন্দ হইল।

হঠাৎ তখন—যে বিশ্বস্ত অনুচর বিজয় বাবুর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিল—সে সেখানে উপস্থিত হইল। সে বলিল—"যুদ্ধ করতে গিয়ে কর্ত্তা মহাশয় গুরুতর আহত হয়েছেন, অবিলম্বে আপনাকে দেখতে চেয়েছেন।" সংবাদ শুনিয়া সরমার হাস্যোজ্জ্বল সুন্দর মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার হাত এমন কাঁপিতে লাগিল যে তিনি পুত্রকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না।

চাকরটী যখন দেখিল যে কর্ত্রীঠাকুরাণী খুব ভয় পাইয়াছেন, তখন সে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল যে "কর্ত্তা মহাশয় শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিবেন। কিন্তু তাঁহাকে এখনই রওনা হইতে হইবে।" সরমা তখনই রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলেন। যদিও তিনি বাঙ্গালী নারী, তথাপি বাল্যকাল হইতে পশ্চিমে লালিত-পালিত হইয়া সর্ব্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, কাজেই তাঁহার মনে অতুল সাহস ছিল।

তিনি চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে শিশু

পুত্রকে বুকে লইয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন "আমার বাছা, আমার ধন, কেন যে তোমার মা কাঁদছেন তা তুমি কিছুই জানতে পারছ না।

বাবাকে চিনবার আগেই তাকে হারাতে বসেছ, এমনি তোমার দুর্ভাগ্য। সেই দুর্গম পাহাড়ে যায়গায় যাব, রাস্তায় কত বিপদ হতে পারে সেজন্য ত তোমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে পারছি না, আমার যে সেজন্য কি কষ্ট হচ্ছে!"

সুখদা অমরকে জন্মাবধি মানুষ করিতেছে। তিনি সুখদাকে বলিলেন "সুখদা, আমার এক-মাত্র ধনকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। তুমি কিন্তু ওকে এক মুহূর্ত্তও ছেড়ে থাকবে না। যখন ও

ঘুমুবে, তখনও ওর কাছে বসে থাকবে। ওকে এখন যেমন যত্ন কর, আমি চলে গেলেও সে রকম করবে। রোজ সকালে বাগানে বেড়াতে নিয়ে যেও। গান গেয়ে ওকে ঘুম পাড়িও। ওর সঙ্গে কথা ব'লো, ওকে ফুল ও অন্যান্য সুন্দর সুন্দর জিনিষ দেখিও। আর ওর হাতে এমন কোন জিনিষ দিওনা, যা ওর হাতে ফুটে যেতে পারে কিম্বা খেয়ে ফেললে ওর অনিষ্ট হয়। দেখো ও কোন বিপদে না পড়ে। আর ওর উপর কখন রাগ করো না, ও যে নিরাশ্রয় শিশু! বামুনদিদির উপর বাড়ীর সব ভার দিয়ে যাচ্ছি। তুমি ওকে কেমন যত্ন কর তার কাছে থেকে আমি জানতে পারবো। তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর যে আমার আদেশ অমান্য করবে না, তা হলে অন্ততঃ একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। যতদিন না আমি ফিরে আসব, আমি দিন গুণব। তুমি যদি আমার ধনকে এমনি সুস্থ সবল ফিরিয়ে দিতে পার তবে তোমাকে পুরস্কার দেব। আমি তোমার জন্য দামী সুন্দর গহনা ও কাপড় আনবো।"

সুখদা সবই প্রতিজ্ঞা করিল। সরমা তাঁহার পুত্রের মুখ চুম্বন করিলেন, তাহার মাথায় হাত রাখিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিছুক্ষণের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দুই হস্ত যোড় করিয়া নিরাশ্রয়ের আশ্রয় বিপদভঞ্জন দয়াল হরিকে স্মরণ করিয়া তাঁহারই হস্তে পুত্রের সমস্ত ভার অর্পণ করিলেন। তিনি পরে পুত্রকে সুখদার কোলে দিলেন এবং দাস-দাসীদের বিলাপধ্বনি শুনিতে শুনিতে পাল্কীতে গিয়া বসিলেন। অন্ধকার রাত্রি, তখন টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছিল, তিনি সেই দুর্য্যোগের মধ্যেই সুসজ্জিত ও নানারূপ আরামের বস্তুতে পূর্ণ সুখের আলয় ত্যাগ করিয়া হৃদয়ে অব্যক্ত বেদনা ও দুর্ভাবনা লইয়া আহত স্বামীকে দেখিতে চলিলেন।

সুখদা বড় দুঃখিনী, সে বালবিধবা। তাহার এক মাসী ব্যতীত আপনার বলিতে পৃথিবীতে কেহ ছিল না। সে স্বচ্চরিত্র পরিশ্রমী ও শিশুর ন্যায় সরল ছিল। তাহার এই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়াই সরমা তাহাকে পুত্রের ধাত্রী নিযুক্ত করেন। কর্ত্রী ঠাকুরাণী চলিয়া গেলে, সুখদা তাহার কর্ত্রীর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে লাগিল। সে তাঁহার কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে খুব শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত কারণ দুঃখের দিনে তিনি তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সে অমরকেও সরল প্রাণে অতিশয় স্নেহ করিত। আবার এই শিশুকে শ্রদ্ধার চক্ষেও দেখিত, কারণ ভবিষ্যতে সে যে তাহার মনিব হইবে।

একদিন সে শিশুর দোলার কাছে বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছিল। সে দোলার দড়িতে গোলাপ ফুল বাঁধিয়া দিয়াছিল, যেন শিশু চক্ষু মেলিয়াই লাল সুন্দর ফুলগুলি দেখিতে পায়। তাহার দোলটী মশারি দিয়া ঢাকা ছিল যেন মাছিতে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত না করে। তাহার লাল গাল দুটী লাল গোলাপের অপেক্ষাও সুন্দর মনে হইতেছিল।

সে সময় কয়েকজন হিন্দুস্থানী গান গাহিতে গাহিতে সদর দরজার সম্মুখে আসিল এবং বাড়ীর দাসদাসীরা দৌড়িয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া তাহাদের ভিতরে আসিতে বলিল। তাহারা মনে করিল যে কর্ত্তা ও কর্ত্রী ঠাকুরাণী যখন বাড়ীতে নাই তখন কিছুক্ষণ ইহাদের গান শুনিয়া আমোদ করিয়া সময় কাটান যাক। সুখদা গান বাজনা খুব ভালবাসিত। কিন্তু কর্ত্রীর আদেশ স্মরণ

করিয়া সে উঠিল না, ঘুমন্ত শিশুর পাশেই বসিয়া রহিল। এমন সময় আর এক নূতন দাসী লছমি দৌড়িয়া আসিয়া বলিল "শীগ্গীর নীচে আয়, আমরা কেমন গান শুনছি; আর এদের সঙ্গে একটী ছোট্ট ছেলে আছে সে কেমন নাচছে।একজন সারেঙ্গী বাজাচ্ছে। আয় শীগ্গীর আয়।"

সুখদা বলিল, যে সে ত খোকন বাবুকে ছেড়ে যেতে পারে না।

তখন লছমী বলিল "আরে ছেলেমানষী করিস না; আর সাধু সাজতে হবে না, তুই কি করছিস না করছিস কে দেখবে! খোকা ত ঘুমুচ্ছে এখন আর কি কাজ। আর একটু পরেইত ফিরে আসবি।"

তখন সুখদা লছমীর সঙ্গে নীচে গেল। নাচ ও গান তাহাকে তেমন আনন্দ দিতে পারিল না, সে সর্ব্বদাই খোকনবাবুর কথা মনে করিতেছিল। অবশেষে সে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না, জোর করিয়া উঠিয়া পড়িল। সে দৌড়িয়া শিশুর দোলার কাছে গেল।

কিন্তু, একি সর্ব্বনাশ, সেখানে যাইয়া সে কি দেখিল! দোলাটী শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। সে মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিল হয়ত কোন দাসী তাহার সঙ্গে ঠাট্টা করিবার জন্য খোকনকে কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছে। এ কথাটাও যদি কর্ত্রী ঠাকুরাণী জানতে পারেন তা হলেও তিনি কত রাগ করিবেন এই মনে করিয়া সে সকল ঘর খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোথাও খোকনকে দেখিতে না পাইয়া তাহার অত্যন্ত ভয় হইল। সে দৌড়িয়া নীচে যাইয়া চাকর দাসীদিগকে বলিল—"খোকন বাবু দোলায় নাই। তোমরা কি কেউ তাকে লুকিয়ে রেখে আমায় ভয় দেখাচ্ছ!"

তাহারা বলিল যে কিছুই জানে না। তখন সকলে খোকার খোঁজ করিতে ছুটিল, আর বাউলের দল গান বাজনা নাচ বন্ধ করিল ও বকসিসের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল। সকলে উপরের তলায় বাড়ীর প্রত্যেক ঘর তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিল। তাহারা দেখিতে পাইল যে অনেক দামী জিনিষও পাওয়া যাইতেছে না। তখন তাহারা মনে করিল যে নিশ্চয়ই কোন চোর বাড়ীতে আসিয়াছিল।

কয়েক মিনিট আগে যাহারা আমোদে মত্ত ছিল এখন তাহারা কাঁদিতে লাগিল। মৃতব্যক্তির জন্য যেমন সকলে শোক প্রকাশ করে তাহারা তেমনি করিতে লাগিল।

বামুনদিদি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল "হায়, হায়, কি সর্ব্বনাশ হল। কর্ত্তামা যখন এ সংবাদ পাবেন তখন কি আর তিনি বাঁচবেন? হা, ভগবান এ কি হল!"

সুখদার দুঃখের আর অবধি রহিলনা। সে প্রথমে ভয়ে পুকুরে ঝাপ দিতে যাইতেছিল, অন্যান্য দাসীরা দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। সে বরাবর এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল "হা, ভগবান, কে জানত সামান্য অবাধ্যতার জন্য এমন সর্ব্বনাশ হবে!"

ক্রমশঃ

দাদামশায়

চন্দনপুর গাঁয়ে সে বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মাঠে ধান জন্মায় নাই। গরু, ঘোড়া, মহিষ না খেতে পেয়ে শুকিয়ে যেতে লাগল, মানুষদের ত দুরবস্থার সীমা নাই। চাষের ওপরই সে গাঁয়ের লোকদের জীবন নির্ভর করত। দুর্ভাগ্যবশতঃ সময়মত বৃষ্টি না হওয়াতে ও জলের অভাবে ক্ষেতের সব শস্য যেন জ্বলে পুড়ে গেল। অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার রব উঠল। ঘরের চালের খড়-গুলিও গরু ভেড়াগুলিকে খাওয়াতে ফুরিয়ে যেতে লাগল। দুঃখের আর সীমা রইল না।

এমন অবস্থায় গাঁয়ের সব সক্ষম পুরুষরা দলে দলে চাকুরীর আশায় সহরে চলে গেল। গাঁয়ে পড়ে রইল শুধু বুড়া, স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা।

সেই গাঁয়ের একেবারে শেষ সীমায় একটা ভাঙ্গা ও মাঝে মাঝে জোড়াতালি দেওয়া একটা ছোট কুঁড়ে ঘর ছিল। সেই আধ ভাঙ্গা ঘরের জানালার ধারে গৃহকর্ত্রী সুরবালা দাঁড়িয়ে কার যেন আগমন প্রতীক্ষা করছিল। সে বছরে আবার দুরন্ত শীতও পড়েছে। সুরবালা শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, ছেঁড়া শাড়ীর আঁচলখানি দিয়ে কোন রকমে দেহ জড়িয়ে রেখেছে। এমন সময় বাইরের দরজায় শব্দ হওয়াতে, সে এসে তাড়াতাড়ি দোর খুলে দিল। সে বলল—"অমল, তোর এত দেরী হল!

"হাঁ, মা, কি করি। অনেকটা দূর যেতে হয়েছিল কিনা!"

মা বললে—"শীগ্‌গীর ঘরে ঢুকে পড়।"

বার বছরের ছেলে অমল দেখতে খুব রোগা, মুখটা ফ্যাকাশে, বড় বড় চোখ দুটি গর্ত্তে ঢুকেছে, একটা ছেঁড়া ধুতি পরা, পা খালি।

মা বললে—"ডাক ঘরে গিয়ে দেখলি কোন চিঠি নাই?"

"না, মা, কোন চিঠি নাই।"

"আচ্ছা, তুই সেই দোকনদারকে জিজ্ঞাসা করলি তোর বাবার সঙ্গে সহরে তার দেখা হয়েছিল কিনা?

"সে বললে যে বাবার সঙ্গে তার দেখা হয় নাই।"

সুরবালা একথা শুনে চুপ করে রইল।

এমন সময় সেই ঘরের এক কোন থেকে এক-জন বুড়ো বলে উঠল—"হয়ত সে ও সহরে কোন কাজ না পাওয়ায় অন্য যায়গায় গেছে। সুরো, গরুদের আমি জল খাইয়ে আসি?"

"না বাবা, ওদের শুধু জল খাইয়ে কি হবে? ক্ষিদেয় ত ওরা মরে যাচ্ছে! এ শীত কি ওরা সহ্য করতে পারবে! ঘরের চালের অর্দ্ধেক খড় ত ওদের খাওয়ালাম! আর কি করি! কোথায় খাবার পাই. উপায় ত দেখিনা!"

সকলেই বিষণ্ণ মুখে কতক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপরে সুরবালা উঠল। সকলকে খেতে ডাকল। ঘরে চাল ছিল না। কাজেই—বহুদিনের তৈরী মুড়ি ছিল,—তাই সকলকে খেতে

দিল, আর গরু যে সামান্য দুধটুকু দিয়েছিল তাই গরম করে নিলে এল।

সুরবালার বাবা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি উঠে তাঁর ছোট নাতি নাতনীকে খেতে ডাকলেন। একটী দু বছরের ছেলে তাঁর হাত ধরে নিয়ে পিড়ির উপর বসিয়ে দিল। তার ছোট্ট চার বছরের বোন সেও খাবার জন্য এল।

মা ছোট্ট খুকিকে কোলে করে বললেন—"খুকু, মুড়ি আর দুধটুকু খাও।"

খুকু বললে—"না, মা, আমি ভাত খাব। তার ছোট্ট ভাই মনু বলে উঠল—"মা, আমিও ভাত চাই, একটু ভাত দাও।" এই বলে ভাই বোনে কান্না জুড়ে দিল।

মা তখন চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন—"আঃ চুপ কর্, কোত্থেকে ভাত দেব। আমায় আর বিরক্ত করিসনারে।" এই কথা বলে সে ঘরের কোণে বসে কাঁদতে লাগল।

তখন অন্ধ পিতা বললেন—"সুরো, কেঁদ না। সব সহ্য করে থাকতে হবে। ভগবানকে ডাক, তিনি সব দুঃখ দূর করে দেবেন।"

সুরো বলল—"বাবা, ছেলে মেয়েরা যে ক্ষিধেয় কষ্ট পাচ্ছে এ আর আমি দেখতে পারছি না।

পিতা সুরোর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—"কি করবে মা, দয়াময়কে ডাকা ছাড়া আর কোন উপায় যে নাই।"

কিছুক্ষণ পরে অন্ধ পিতা সুরবালাকে বললেন—"সুরো, দেখত আমার কার্পেটের থলেটা কোথায়?"

সুরো বললে "বাবা, থলেটা কেন চাইছ?

বাবা বললে—"বাইরে বেরোই, দেখি কোথাও কিছু ভিক্ষে যদি পাই।"

সুরবালা বললে—"কে ভিক্ষে দেবে বাবা? কোন ঘরেই কিছু নেই।"

অমল তখন বললে—"দাদামশায় দক্ষিণ-পাড়ার ছেলেরা কাল বলছিল যে যখন রেল-গাড়ী ষ্টেশনে থামে তখন সেখানে দাঁড়ালে রেলের যাত্রীরা খাবার জিনিষ দেয়।"

দাদামশায় বলল—"ষ্টেশন এখান থেকে যে অনেক দূর। আচ্ছা, তবু চল যাই। দেখি ভাগ্যচক্রে কিছু পাই কি না। আর রেলের আফিসে কোন কাজ তুমি পেতে পার কিনা তাও দেখে আসি।"

অমল বলল—"চল, হয়ত বা সেখানে কোন কাজ যুটতে পারে। ভিক্ষা করার চেয়ে কাজ করা যে কত ভাল!"

দাদামশায় অমলের কাঁধের উপর হাত রেখে দরজার কাছে এসে সুরবালাকে বললেন "দেখি যদি কোথাও চাল পাই ত নিয়ে আসব।" এই বলে রাস্তায় তারা বেরিয়ে পড়ল। তখন ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস বইছিল। সুরবালা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছিল আর ভাবছিল এমন দিনে কি এই অন্ধ বুড়ো মানুষ ও বালকের রাস্তায় যাওয়া উচিত? যতক্ষণ ওরা ফিরে না আসবে তত-ক্ষণ যে কি ভাবনাতেই সময় কাটবে!

এদিকে অমল ও তার দাদামশায় ধীরে ধীরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তারা দুমাইল পথ হাটল। এমন সময় অমল দেখল আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে আর একটু পরেই ঝমাঝম্ বৃষ্টি পড়বে। তখন যে ওদের কি অবস্থাই হবে।

একেত ওরা এখনই শীতে কাঁপছে। তখন অমল বলল—

"দাদামশায়, একটু শীগ্‌গীর চল, এখনি বৃষ্টি আরম্ভ হবে।"

দাদামশায় বলল "আমি বুড়ো হয়ে গেছি, এর চেয়ে তাড়াতাড়ি ত হাটতে পারি না।

কিছুক্ষণ পরে অমল বলল—"দাদামশায়, খুব জোরে বৃষ্টি আসছে। আকাশে যা বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাজ পড়বে।

দাদামশায় বলল "ভগবান যা করেন তাই ভাল, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক।'

দুজনেই নীরবে পথ চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দাদামশায় বলল "অমল, ষ্টেশনে যেতে যে বড় জঙ্গলটা পার হয়ে যেতে হয় সেটা দেখতে পাচ্ছ?"

অমল বলল—"না।"

দাদামশায় বলল—"তাইত, জঙ্গলটা দেখছি এখনও অনেক দূরে। তোমার পা কি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, অমল? আমার সমস্ত শরীর শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।'

অমল বলল—"দাদামশায়, চল তাড়াতাড়ি হাটি, তা হলে শরীরটা গরম হবে।"

দাদামশায় বলল—"আমি যে তাড়াতাড়ি চলতে পারছি না, কি করি বল।"

এদিকে যেমন জোরে বাতাস বইতে লাগল তেমনি মুষল ধারে বৃষ্টি পড়তে লাগল। আকাশ চিরে বিদ্যুত খেলা করতে লাগল আর বাজের কড়কড়ানি শব্দে কান কালা হবার যোগাড় হল। মনে হল আকাশ আর পৃথিবী একাকার হয়ে গেছে। চারিদিকে ঘন অন্ধকার,— শুধু বিদ্যুতের আলোতে যা আলো হচ্ছিল। শুধু অন্ধ দাদামহাশয় ও তার ছোট নাতি এই ভীষণ দুর্যোগে রাস্তায় বার হয়েছে। কে এমন হতভাগ্য এমন দিনে ঘরে গরমে আরামে না থেকে রাস্তায় কনকনে শীতের ও বৃষ্টির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল—অন্ধকারে গর্তের মধ্যে কতবার পা পড়ে পড়ে যেতে লাগল।

দাদামশায়ের পা আবার গর্তে পড়ে গেল, তিনি হোঁচট খেলেন, অমল তা দেখে বলল দাদামশায়, বাড়ী ফিরে যাই।"

দাদামশায় বললেন "অর্দ্ধেক রাস্তা এসেছি, আবার এখন ফিরে যেতেও তেমনি দেরী হবে। আর বাড়ীতেও ত ঘরের চালে খড় নাই ঘর ত বৃষ্টিতে ভিজে গেছে, সেখানে যে গরমে কোথাও বসব তার যায়গা নাই। ঘরে খাবার জিনিষও কিছু নাই। ষ্টেশনে তবু আশ্রয় পাওয়া যাবে। আঃ এ সময় গরম দুধ পেলে ও আগুনের ধারে বসলে কেমন ভাল লাগত। খুব আরাম লাগত না, অমল?"

অমল বলল "হাঁ, দাদামশায়।" এই কথা বলবার সময় তার চোখে জল এল।

হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি থেমে গেল। দাদামশায় জিজ্ঞাসা করলেন "ঠিক পথে যাচ্ছি ত?"

অমল বলল "হাঁ, ঠিক পথেই যাচ্ছি।"

কিছুক্ষণ পরে আবার ঝড়ের বাতাস বইতে লাগল। বৃষ্টি পড়তে লাগল। দাদা মশায় আর চলতে পারছিলেন না। কতবার যে তিনি পড়ে গেলেন তার ঠিক নাই। অমল এক লাঠি নিয়ে আর এক হাতে দাদামশায়ের হাত ধরে যেতে লাগল। দাদামশায়কে এক রকম টেনে নিয়েই চলল। কিছু পথ গিয়ে অমলের মনে হতে লাগল সেও পড়ে যাবে। ক্রমে তারা জঙ্গলের কাছে

এল। অনেক কষ্টে অমল তার অর্দ্ধ অচেতন দাদামশায়কে ধরে ধরে নিয়ে চলল।

অমল বলল "দাদামশায়, একটু তাড়াতাড়ি চল, জঙ্গল ত খুব কাছে।"

দাদামশায় বললেন "ও! জঙ্গলের কাছে আমরা এসে পড়েছি। ভগবানকে ধন্যবাদ!"

তাঁর কথা বলবার শক্তি যেন লোপ পেয়েছিল তাঁর ঠোট দুটি রক্তশূন্য।

ঐ জঙ্গলে গাছগুলি খুব ঘন ঘন। ভাগ্যক্রমে তখন বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। এতক্ষণ দাদামশায় প্রতি পদক্ষেপে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে চলেছিলেন। বুকের উপর ঝড়ের ঝাপটা লেগে ছিল, সমস্ত শরীর বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল। এখন একটু নিরাপদ যায়গায় এসে তাঁর পা আর চলছিল না। পা দুটি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল, মনে হচ্ছিল যেন তাঁর সমস্ত শরীর ভেঙ্গে চুরে গেছে।

অমল বলল "দাদামশায়, তোমার কি হয়েছে! আর বেশী দূর নয় জঙ্গলটা পার হয়ে আর তিন মাইল যেতে হবে। চল যাই।"

দাদামশায় বললেন 'আর আমি চলতে পারছিনা। আমার পক্ষে আর চলা অসম্ভব।"

অমল তখন কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল "তুমি আর চলতে পারবে না? দাদামশায়, তবে আমি কি করব?

দাদামশায় বললেন "অমল কেঁদ না, আমি বলে দিচ্ছি তুই কি করবি, যে গাছটার খুব ঘন ঘন ডালপালা, সেই গাছের তলায় আমায় রেখে যা। তুই ষ্টেশনে যা, যদি সেখানে ভিক্ষা করে কিছু পাস তাই নিয়ে ফিরে আসিস। আমি ততক্ষণ এখানে বসে বিশ্রাম করি, শরীরটাকে গরম করি। হয়ত বা আকাশ পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে আর ঝড় ও থেমে যেতে পারে।"

অমল বলল "দাদামশায় আমার ভয় হচ্ছে; শীতে তোমার শরীর বা জমে যায় আর যদি জঙ্গল থেকে নেকড়ে বাঘ আসে।"

"আঃ বোকা ছেলে! বাঘে এ বুড়ো লোকটাকে খাবেনা, যা!"

অমল চারিদিক দেখে একটা মস্ত অশ্বত্থ গাছ পেল। তার ডালপালা খুব ঘন ঘন, সেই গাছ তলায় দাদামশায়কে নিয়ে গেল। সে গাছ তলায় কত পাতা পড়ে ছিল, সেই সব দিয়ে বিছানার মত করে দিল। একটু দূরে দূরে সব ছোট ছোট ডাল পালা ছিল সেগুলিকে টেনে নিয়ে এসে যেখানে শোবার যায়গা করেছিল তার উপরে এনে একসঙ্গে জড়িয়ে দিল—ঘরের ছাদের মত হল! তারপরে সে দাদামশায়কে বলল "দাদামশায় তুমি এখানে বসে থাক। আমি যত শীগ্‌গীর পারি ফিরে আসব।"

দাদামশায় বললেন "অমল, তুই যাচ্ছিস! আচ্ছা যা।"

অমল বলল "দাদামশায়, তোমার শরীর যেন একেবারে হিম না হয়ে যায়, যতদূর পার গরমে থাক আর বিশ্রাম কর। তোমায় একলা ফেলে যেতে বড় মন কেমন করছে, কি করি।"

দাদামশায় বললেন "না, না, তুই যা।'

অমল বলল "হাঁ, আমি এখন যাচ্ছি।"

দাদামশায় বললেন "তুই চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে যা, আমি উত্তর দেব, এখন।

অমল দৌড়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে দাদামশায় চেঁচিয়ে বললেন "অমল, তুই চলে গেছিস?

কোন উত্তর পেলেন না। দাদামশায় অনেক ক্ষণ চুপকরে শুয়ে রইলেন। গাছের ডাল পালা যেন মাথার উপর ছাদের মত হয়েছিল। তাঁর

ঘুম পেতে লাগল। তিনি ভাবলেন যদি আমি ঘুমিয়ে পড়ি তবেত বাঁচব না!"

তিনি অনেক চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে ঘুমে অভিভূত হয়ে না পড়েন। তিনি কোন বিষয়ে চিন্তা করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু সব যেন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তব ঘটনা একাকার হয়ে গেল, কোনটা স্বপ্ন, কোনটা সত্য ঘটনা তার ঠিক করা গেলনা। এমন দুঃখ কষ্টের মধ্যে সে সব ভুলে ঘুমিয়ে পড়া কি আরামের। যারা ঘুমাতে পারে তারা কত সুখী। তাই ভগবান দুঃখী ও গরীবদের চোখে ঘুম দেন। দাদামশায় ঘুমিয়ে প'ড়লেন। তিনি স্বপ্নে দেখতে লাগলেন যেন ঘরে আগুনের পাশে শুয়ে আছেন আর অমলের বাবা কত খাবার জিনিষ পত্র নিয়ে বাড়ী এসে সকলকে খেতে দিচ্ছে। সকলেই খুব খুসী হয়ে খাচ্ছে। শুধু অমল সেখানে নাই। দুরে রাস্তায় যেন অমলের গলার স্বর শোনা গেল। অমল যেন কাকে ডাকছিল। তারপর দরজা খুলে গেল, অমল ঘরে ঢুকল। অমল ঘরে ঢুকেই আগুনের পাশে তার দাদামশায়কে খুঁজতে লাগল, তাঁকে না দেখতে না পেয়ে বলল "দাদামশায় তুমি কোথায়! উত্তর দাও দাদামশায়?"

দাদামশায় যেন উত্তর দিতে চেষ্টা করছিলেন 'আমি এখানে' কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বার হইলনা। তারপরে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি যেন দূরে অমলের স্বর শুনতে পেলেন। সে ডাকছে—"ও দাদামশায়?"

দাদামশায় উত্তর দিলেন "অমল আমি এখানে।"

তারপরে আরও দূর থেকে তিনি অমলের স্বর শুনতে পেলেন। আর অমলের ডাক শোনা গেল না। তিনি তখন মনে করলেন সে বা পথ হারিয়েছে। তিনি তখন বললেন "হে ভগবান অমলকে পথ দেখিয়ে দাও, তার সাথে সাথে থাকো।"

তারপর আবার তিনি হতাশ হয়ে "অমল" বলে ডাকলেন কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না। শুধু বাতাস স্বন স্বন শব্দে যেন রেগে গর্জ্জাচ্ছিল। দাদা মশায় ভাবলেন "যাই, আমি অমলকে খুঁজি সে পথ হারিয়ে কোথায় যে গেল! তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল দৌড়ে চলে যান কিন্তু তা যে সম্ভব নয়, তিনি যে অন্ধ!

তবুও তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। লাঠি দিয়ে গাছের গোড়ায় মারতে মারতে আন্দাজে চলতে লাগলেন। আবার ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। সে সব অগ্রাহ্য করে 'অমল, অমল' বলে ডাকতে ডাকতে চললেন। এক একবার তাঁর অন্ধ চোখ দুটি দিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে লাগলেন "ভগবান, অমলের সাথে সাথে থেকো।'

তাঁর শরীর কি দুর্ব্বল, তিনি ত নড়তে পারছিলেন না, কোথা থেকে তাঁর গায়ে জোর এল? কোন অলক্ষ্য শক্তি তাঁকে অমলের খোঁজ করবার জন্য নিয়ে চলল? তিনি তাঁর নাতিকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করবার জন্য চলেছেন। স্নেহই অন্ধ ও শক্তিহীনকে শক্তি দিল। বাতাসে তাঁর পাকা চুল উড়ছিল। গাছের ডালে লেগে তাঁর জামা ছিঁড়ে গেল, গায়ের চাদরখানা ছিঁড়ে টুকরা টুকরা হয়ে গেল, লাঠিটা কোথায় পড়ে গেল। শেষে তিনি দুই হাত বাড়িয়ে চলতে লাগলেন, আর অমলের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন।

তারপরে আর ডাকবারও শক্তি ছিল না।

তাঁর গলা দিয়ে একটা চাপা ভাঙা স্বর বার হাত লাগল। তাঁর শরীরে আর একটুও বল ছিল না। তাঁর অন্ধ চোখের সামনে কেবল অন্ধকার দেখতে লাগলেন। মাটিটা যেন নরম লাগল। তিনি কি তবে জঙ্গল পার হয়ে, মাঠে এসে পড়েছেন? কাছেই যেন গোঁ, গোঁ" শব্দ শুনতে পেলেন। তাঁর যেন দম বন্ধ হয়ে এল।

তিনি মাটীতে বসে পড়ে হাতড়াতে হাতড়াতে চললেন। তারপরে কিসে যেন তাঁর হাত ঠেকল। তিনি হাত দিয়ে দেখলেন একটী ছোট ছেলে মাটীতে শুয়ে রয়েছে। তিনি তার ছোট হাত দুখানি ঘসতে ঘসতে বললেন এ কে? অমল নাকি?'

মৃদুকণ্ঠে উত্তর এল "দাদামশায়!"

"তুই তবে বেঁচে আছিস, অমল?'

"হাঁ, বেঁচেত আছিই আমি অনেক চাল সংগ্রহ করে এনেছি—তুমি শীগগীর বাড়ী নিয়ে যাও। তারা সকলে ক্ষিধেয় কত কষ্ট পাচ্ছে।"

দাদামশায় দাঁড়ালেন! তিনি বললেন "ভগবান, অমলকে বাঁচাও, বাঁচাও!'

তিনি অমলকে টেনে উঠিয়ে দাঁড় করালেন তারপরে হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চললেন।

তিনি বললেন "অমল তুমি ঠিক পথ দেখে চল। কোথায় যেতে হবে বল। চলতে চলতে শরীরটা গরম হবে।'

অমল ক্ষীণ স্বরে বলল "দাদামশায়, পথ দেখতে পাচ্ছি।'

দাদা মশায় তার কাঁধ ধরে এক ঝাকানি দিয়ে বললেন "অমল, তুই বেঁচে আছিস তো? এখন একটু গরম বোধ হচ্ছে কি?'

"হাঁ, দাদামশায়, গরম লাগছে।"

"ভগবান তোর সঙ্গেই ছিলেন। তুই বাড়ী যা, তোর অসুস্থ মা, তোর ছোট ছোট ভাই বোনরা খাবারের অপেক্ষায় বসে আছে, কত কষ্ট পাচ্ছে।

"দাদা মশায়, তুমি আমার হাত ধরে চল তবেই বল পাব।'

সুরবালা ভাঙ্গা ঘরে অন্ধকারে ছোট্ট ছেলে মেয়েদের জড়িয়ে ধরে জানালার ধারে চুপ করে বসেছিল। সে শুধু ভাবছিল কখন তার বাবা ও অমল আসবে।

ছোট ছেলে মেয়েরা বলল "মা, দাদা আর দাদামশায় কি আমাদের জন্য খাবার আনবে?"

"হাঁ, আনবেন।'

কিছুক্ষণ পরে দরজা খোলার শব্দ হল। ছেলে মেয়েরা আনন্দে চীৎকার করে উঠল—"দাদা মশায় খাবার এনেছেন।"

দাদা মশায় বললেন "ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমরা তোমাদের জন্য চাল আনতে পেরেছি।"
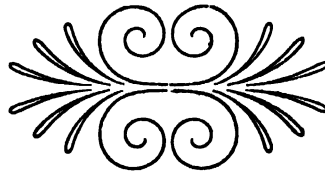
এই ধরণীর আলো

বেসেছি বেসেছি ভালো
এই ধরণীর আলো
আকাশ ধরণীতল
মোহন তারকা দল।
চারিদিকে রূপে গানে
গন্ধে বর্ণে রস গানে
চিত্ত মোর উঠে ভরে
যেন অভিনব স্বরে।
পিয়াসী আকুল প্রাণ
গাহিছে তোমারি গান।
যেন তব সুধা পিয়া
জাগিয়া উঠেছে হিয়া।

আঁধার গিয়াছে টুটি
তাই আলো উঠে ফুটি।
আজি এ গোধূলি ক্ষণে
জাগিতেছে মম মনে
নিজরূপে করি দান
করিল কে সুমহান
এই ধরণীর আলো ?
সকলি জাগিছে ভালো
গাহি আজ ভরি প্রাণ
করি তাঁর জয় গান।

কুমারী মলিনা হালদার

সিংহলী গল্প

(ফরাসী হইতে)

বানরের চালাকি

সিংহলের এক হ্রদের ধারে একটা প্রকাণ্ড আমগাছ ছিল। ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা রঙের পাখী দলে দলে এই আমগাছের ডালে বসে কলরব করত। আর মনের সুখে পাকা পাকা রসাল মিষ্টি আম খেত। এই গাছে একটা 'কালমুখো' বানর বাস করত। বানরটা গাছের গুড়ি হ'তে আগা অবধি লাফালাফি করত, গাছের ডাল ধরে ঝুলত। আর লাল টুকটুকে আমগুলি ছিড়ে লয়ে গাছের ডালের উপর বসে রসটুকু চুষে খেয়ে আমের আঠিগুলি ছুড়ে ফেলে দিত! আবার মাঝে মাঝে পাখীগুলিকে তাড়া দিয়ে আনন্দে খেলা করত।

এই হ্রদের জলে এক কুমীর বাস করত। কুমীরের স্ত্রী খুব বদরাগী ও ঝগড়াটে ছিল। সে দিনরাত কুমীরের সাথে ঝগড়াঝাটি করত, যথেষ্ট খাবার সংগ্রহ করতে না পারায় 'বোকা' ও 'কুঁড়ে' বলে কুমীরকে গালাগালি দিত। কাজেই কুমীর সকালবেলায় গর্ত্ত হতে বের হয়ে, আহারের খোঁজে সমস্ত দিন ঘরের বাইরে

কাটাত। দিনের অধিকাংশ সময়ই কুমীর আম-গাছ তলায় প'ড়ে রোদ পোহাত। আর গাছের উপরে পাখীগুলিকে ও বানরটীকে আনন্দে আম খেতে দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরত। কুমীর মনের দুঃখে আক্ষেপ করে বলত "হা, ভগবান, আমাকে পাখীর মত উড়িবার ক্ষমতাও দাও নাই, কিম্বা বানরের মত লাফাবার শক্তিও দাও নাই, হায়, আমার কি দুর্ভাগ্য"! কিন্তু আম খাওয়ার কোন উপায়ই খুঁজে না পেয়ে কুমীর রোজই আক্ষেপ করতে করতে, বিষণ্ণ মনে সন্ধ্যাবেলায় গর্ত্তে ফিরে যেত। অবশেষে কুমীরের মাথায় এক নূতন বুদ্ধি গজাল। সুযোগ দেখে সে বানরের সাথে আলাপ পরিচয় করে ক্রমশঃ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালো। তখন কুমীর বানরকে বল্লে। "বন্ধু, তুমিত পাকা পাকা আম খাচ্ছ, আমাকেও দুচারটা দাও না?" বানর বললে, "বাঃ, এতো খুব সহজ কাজ; আমি আম ফেলে দিচ্ছি। বন্ধু যত পার, মনের সুখে খাও"। এই কথা বলেই বানর ফলভরা ডালধরে ঝাঁকি দিল। আর অসংখ্য পাকা আম দুপদাপ করে কুমীরের চারদিকে গাছ-তলায় পড়তে লাগল। এবাব কুমীর আহ্লাদে ডগমগ হয়ে, প্রকাণ্ড মুখের মধ্যে টপাটপ রসাল আম পুরে দিয়ে আনন্দে সুমিষ্ট আমের রস খেতে খেতে বানরবন্ধুর বিস্তর প্রশংসা করতে লাগল।

এইরূপে সারাদিন ধরে আম খেয়ে সন্ধ্যা বেলায় গর্ত্তে পৌঁছিতে কুমীরের একটু বিলম্ব হতে সুরু হলো। রোজ কেন এত দেরী হয় তা জানবার জন্য কুমীরের স্ত্রী জেদ করতে লাগল। কিন্তু উপযুক্ত জবাব না পেয়ে দিন দিন কুমীরকে আগের চেয়ে বেশী করে ধমকাতে লাগল। অবশেষে কুমীর স্ত্রীর গালাগালি আর সইতে না পেরে, বানরবন্ধুর সাহায্যে আম খাওয়ার কথা খুলে বললো। তখন কুমীরণী বললে:, "বেশত, রোজ তুমি আমের রসে নিজ পেট ভরছ, আর আমি অনাহারে শুকিয়ে মরছি; জগতে তোমার মত স্বার্থপর আর নাই!!!" কাজেই এখন হতে বাধ্য হয়ে কুমীরকে রোজ কতকগুলি আম তার স্ত্রীর জন্য মুখে পুরে আনতে হতো।

প্রথম কয়েকদিন সুমিষ্ট আম খেয়ে কুমীরনী এত খুসী হলো যে কুমীরকে জালাতন করতে ভুলেই গেল। কিন্তু বেশীদিন এ সুখটুকু কুমীরের ভাগ্যে রইল না। একদিন কুমীরের স্ত্রী মনে মনে ভাবলো যে এতদিন আম খাওয়াতে নিশ্চয়ই বানরের ফুসফুসটা খুব রসাল ও সুমিষ্ট হয়েছে। সে তখনি কুমীরের কাছে যেয়ে বললে "কোন একটা অছিলা করে বানরটাকে এখানে নিয়ে এসো॥"

কুমীর বললো "বানরটাকে কেন চাও?

কুমীরনী বললো 'বানরটাকে মেরে ওর ফুস-ফুসটা খাবো। এই বানরের ফুসফুসটা নিশ্চয় খুব সুস্বাদু হবে।

কুমীররা সকল জন্তুরই ফুসফুস খেতে ভাল-বাসে। কাজেই কতকটা লোভে পড়ে, আর কতকটা স্ত্রীর গালা-গালির ভয়ে কুমীর সাঁতার কেটে হ্রদের তীরে আম গাছের কাছে গেল। তখন গাছের গোড়ায় বানর লাফিয়ে খেলা করছিল। বানরকে দেখেই কুমীর বল্লে, "বন্ধু আমি বড়ই বিপদে পড়েছি আমার স্ত্রীর কঠিন ব্যারাম। সে খাবার ও খায়না, জলও পান করে না। সে বলছে তুমি তাকে দেখে একটু ওষুধ দিলেই, সে সেরে উঠবে। তুমিত

আমার পুরানো বন্ধু, কষ্ট করে আমার সাথে একটু এসো, আমার স্ত্রীর ব্যারাম সারিয়ে দাও।

কুমীরের মিষ্ট কথায় গলে গিয়ে বানর তার সাথে চললো। কুমীর বানরকে পিঠের উপর চড়িয়ে লয়ে, সাতার কেটে হ্রদের মধ্যে যেখানে তার স্ত্রী ছিল সেখানে গেল। আর চড়ার উপরে উপরে বানরকে নামিয়ে দিল। তখন কুমীর মনে করলো যে বানর এবার ফাঁদে পড়েছে তার আর পালাবার উপায় নাই। কাজেই কুমীর গম্ভীর স্বরে বানরকে বললো 'বন্ধু, আমার স্ত্রীকে অত বোকা মনে করোনা। তোমার মত বুদ্ধিহীন বান্দর দিয়ে তার চিকিৎসা করাবার একেবারেই ইচ্ছে নাই। আসল কথাটা হচ্ছে, তোমার ফুসফুসটা আমরা খেতে চাই। এখন মরবার জন্য প্রস্তুত হও।"

কুমীরের কথা শুনে বানর নির্ভয়ে বললো, "আরে বোকা কুমীর, শুধু আমার ফুসফুসটাই চাও, তা এতক্ষণ বল নাই কেন? আমার ফুসফুস এত মূল্যবান যে সেটাকে বুকের মধ্য থেকে ছিঁড়ে নিয়ে আমগাছের উঁচু ডালেতে লুকিয়ে বেঁধে রেখেছি। তোমার স্ত্রী যদি সেটা পেলে খুসী হন, তবে আমাকে আমগাছে নিয়ে চল, এক্ষুনি আমার ফুসফুসটা দিচ্ছি।

আর বৃথা কথা কাটাকাটি না করে, কুমীর বানরকে পিঠে চড়িয়ে সাঁতার কেটে হ্রদের ধারে আমগাছের গোড়ায় গেল। তখন বানর একলাফে গাছের উপরে উঠে, বললে, "ওরে বোকা কুমীর, ওরে নিষ্ঠুর, তোর স্ত্রীর কাছে ফিরে যা, তাকে গিয়ে বল যে আমার ফুসফুসটা বুকের মধ্যেই নিরাপদে আছে। প্রাণপণে চেষ্টা করেও তোরা আমার ফুসফুসটাকে সেখান থেকে বার করতে পারবি না।"

এই কথা বলেই বানর তাড়াতাড়ি আম চুষে আমের আঠি দিয়ে কুমীরের পিঠে ঢিল ছুড়তে শুরু করলো। আর বলতে লাগলো "এতদিন কুমীর আম খেয়েছ, এখন আমের আঠি খাও।"

তখন কুমীর মনোদুঃখে ধীরে ধীরে সাঁতার কেটে স্ত্রীর কাছে ফিরে গেল।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

জাপানী গল্প

পথের ধারে ছোট্ট সরাইখানা। নতুন খোলা হ'য়েচে। মালিক দরিদ্র, সুতরা সরাইটিও সামান্য ধরণের। আসবাব গুলো পুরোন দোকান থেকে কেনা হ'য়েচে—সস্তা হবে ব'লে। কিন্তু সামান্য হলেও সেটি ছিল বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে, তকতকে।

এক দিন এক বণিক আশ্রয়ের আশায় সেখানে এসে হাজির। সরাইওয়ালা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে ডেকে নিলে।

উপরের একখানা ঘর বণিকের শোবার জন্যে নির্দ্দিষ্ট হোল, বণিক রাত্রের আহার সেরে যথারীতি শুতে গেলেন।

শীতকাল। বণিক লেপ মুড়ি দিয়ে নিদ্রা গেলেন। কিছুক্ষণ নিদ্রার পর সহসা কিসের

শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। লেপ থেকে কান বের ক'রে তিনি শুনলেন—যেন দুটি ছেলে কথা কইচে। তাদের একজন ব'ল্লে—দাদা, তোমার কি বড্ড শীত ক'রচে? বড় ভাইটি ছোটকে, সে কথার উত্তর না দিয়ে, জানতে চাইলে শীতে তারও কষ্ট হ'চ্ছে কিনা।

ঘরে আলো জ্বালা ছিল না। বণিক ভাবলেন—সরাইওয়ালার ছেলে দুটি বোধ হয় ভুল ক'রে তাঁর ঘরে এসে পড়েচে। ব'ল্লেন—ওহে ছেলেরা, এটা তোমাদের ঘর নয়, তোমরা ভুল ক'রে অতিথির ঘরে প্রবেশ ক'রেচ।

কিছুক্ষণের মত সব চুপচাপ—কোন শব্দ নেই। বণিক আবার লেপের তলায় অত্মগোপন ক'রলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শুতে না শুতেই আবার সেই স্বর! দু'ভাই পরস্পরকে ঠাণ্ডার কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা ক'রচে

বণিক এইবার উঠে পড়লেন এবং হাতড়ে পকেট থেকে দেশলাই বের ক'রে আলো জ্বাল্‌লেন—কিন্তু কই, কেউ ত নেই! তিনি ঘরের চারদিক বেশ ভাল ক'রেই দেখলেন—নাঃ কাকেও দেখা গেল না। তখন আলোটা জ্বালিয়ে রেখেই তিনি শু'তে গেলেন। আবার সেই স্বর! এবার মনে হ'ল বিছানায় যে লেপ নিয়ে তিনি শুয়েচেন, তারই এক খানার মধ্য থেকে যেন কথার শব্দটা আস্‌চে। বণিক দস্তুর মত ভয় পেয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি নিজের জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিয়ে তিনি একেবারে নীচের তলায় যেখানে সরাই-ওয়ালা থাকে, সেখানে এসে উপস্থিত। সরাই ওয়ালা তাঁকে অত রাত্রে ওভাবে আস্‌তে দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। বণিক তাকে সমস্ত ঘটনা জানালেন। সে কিন্তু তার এক বর্ণও বিশ্বাস করলেন না, ব'ল্লে—কি পাগলের মত কথা ব'লচেন, মশাই? লেপে কখনও কথা বলে? আজ বোধ হয় নেশার মাত্রা আপনার একটু বেশী হয়েচে তাই এই সব কুস্বপ্ন দেখচেন।

বণিক সরাইওয়ালার এই কথায় নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন। তা ছাড়া, ভয়ও যে তাঁর না হ'য়ে ছিল, এমন নয়। তাই, তিনি হোটেলওয়ালার প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে সেই রাত্রেই অন্য সরাই এর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

পরদিন আবার একজন আগন্তুক এসে রাত্রির মত আশ্রয় চাইলেন। এঁরও সেই দশা! গভীর রাত্রে নিথর কক্ষের মাঝে দুটি ছেলের কণ্ঠস্বর শুনে বিচলিত হয়ে তিনিও সরাই রক্ষককে সমস্ত ঘটনা জানালেন।

সরাইওয়ালা ত চটেই লাল! সে ভাবলে—অকৃতজ্ঞতা আর কাকে বলে? এত যত্ন ক'রে এদের রাখলুম, আর শেষকালে একটা না একটা আজগুবি গল্প ব'লে আমাকে বোকা বানিয়ে স'রে পড়তে চায়! কিন্তু দ্বিতীয় আগন্তুকও যখন সত্য সত্যই সে ঘরে আর এক মুহূর্ত্তও থাকতে অস্বীকার ক'রে চ'লে গেল—তখন সরাইখানার মালিক উপরে গিয়ে ওই ঘরের লেপ গুলো একটা একটা ক'রে তুলতে লাগল। হঠাৎ একখানা লেপ ওঠাতেই সে শুনতে পেলে, তার ভেতর থেকে কে যেন ব'ল্লে—দাদা, তোমার কি খুব করচে? দাদাও ভাইটিকে সেই প্রশ্নই করলে।

সরাইওয়ালা এবার বুঝ্‌তে পারলে—যে আগন্তুকেরা এক বর্ণও মিথ্যা বলেন নি। তখন সে ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে সে, রাত্রের মত নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুম কি ছাই আসে! সারা রাত্রিই তার কাণে সেই স্বরই এসে বাজ্‌তে লাগ্‌ল।

ভোর না হ'তেই সে, যে দোকান থেকে

লেপখানা পুরোন অবস্থায় কিনে ছিল, সেই দোকানে গিয়ে মালিককে জিজ্ঞাসা করলে—লেপখানা সে কোথা থেকে আমদানী করে ছিল, দোকানদার আর একজনের নাম ব'লে দিলে। এমনি ক'রে সরাইওয়ালা অবশেষে সন্ধান পেলে যে, লেপখানা প্রথম বিক্রী করেছিল—দূরের ওই বাগানটার ধারে যে বাড়ীখানা রয়েচে তারই মালিক।

আরও বিস্তৃত খবর নিয়ে সে জানলে—

ওই বাড়ীখানির একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত এক মজুর তার স্ত্রী ও দুটি শিশু সন্তানকে নিয়ে। ছেলে দুটির বয়স—একটির আট, অপরটির ছয়। পিতা সামান্য যা রোজগার করত তা'তে সংসার চালান কঠিন। কিন্তু দিন নাকি কারও মুখ চেয়ে ব'সে থাকে না, তাই তাদেরও দিন চলে যেত, তা'সে যেমন ক'রেই হোক। কিন্তু এত সুখও বুঝি তাদের সইল না! সে বছর শীতকালে বাপটি গেল মারা। মাও সপ্তাহান্তে তার অনুকরণ করলে। রইল সেই ঘরে, ছেলে দুটি, একান্ত অসহায় ভাবে।

পেট চালাইতে হবে। সুতরাং দিনের পর দিন একটি একটি ক'রে ঘরের জিনিষ পত্র গুলো তারা বেচে ফেল্লে। অবশেষে আসবাবের মধ্যে রইল শুধু একখানা লেপ।

একদিনের কথা বাইরে তুষারের ছড়াছড়ি। হিমেল বাতাসের সেকি যন্ত্রণাদায়ক স্পর্শ! ভাই দুটি লেপখানা পায়ে জড়িয়ে শুয়ে আছে। ছোট ভাইটি দাদাকে জিজ্ঞাসা করলে—দাদা, তোমার কি বড্ড শীত ক'রছে? দাদাও ভাইকে ঐ প্রশ্নই করলে।

এমন সময় বাড়ীর মালিক মুখ কালো ক'রে ঘরে এসে ঢুকলো, বল্লে বেশত, শুয়ে শুয়ে আরাম করা হচ্ছে, বাড়ীর ভাড়া কোথায়? ভাই দুটি কাতর কণ্ঠে জানালে—আমাদের ত দেবার মত আর কিছু নেই।

বাড়ীওয়ালা ব'ল্লে—ভাড়া দেবার ক্ষমতা নেই ত, ঘর রাখা কেন? যাও এক্ষুনি এ ঘর ছেড়ে চ'লে যাও! এই বল্লে সে লেপখানা কেড়ে রেখে দিলে—আংশিক ভাড়া ত তার উশুল হবে এ থেকে।

ভাই দুটি তার পা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—কোথায় যাব আমরা? আমাদের যে আর ঠাঁই নেই। তা ছাড়া, বাইরে বেজায় বরফ পড়েচে আজ!

এর উত্তরে বাড়ীওয়ালা এমনই একটা মুখ ভঙ্গী করলে, যার পরে ছেলেদুটি আর সেখানে থাকতে সাহস করলে না।

গায়ে একটি ক'রে পাতলা জামা, তাছাড়া, আর কিছুই নেই। খাবারের সংস্থান করতে গিয়ে বাকী পোষাক গুলো যে তাদের সবই বিক্রী হয়ে গেছে। তারা সেই ঘরেরই পিছনে একটা ফাঁকা জায়গায় গলাগলি হয়ে বসে রইল। রাত্রি গভীর হ'তে তাদের চোখের পাতা ঘুমে ঢুলে এল। সেখানেই তারা শুয়ে পড়ল পাশাপাশি গলাগলি হ'য়ে। শূন্য থেকে অজস্র তুষারের কণা তাদের দেহ দুটিকে ছেয়ে দিলে। এ যেন আশীর্ব্বাদ; স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি।

সকালে পথিকেরা দেখলে—দুটি শিশুর মৃত দেহ। কেউ বা অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। কেউ একটা 'আহা' ব'লেই ক্ষান্ত হ'ল। একজন দেহ দুটিকে দয়া করে কোয়ানন্ দেবী (দয়ার দেবতা)-র মন্দিরে রেখে এল। সেখানকার পুরোহিত মন্দিরের ছায়ায় তাদের সমাহিত করলেন।

সরাইওয়ালা এই ঘটনা শুনে তখনই লেপ খানা নিয়ে কোয়ানন্ দেবীর মন্দিরে চলে গেল এবং পুরোহিতের হাতে সেখানা সপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল। পুরোহিত, যেখানে গৃহহারা, নিরাশ্রয় ভাই দুটির দেহ চির শান্তি ভোগ করচে, সেই কবরের উপর লেপখানা বিছিয়ে দিলেন। কি আশ্চার্য্য ! তার পর থেকে লেপখানির ভিতর থেকে আর কোন শব্দ বেরুত না !

মুকুলের ছোট পাঠকপাঠিকারা—জগতে তোমাদের কত ভাই বোন এমনি করে নিরাশ্রয় ভাবে দারিদ্র্যের কবলে নিজেদের তিলে তিলে সমর্পণ করে দিচ্ছে—তার খোঁজ বড় হয়ে একটু রেখো, আর সেই সব অভাগাদের জন্যে পারত দু ফোঁটা চোখের জল ফেলো।

[ভোলানাথ]

অদ্ভুত বালক

গোয়ালন্দের অপর পারে পদ্মা ও যমুনার সঙ্গমের অনতি দূরে তেওতা গ্রাম। এই গ্রামে এক প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের বাসস্থান। তথাকার ভূস্বামী শ্রীযুক্ত হেমশঙ্কর রায় চৌধুরীর পুত্র হিমাংশু শঙ্করের আশ্চর্য্য শক্তির বৃত্তান্ত সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এক বৎসর কয়েক মাস যখন তাহার বয়স, তখনই সে জলে ডুব দিতে ও সাঁতার কাটিতে শিখিয়াছিল। এখন তাহার বয়স ২ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। সে এখন সাঁতার কাটিয়া ৪।৫ হাত যাইতে পারে এবং প্রায় এক ঘণ্টা কাল জলে থাকিলেও তাহার কষ্ট হয় না। সে গান গাহিতে ও কবিতা আবৃত্তি করিতে পারে। দেড় বৎসর বয়সের সময় গানের দুই এক পদ গাহিতে পারিত।

তেওতার জমিদার বংশ বিদ্যাচর্চ্চা ও সৎ কর্ম্মের জন্য বিখ্যাত। এই বালক পিতৃকুলের সাধনার ফল পাইয়াছে।

এক বালিকা ও ডাকাইত

হুসিয়ারপুর পঞ্জাবের এক জেলা। ঐ জেলার অন্তর্গত মোরিয়া গ্রামে এক বালিকা বাস করিত। তাহার বয়স ১৫। এক দিন রাত্রিকালে কয়েক জন ডাকাইত বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র লইয়া তাহার বাড়ী আক্রমণ করে। গ্রামবাসীরা লাঠি লইয়া আসিয়া ডাকাইতদিগকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া হটিয়া যায়। তখন ঐ বালিকা বাড়ীর ছাদের উপর হইতে ডাকাইতদের উপর ইটছুড়িতে আরম্ভ করে। ডাকাইতদের অনেকে জখম হয়, এক বালিকা বহু ডাকাইতকে বাধা দেয়। অবশেষে ডাকাইতরা বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করে। সেই গুলিতে বালিকা ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পরে তাহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হয়। তখন ডাকাইতেরা বাটীতে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বস্বই লইয়া চলিয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র

ধাঁধা

১। চোক আছে মুখ নাই,
বল দেখি কি ভাই।

২। তেজ নাই, আলো আছে,
রাত্রে ঘোরে কাছে কাছে।

শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী দত্ত

৩। আজব দেশের পুরুষ আমি আজব দেশে ঘর,
একটী নদী পেরিয়ে মোরে, যেতে হ'ত ঘর।
ছিল একটী ভাঙ্গা নৌকা, আসতে হ'ত সেইটি চড়ে,
নদীর ধারে লাগিয়ে সেটী, যেতাম আমি বাজারে।
নৌকা ছিল বড়ই ছোট, দুটীর বেশী ধরত না,
আমি ছিলাম একাই একটী, একটী বই আর কুলাত না।
একদিন হ'ল বড়ই মজা, পড়লাম আমি ফাঁপরে,
ছিল সাথে তিনটী জিনিষ, বেচতে মোরে বাজারে।
এক ঝুড়ি ছিল পান, একটী ছিল বাঘের ছানা,
তার সাথে চলল একটী, নাচতে নাচতে ছাগলছানা।
তাদের নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে, এলাম আমি নদীর ধারে,
ভাবলাম আমি কেমন করে, যাব নদীর ওপারে।
বাঘের ছানা নিয়ে গেলে, ছাগলে করে পান সাবাড়,
পানের ঝুড়ি নিয়ে গেলে বাঘ ছাগলের ভাঙ্গে ঘাড়।
ভাবতে ভাবতে ঘণ্টা দুয়েক, কেটে গেল এই করে,
বলত ভাই, কেমন করে নিয়ে যাব ওপারে?

শ্রীএককড়িপ্রাসাদ চট্টোপাধ্যায়

অগ্রহায়ণ মাসের ধাঁধার উত্তর—

১। বর্ণমালা।

২। (ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
(খ) নবীনচন্দ্র সেন।
(গ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

নিম্নলিখিত গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অগ্রহায়ণ মাসের ধাঁধার উত্তর দিয়েছেনঃ—কুমারী করুণালীলা বসু, কলিকাতা, শ্রীমতী হিমানী, বাণী ও উমা দেবী, শ্রীমান দীপালিচরণ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, কুমারী কল্যাণী, কমলিনী, ও বীণাপাণি গুহ, পাটনা, কুমারী কমলা দাস, ডিব্রুগড়, শ্রীমান সত্যব্রত মজুমদার শান্তি-নিকেতন, কুমারী মণিমালা চৌধুরী, দ্বারভাঙ্গা, উমা, তোতা, গোরা ও বিষু কাটিহার, শ্রীমান ননী-গোপাল বর্ম্মণ, কিশোরগঞ্জ, শ্রীমান সঞ্জীবকুমার মুখার্জ্জি, লক্ষ্ণৌ, কুমারী সুমিত্রা ও সুচিত্রা দেবী, বাঁকিপুর, কুমারী মণিকা দেবী, রঙ্গপুর, শ্রীমান হরিনারায়ণ ও দেবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রেঙ্গুন, শ্রীমান বারীন্দ্র ও কেদার দে, কুমারী রেণুকা, নির্ম্মলা, নীলিমা ও ডলি দে, কামাউট, রেঙ্গুন, কুমারী বিমল, শোভনা ও কমলা, শ্রীমান সন্তোষ, মণ্টু ও বাবু, কামাউট, শ্রীমতী শান্তি রাণী ও শশীবালা দেবী ও শ্রীমান্ পরিমলকুমার দত্ত, কামাউট, কুমারী স্মৃতিকণা সেন, রেঙ্গুন, শ্রীমতি বিন্ধ্যবাসিনী দত্ত, শ্রীমতী শচীরাণী দেবী, রেঙ্গুন, শ্রীমতী শোভাময়ী বসু, কলিকাতা, কুমারী বীণাপানি চৌধুরী, বেলগাছি, কুমারী মাধু মিত্রা, কুমারী সঙ্ঘমিত্রা ও রোহিণী বড়ুয়া, আকিয়াব, শ্রীমান সত্যব্রত দাস, রেঙ্গুন, শ্রীমতী শোভা ও আভা রক্ষিত, গাজিপুর।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস্ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মুকুল

—ফাল্গুন, ১৩৩৭—

বালকবালিকাদের সচিত্র মাসিকপত্র

শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী বি-এ, কর্ত্তৃক

সম্পাদিত

মুকুলের লেখক-লেখিকাগণ

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু, রায় বাহাদুর জলধর সেন, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত [illegible]কুমার মিত্র, ডাঃ বনোয়ারীলাল চৌধুরী প্রমুখ।

—বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র—

—ঠিকানা—

২৯৪নং দর্গা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা

বিষয়-সূচী

ফাল্গুন - ১৩০৭

মুকুলের নিয়মাবলী

১। মুকুল বাংলা মাসের ৭ই তারিখে বাহির হয়। ১৫ই তারিখের মধ্যে কোন গ্রাহক মুকুল না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খবর লইয়া কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র লিখিবেন।

২। মুকুলের বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। ভি-পিতে দুই টাকা চারি আনা। ষাণ্মাসিক এক টাকা চারি আনা। প্রতি সংখ্যা তিন আনা। বৎসরের মধ্যে যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু বৈশাখ মাস হইতেই কাগজ লইতে হয়।

৩। মুকুলের গ্রাহকগ্রাহিকা ছেলে-মেয়েদের লেখা মুকুলে প্রকাশিত হয়। লেখা মনোনীত না হইলে তাহা ফেরত দেওয়ার জন্য ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। প্রেরিত ধাঁধার সঙ্গে উত্তর লিখিয়া না দিলে তাহা প্রকাশিত হয় না।

৪। মুকুলের নমুনার জন্য এক আনার ডাক ষ্ট্যাম্প পাঠাইতে হয়।

টাকাকড়ি চিঠিপত্র নীচের ঠিকানায় মুকুল আফিসে পাঠাইতে হইবে।

মুকুল কার্য্যাধ্যক্ষ—২৯৪নং দর্গা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা

আলিপুর চিড়িয়াখানা

১৩০২ সনে প্রবর্ত্তিত

"ছোট প্রাণে আমাদের দাও ভালবাসা,
ছোট ছোট মুখে দাও স্বরগের ভাষা।"

৩য় বর্ষ] (নবপর্য্যায়) ফাল্গুন, ১৩৩৭ [১১শ সংখ্যা

সার সি, ভি, রমন

সার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটা রমনের জন্মস্থান মান্দ্রাজের অন্তর্ভুক্ত ত্রিচিনাপল্লীতে। এই ভারতবাসীর নাম আজ কাল পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বের সব সুধীজনের কাছ থেকে আমাদের স্বদেশবাসী এত সম্মান লাভ করছেন ও তাঁর নাম সর্ব্বজন পরিচিত হয়েছে কেন জানতে চাও? তিনি আলোক সম্বন্ধে এমন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, যা পৃথিবীর কোন পদার্থ বিজ্ঞানবিদের জানা ছিল না। ফলে সকলে তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ব'লে মেনে নিয়েছেন, আর তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নোবেল পুরস্কারটা কত টাকার শুনবে? ৯০,০০০ নব্বই হাজার টাকা। আজ আমাদের মনে কি গর্ব্ব হচ্ছে না যে একজন ভারতবাসী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত থেকে জগতে নূতনতত্ত্ব প্রচার করে, এমন সম্মান গৌরব লাভ করেছেন।

সার রমন ১২ বছর বয়সে এণ্ট্রান্স, ১৪ বছর বয়সেএফ, এ, ও ১৮ বছর বয়সের মধ্যেই এম, এ পাস করেন। বি, এ ও এম, এ, পরীক্ষাতে তিনি প্রথম হয়েছিলেন। তিনি যে কি অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তা ছোট বেলা থেকেই বোঝা গিয়েছিল। তাঁর বয়স এখন ৪২ বৎসর। তিনি এখন কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজের অধ্যাপক। পূর্ব্বে তিনি গবর্ণমেণ্টের হিসাব-বিভাগে মোটা মাইনের চাকুরী করতেন। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্যই বেশী বেতনের চাকুরী ছেড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন।

যাঁর এই নামে পুরস্কারটী প্রতি বৎসর দেওয়া

শ্রীচন্দ্রশেখর বেঙ্কটা রমন

হয়, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলি। এলফ্রেড নোবেল সুইডেনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন রাসায়নিক ছিলেন। তিনি ডিনামাইট (যা দ্বারা বড় বড় পাথর ইত্যাদি উড়ান যায়) প্রভৃতি অনেক রকম জিনিষ আবিষ্কার করে প্রচুর টাকা উপার্জ্জন করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি নিজ নামে পাঁচটি পুরস্কার দেওয়ার জন্য সমস্ত টাকা রেখে যান। একটি পুরস্কার— সাহিত্যের জন্য,—একটি—পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য—আর একটি রসায়নী বিদ্যার (কেমিষ্ট্রির) জন্য – আর একটি পদার্থ বিজ্ঞানের (ফিজিক্সের) জন্য—আর একটি চিকিৎসা বিদ্যা কিম্বা শরীর বিজ্ঞানের (ফিজিওলজীর) জন্য। যে কোন জাতি, যে কোন ধর্ম্মের লোকই এই পুরস্কার পেতে পারেন। অসামান্য প্রতিভাবান ব্যক্তিরা নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করে, যাঁরা পৃথিবীর অবস্থার উন্নতি করেছেন বা করবেন, তাঁরাই এই পুরস্কার পাবার উপযুক্ত।

আমাদের দেশের পুজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। দুই জন ভারতবাসী নোবেল পুরস্কার পাওয়াতে কত আনন্দ হয় না? স্যার রমনই সমগ্র এসিয়া মহাদেশে সর্ব্বপ্রথমে পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

সার রমন নোবেল পুরস্কার নিবার জন্য সুইডেনে গিয়েছিলেন। প্রতি বৎসর সুইডেনের রাজা নিজে এই পুরস্কারটী দিয়ে থাকেন। সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহলম সহরে রাজ সভায় তিনি পুরস্কারটী পেয়েছেন ও তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছেন।

আশা করি, মুকুলের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে কেহ ভবিষ্যতে বিজ্ঞান চর্চ্চা ক'রে, নোবেল পুরস্কার পেয়ে মাতৃভুমির মুখ উজ্জ্বল করবে।

"মূষিক-লীলা"

দেহখানি ছোট্ট একেবারে,
নরম তুলোর চেয়ে সে দেহের রোঁয়া,
রং তার মেটে-মেটে ধোয়া,
বার করা চোখ, ভয়ে চায় চারিধারে,
দিবসে মোহিনী মূর্ত্তি চুপি চুপি চলা,
নিশীথে বাঘিনী বেশ ; ছাড়ে ছলাকলা ॥
লাস্য তার কোথা যায়, প্রচণ্ড তাণ্ডব,
দুয়ার জানালা ছাদ তোলপাড় সব।

প্রথম দলের অভিযান
হাঁকে শাঁখ, বাজে বাঁশী, শিঙার হুঙ্কার
ভেঙে পড়ে আকাশ বিমান,
তাদের ভাণ্ডার ভরে, আমার উজাড়,
কোথায় যায় কন্দমুল, বেগুন বিলাতী
অলাবু, কুষ্মাণ্ড খণ্ড শাকসীম পাঁতি,
কলাই মসুর মুগ চিকণ-চাউল,
গৃহস্থ নাচিছে যেন ক্ষেপা সে বাউল।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

পরিশ্রমের জয়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(চিত্র)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(অলস বালিকা মন্থরা তখনো ঘুমাইতেছে। এমন সময় ঘরের দ্বার ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল এবং হিংসুক-বালক দ্বেষময়, উঁকি দিয়া ঘরের ভিতরটি দেখিয়া পা টিপিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। খাবারের আলমারি খুলিয়া তাহার ভিতরটি ভাল করিয়া দেখিয়া, পা টিপিয়া পুনরায় দ্বারের নিকট গিয়া দ্বার খুলিয়া দিবামাত্র, পরনিন্দুক-বালিকা পরশ্রীকাতরা, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল)।

(হিংসুক-বালক) দ্বেষময়। চুপ কর, একটুও শব্দ করো না।

(পরনিন্দুক-বালিকা) পরশ্রীকাতরা। পৃথিবীর সব লোকই জানে যে আমি কখনো চেঁচাই না। চুপি চুপি কথা বলাই আমার স্বভাব।

দ্বেষময়। এরা সব কেমন চমৎকার ভোজ খেয়েছে। দেখ, দেখ, এই খাবার আলমারিটি কি সুন্দর সব সুখাদ্যে ভরা রয়েছে। (উভয়ে খাবরের আলমারির নিকটে গেল)।

পরশ্রীকাতরা। নিশ্চয়ই এত সব মূল্যবান সুখাদ্য এরা দাম দিয়ে কেনে নাই। এত জিনিষ এরা কোথায় পেল ?

দ্বেষময়। দেখ, দেখ, কত চাল, ডাল, ঘি, তেল, কাঠ, কয়লা, এদের ভাণ্ডারে রয়েছে।

পরশ্রীকাতরা। নিশ্চয়ই এসব জিনিষ এরা চুরী করেছে।

দ্বেষময়। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়

যে আমাদের বন্ধু এই পরিশ্রমী বালিকা বিজয়া, দিন রাত খেটে খেটে এই পরিবার পালন কর্ছে!

পরশ্রীকাতরা। (হাসিয়া) আরে না, না। নিশ্চয়ই না। আমি জানি সে কিছুই করে না, কেবল খাওয়া-দাওয়া আমোদ-প্রমোদ করে বেড়ায়।

দ্বেষময়। সত্যি নাকি, ভাই?

পরশ্রীকাতরা। নিশ্চয়ই! আমি যা বলি সব সত্যি জেনেই বলি। (অলস বালিকা মন্থরাকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকটে গিয়া বলিল) এ, আবার কে?

পরশ্রীকাতরা। যাক, আজ এখানে আমরা যে সব বিশ্রী ব্যাপার দেখ্‌লাম তা আমাদের পাড়াপড়সীদের সব বলে দেব। আমাদের মত ভদ্র সম্ভ্রান্ত লোকদের পক্ষে এদের নিকটেই থাকা উচিত নয়।

দ্বেষময়। এদের এই সুন্দর সাজান বাড়ী, ফুলের বাগান, ঘরের এই সব সুন্দর মূল্যবান জিনিষ, এই সব সুখাদ্যের কথা জানলে পাড়াপড়সীরা সবাই এদের খুব হিংসা কর্‌বে। কি লজ্জার কথা আমার এমন সুন্দর একটি বাড়ী নেই কেন?

পরশ্রীকাতরা। তুমি খুব ভাল লোক কিনা তাই তোমার কিছু নেই। সাধু সত্যবাদী লোকদের ত এ পৃথিবীতে ধন হয় না।

দ্বেষময়। আমি ইচ্ছা করি—

পরশ্রীকাতরা। হাঁ আমি বেশ জানি তোমার কি ইচ্ছা (কাণে কাণে কি বলিল)।

দ্বেষময়। না, না, আমি তা পারব না। আমি চোর হতে পারব না।

পরশ্রীকাতরা। আঃ কে তোমাকে চোর হতে বল্‌ছে? এ জিনিষটাত তোমারি। তোমারি প্রাপ্য! তা আমি নিশ্চয়ই বল্‌তে পারি যে

দ্বেষময়। এই মেয়েটা চুরী করেছে। (এই বলিয়া অলস বালিকা মন্থরাকে দেখাইয়া দিল)। কিন্তু এ-ত মিথ্যা কথা। এ মেয়েটিত জিনিষটা চুরী করে নাই।

পরশ্রীকাতরা। মিথ্যা কথা? কক্ষনো না। যে লোক আমার কথা বিশ্বাস করে, সে নিশ্চয়ই বোকা। আমি যদি বলি ঐ কুড়ে মেয়েটি এই জিনিষটা চুরী করেছে তাহলে বুদ্ধিমান লোকেরা সে কথা কখনো বিশ্বাস করবে না। কিন্তু যারা বোকা তারা সেই কথা বিশ্বাস কর্‌বে। বোকা লোকদের সব হারানই উচিত।

দ্বেষময়। আমার ভয়ানক ভয় কর্‌ছে—

পরশ্রীকাতরা। (খাবারের আলমারি খুলিয়া ভিতরে দেখিতে দেখিতে) কি সুন্দর একটি টাট্‌কা বড় রুই মাছ আছে।

দ্বেষময়। ওঃ আমাদের বাড়ীতে আজ মোটেই মাছ আসেনি। আমি এ মাছটা নেবই।

পরশ্রীকাতরা। দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি পিছন ফিরে থাকি। তাহলে আমি বল্‌তে পার্‌বো যে আমি তোমাকে নিতে দেখিনি।

দ্বেষময়। (আলমারির ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি মাছটি লইয়া) এস, এস, এখন যাওয়া যাক।

পরশ্রীকাতরা। চুপ, চুপ, একটুও শব্দ করোনা। আলমারির দরজাটা খুলে রেখে দাও, তাহলে বিজয়া মনে কর্‌বে যে এই মেয়েটা চুরী করেছে। (তাহারা তাড়াতাড়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল)।

ক্রমশঃ

শ্রীকুমুদিনী বসু।

পঞ্চুলাল

(তিন)

মোহন বাঁশীর গুণে পঞ্চুলালের জীবনটা সুখেই কেটে যেতে লাগ্‌লো; কেননা খাওয়া পরার ভাবনা চিন্তা মোটেই তার ছিল না। পঞ্চু ভাব্‌লো, বিয়ের বয়স হোল, এবার সেটাও সেরে ফেলা যাক। তখুনি তার মনে পড়লো, নাগকন্যার সেই পুরাণো কথা,—"ইচ্ছে করলে, এমন কি সম্রাটের মেয়েকেও তুমি বিয়ে করতে পারবে।" তবে আর ভাবনা কি! এই বার তার পরীক্ষাটা হয়ে যাবে। তা' হলে চীন সম্রাটের মেয়েকেই বিয়ে করলে ক্ষতি কি?

পঞ্চু মাকে ডেকে বল্‌লে,—আম্মা, চীন সম্রাটের দরবারে গিয়ে তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাবটা করে এসো।

মা ছেলের কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল,—পঞ্চু, তুই বল্‌ছিস্ কি! এ কথা শুন্‌লে সম্রাট যে রেগে কি কাণ্ড করে বস্‌বেন হয় তো তোকে শুদ্ধু শূলে চড়াবার হুকুম দিবেন।—বলেই মা কাঁদতে লাগ্‌লেন।

পঞ্চু বল্‌লো,—মা, সেজন্য তুমি মোটেই ভেবনা! তুমি শুধু সম্রাটের কাছে কথাটা তুলেই দেখনা কি ফল দাঁড়ায়। তার পর ব্যবস্থা যা হয় আমি করবো।

মা ভয়ে ভয়ে সম্রাটের প্রাসাদের দিকে রওনা হোল।

সম্রাটের দরবারে ঢোকা তো সহজ ব্যাপার নয়। সাত দেউড়ী পার হয়ে তবে প্রাসাদে ঢোক্‌বার পথ। তার রাস্তায় সঙ্গীন ঘাড়ে করে হাজারো গণ্ডা সৈন্য রাতদিন পাহারা দিচ্ছে। দেখেই তো বুড়ীর চক্ষু স্থির। যা' হোক, অনেক করে বুড়ী তো সেই সাত দেউড়ী পার হয়ে প্রাসাদের দরজায় এল।

প্রাসাদে ঢোক্‌বার চৌতারার সিড়িতে প্রহরীরা তো সঙ্গীন খাড়া করে বুড়ীর পথ রোধ করে জিজ্ঞাসা করলো,—বুড়ী, তুই যাচ্ছিস কোথায়?

বুড়ী রেগে উত্তর দিল,—সাত দেউড়ী পার হোলেম কেউ কিছু বল্লে না।—এখন তোদের কাছে হিসেব দিতে পারবো না।

সিপাহীরা জবাব দিল,—দেও, আর নাই দেও, ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছি না। কার সঙ্গে দেখা করবে তাগে তার পরোয়ানা আন্‌তে হবে।

বুড়ী বল্‌ল,—তোদের পরোয়ানা কি পরগণা ও সবের খোঁজ খবর আমি কিছুই রাখিনা, আমি এসেছি সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে।

সিপাহীরা ভাব্‌লো, বুড়ী নিশ্চয়ই ক্ষ্যাপা, নচেৎ সম্রাটের সঙ্গে দেখা করবার কথা বল্‌তো না। কত বড় বড় রাজা আমীর সম্রাটের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পায় না, আর এই বুড়ী হন্ হন্ করে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে ছুটেছে।

বুড়ী বাধা পেয়ে সিপাহীদের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া সুরু করে দিল।

সম্রাট প্রাসাদের উপর থেকে জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলেন, সৈন্যেরা এক বুড়ীকে চৌতারা থেকে জোর করে নীচে নামিয়ে দিচ্ছে।

সম্রাট ঈঙ্গীত করলেন, বুড়ীকে উপরে নিয়ে যেতে। সেখানে বসে তিনি মন্ত্রীদের নিয়ে পরামর্শ কচ্ছিলেন।

সৈন্যেরা বুড়ীকে উপরে নিয়ে গিয়ে সম্রাটের দরবারে দাঁড় করিয়ে দিলে।

সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন,—বুড়ি, তুমি কি চাও।

বুড়ি উত্তর দিল,—সম্রাট যদি দয়া করে অভয় দেন তবে কথাটা খুলে বলি।

সম্রাট বল্‌লেন,—বেশ, তাই দিলুম।

বুড়ী বলল,— দেখুন আপনার একটি বহুমূল্য বস্তু আছে, সেটি আমার ছেলের জন্য দিতে হবে। বহুমূল্য জিনিষটি হোল আপনার কন্যা, আমার ছেলের সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি মহারাজ।

সম্রাট ভাবলেন—বুড়ী নিশ্চয়ই কোন পাগলী—মিষ্টি কথায় একে বিদায় করাই ভাল। বুড়ীকে বল্‌লেন,—বেশ কথা, কিন্তু সম্রাটের মেয়ে বিয়ে করতে হোলে অনেক মণিমুক্তা হীরা জহরৎ যৌতুক দিতে হয়,—আগে সে সব নিয়ে এস। এমন সব মুক্তা হীরা আন্‌তে হবে যা আমার তোষাগারেও নাই। কেমন বুঝলে বুড়ী?—এইবার তবে বাড়ী যাও।

বুড়ী সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেবে এসে হন্ হন করে বাড়ীতে পৌঁছেই ছেলেকে বলল,—আমি গোড়াই বলেছিলুম, এসব পাগ্‌লামী ছেড়ে চুপ্ চুপ্ যেমন আছিস বাড়ী বসে থাক।

পঞ্চু ঘাড় গুঁজে মায়ের কাছে সকল কথা শুনে নিল, তারপর বাইরে মোহন বাঁশী বাজাতে সুরু করলে। অম্নি সেই বারোটি দৈত্য এসে কুর্ণিশ করে বলল,—

কৃষাণ কুমার, কি হুকুম।

পঞ্চু জবাব দিল,—একশ'টি সোণার থালায় এমন সব আশ্চর্য্য হীরা জহরৎ মণিমুক্তা ভরে নিয়ে এস, যা' কোন রাজার ভাণ্ডারে নাই।

খানিক বাদে একশ সোনার থালায় নানা রকম মণি মুক্তা হীরা জহরৎ এসে সেখানে হাজির হোল।

এই সব যৌতুক সাজিয়ে নিয়ে পঞ্চুর মা—পরদিন সম্রাটের দরবারে গিয়ে হাজির।

সম্রাট এত সব মণি মুক্তা দেখেই তো অবাক। সত্যি এত বড় মুক্তা জহরৎ সম্রাটের ভাণ্ডারে ছিলনা।

সম্রাট তখুনি প্রধান মন্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেলেন,—এখন উপায়? কথা তো আগেই দিয়ে ফেলেছি। এ যে এমন ঘট্‌বে তা' তো স্বপ্নেও কখনো ভাবি নাই। কিন্তু চাষার ছেলের সঙ্গে সম্রাটের মেয়ের বিয়ে—সে যে তার চেয়েও অসম্ভব ব্যাপার ঘট্‌তে চল্‌ল।

মন্ত্রী তখন বুড়ীকে ডেকে বল্‌ল,—দেখ্ বুড়ি, তোমার ছেলে যে মহাধনী, তা' আমরা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লুম, কিন্তু একটা—কথা, সম্রাটের মেয়ের থাক্‌বার প্রাসাদও তো চাই। সেই প্রাসাদটি হবে স্ফটিক পাথরের। আর এই প্রাসাদ থেকে সেই প্রাসাদে ঢোক্‌বার একটি সেতু থাক্‌বে—আগাগোড়া সোনায় তৈরী—ও তাতে মীণার কারুকার্য্য থাক্‌বে এবং সেতুর দুধারে থাক্‌বে আপেল গাছ, তাতে ফল্‌বে সোনার চক্‌চকে আপেল ফল। তা' যদি পার, তবেই তোমার ছেলের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হবে, নৈলে দুজনারই গর্দ্দান যাবে এক সঙ্গে।

বুড়ী কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী এসে ছেলেকে সকল কথা খুলে বল্‌ল।

পঞ্চু বল্‌ল,—তার জন্য ভাবনা কি মা, সব আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

দুপুর রাতে পঞ্চু কুটীরের বাইরে এসে সেই

মোহন বাঁশী বাজাতে সুরু করলো, সঙ্গে সঙ্গে সেই বারো জন দৈত্য এসে হাজির।

পঞ্চুর হুকুম হোল,—সম্রাটের মন্ত্রী যা' যা' বলেছেন, আজ রাত্রির ভিতর সেই রকম প্রাসাদ তৈরী চাই।

বারোটি দৈত্যই তখুনি চারদিকে ছুটে গিয়ে প্রচুর মাল-মসলা নিয়ে এসে অবশিষ্ট রাতটুকুর মধ্যে রাজপ্রাসাদ তৈরী শেষ করলো।

ভোর বেলা সম্রাট ঘুম থেকে জেগেই দেখে, রাজবাড়ীর সাম্‌নের সেই প্রকাণ্ড মাঠখানা জুড়ে একটি প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ তৈরী হয়েছে। আর তার নিজের প্রাসাদ থেকে সেখানে যাবার একটি চমৎকার সেতুও তৈরী করে রেখেছে, তার দু পাশে আপেল গাছের সারি, এবং তাতে হাজারো সোনার আপেল ফলেছে।

সম্রাট তখুনি মন্ত্রীদের ডেকে বল্‌লেন,—এই ছেলের সঙ্গেই রাজকুমারীর বিয়ে ঠিক হোল। বিয়ের পোষাক পত্র সব ঠিক করে নিয়ে এস। যখন কথা দিয়েছি তখন তা' করতেই হবে।

এদিকে পঞ্চু সেই বারোজন দৈত্যকে ডেকে হুকুম করলো—বিয়ের পোষাকপত্র গাড়ী ঘোড়া, বাদ্যিভাণ্ড, টোপর, মালা লোকজন সব এখুনি চাই।

বল্‌তে না-বল্‌তে সব প্রস্তুত। পঞ্চু রাজপুত্রের মত সেজে বাদ্যি ভাণ্ড বাজিয়ে চতুর্দ্দোলায় চড়ে রাজ বাড়ীতে বিয়ে করতে চল্‌ল। তার সাম্‌নে পিছনে মশাল জ্বালিয়ে হাজারো লোক চলেছে।

রাজকুমারীকে নানা অলঙ্কার পত্রে সাজিয়ে মুখে গোলাপরেণু আর চুলে ফুলের বিনুনী গড়ে, টুকটুকে টাট্‌কা গন্ধরাজ ফুলটির মত করে বিয়ের সভায় এনে হাজির করলো।

তার পর কৃষাণ কুমার পঞ্চু আর রাজকুমারী চন্দ্রা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বিয়ের মন্ত্র পাঠ করলো।

সম্রাট এই বিয়েতে মেয়ে জামাই উভয়কে খুব যৌতুক দিলেন এবং নূতন প্রাসাদটি তাদের থাক্‌বার জন্য সাজিয়ে দিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন

'আকাঙ্ক্ষা'

যখন আমি বড় হব, কি কোর্‌ব ভাই?
পৃথিবী ভ্রমণকারী হতে আমি চাই।
এখন যে সব কথা পড়ি মন দিয়ে,
চোখের সমুখে তাহা দেখিব দাঁড়ায়ে।
ভ্রমণ করিতে কিন্তু চাই বহু টাকা,
কেমনে পাইব, মোর থলিয়া যে ফাঁকা!?
থাকিতে স্বদেশ ছেড়ে, নাহি চাহে মন,
থাক্ ভাই কাজ নাই করিয়া ভ্রমণ।

যখন আমি বড় হব, কি কর্‌ব ভাই?
ভাল ভাল বই আমি লিখিবারে চাই।
শৈশব কালের মোর সহপাঠিগণ,
পড়িবে আমার লেখা বই, দিয়া মন।
ভাবিবে তাদের সেই বন্ধু নগণ্য,
কেমনে হইল আজ পৃথিবীতে মান্য?
কিন্তু লিখিতে আমি পারি না যে ভাই;
লেখক হওয়াও মোর হলনাক তাই।

যখন আমি বড় হব, কি কোর্‌ব ভাই ?
সিদ্ধহস্ত চিত্রকর হতে আমি চাই।
নিপুণ আমার সেই তুলিকার টানে,
স্বপনপুরীর চিত্র ফুটিবেক প্রাণে।
পৃথিবী বিদিত হবে আমার সম্মান।
কিন্তু ভাই, ছবি আঁকা ঈশ্বরের দান,
মোরে বিধি সেই দান দেননি কো ভাই;
চিত্রকর হওয়া মোর হ'লনাক তাই।

যখন আমি বড় হব, কি করব ভাই ?
তানসেন গায়ক আমি হইবারে চাই।
সুমিষ্ট আমার স্বরে দেশবাসীগণ,
আসিবে আমারে ঘিরি বিমুগ্ধিত মন।
পশুপক্ষী ক্ষুদ্র কীট সকলে মিলিয়া,
শুনিতে আমার গান আসিবে ঘিরিয়া।
করিতে সঙ্গীত কিন্তু পারিনাক ভাই,
গায়ক হওয়াও মোর হ'লনাক তাই।

যখন আমি বড় হব, কি কোর্‌ব ভাই ?
বড় বৈজ্ঞানিক আমি হইবারে চাই।
আসিবে দেখিতে মোরে পৃথিবীর লোকে,
এত বড় বৈজ্ঞানিক দেখেনিকো চোখে।
বঙ্গবালকের দেখি বুদ্ধি অতুলন,
ফিরিয়া যাইবে সবে চমকৃত মন।
কিন্তু হায়! আমার সে বুদ্ধি নাই ভাই,
বৈজ্ঞানিক হওয়া মোর হবে নাকো তাই।

বড় কিছু হওয়া মোর হবেনাকো ভাই
আমি কিন্তু জানি, আমি কি করতে চাই ?
নাহি চাহি যশ আমি, নাহি চাহি ধন,
পৃথিবী বিদিত হতে নাহি চাহে মন।
"বড়লোক" হতে আমি চাহিনা জীবনে
মুছায়ে দুখীর অশ্রু সুখ হবে মনে।
থাকিব শান্তিতে আমি স্বদেশের বুকে,
মরণে তাঁহার কোলে ঘুমাইব সুখে।
এই আশা পূর্ণ যদি কর ভগবান!
সন্তুষ্ট হইবে মন জুড়াইবে প্রাণ।

লীলা দেবী।

নবীন জীবন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

অমর যতই বড় হইতে লাগিল ততই তাহার জানিতে ইচ্ছা হইত ডাকাতরা রোজ কোথায় যায়। সে তাহাদের কত বলিত যে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যায় কিন্তু তাহারা বলিত "চুপ কর, নিজের কাজ করে যা, আর একদিন তোকে বাইরে নিয়ে যাব।" একদিন তাহারা কোথায় ডাকাতি করিতে গিয়াছে। বুড়ী এখন আর চোখে তেমন ভাল দেখিতে পায় না। সে প্রায়ই নাক ডাকাইয়া ঘুমাইত, না হয় ঘরের এক কোনে বসিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিত। এই বুড়ী ছিল অমরের সঙ্গী।

একদিন বুড়ী গভীর নিদ্রায় মগ্ন, দস্যুরা কেহ ঘরে নাই। অমর তখন সাহস করিয়া

একটী মশাল জ্বালিল আর অন্ধকার পথ দিয়া চলিল। সেই পথ দিয়াই ডাকাতদিগকে বাহিরে যাইতে সে দেখিত। সে চলিতে চলিতে একটা লোহার দরজার নিকট পৌঁছিল। সে সেই দরজা কিছুতেই খুলিতে পারিল না, তাহা তালাচাবি দিয়া বন্ধ ছিল। তখন সে অত্যন্ত দুঃখিত মনে ফিরিতে লাগিল। সে দেখিতে পাইল দুইধারে আরও অনেক সরু সরু পথ রহিয়াছে। সে একটা সরু পথ ধরিয়া চলিল। কিছু দূর যাইবার পর তাহার মশালটী নিবিয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ সে দেখিল, যে দূরে যেন আলো দেখা যাইতেছে। অবাক হইয়া সে সেই দিকে চলিল।

সেই লাল আলোটা ক্রমে যেন বড় হইতে লাগিল, শেষে সে মনে করিল যে আলোটা ক্রমেই বড় হইয়া তাহার সম্মুখে যেন আলোর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে তবু সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিল শেষে সে দুই পাথরের মধ্যে একটা ফাঁকা যায়গায় পৌঁছিল, যেখানে ভোরের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। সেই ফাঁক দিয়া সে এক লাফে বাহিরে আসিয়া পড়িল।

সে যখন সেই অন্ধকার রাজ্য হইতে আলোর রাজ্যে আসিল তখন যে তাহার কি আনন্দই হইল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। সে সর্ব্ব প্রথম উন্মুক্ত নীল আকাশের তলায় দাঁড়াইল। সে সুন্দর দেশটী জঙ্গলে ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা।

তখন বসন্তকাল, সকাল বেলায় মৃদু মন্দ বায়ু বহিতেছিল, সূর্য্যের আলোকে গাছপালা ইত্যাদি ঝলমল করিতেছিল। জমিগুলি শস্যে ঢাকা, সবুজ ঘাসে মাঠ আচ্ছাদিত, নানাবর্ণের ফুল ফুটিয়া স্থানটীকে সুগন্ধে পূর্ণ করিয়াছে। পাখীর কোমল কণ্ঠের মিষ্ট সঙ্গীত শুনা যাইতেছে পাহাড়ের নীচে একটী হ্রদ ছিল। হ্রদে আকাশের গোলাপী রং আর পাহাড়ের সবুজ চূড়ার রং স্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়াছে।

বজ্র পড়িলে লোকে যেমন হতভম্ব হইয়া যায়, বালকটীর অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছিল। সে এক নূতন রাজ্য দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। তাহার মনে হইল যেন সে বহুকালের নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে। সে মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিতে লাগিল। সে শুধু প্রাণ ভরিয়া প্রকৃতিরাণীর সৌন্দর্য্য দুই চক্ষু দিয়া দেখিতে লাগিল—তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে সে চীৎকার করিয়া উঠিল "আমি কোথায় এসেছি, চারিদিকের সব জিনিষই কি বিরাট! সব জিনিষ কি সুন্দর।" প্রকাণ্ড পাথর ও পাহাড়ের উপর বড় বড় গাছ, হ্রদ ও সুন্দর গোলাপ ফুল দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

সূর্য্য ক্রমে পাহাড়ের অনেক উপরে উঠিল তাহার চারিদিকে সোনালি রংয়ের মেঘ। বালকটী বিস্মিত নয়নে সূর্য্যের দিকে তাকাইল। তাহার মনে হইল উপরে আগুন জ্বলিতেছে এবং মেঘগুলিও যেন জ্বলিতেছে। সে একদৃষ্টে সূর্য্য দেখিতেছিল তাহার মনে হইল যেন একটা পাতলা ওড়না সোনার রংয়ের গোলাকার সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিল। সে তখন তাহার দুই বাহু প্রসারিত করিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "ওটা কি? কি আশ্চর্য্য আলো!" সূর্য্যের দিকে অতক্ষণ তাকাইয়া থাকাতে তাহার চক্ষু ঝলসিয়া যাওয়াতে সে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইল।

সে কিছুদূর চলিল কিন্তু তাহার ভয়

হইতে লাগিল যে চারিদিকে ফুলের গাছের ছড়াছড়ি, সে বুঝি এমন সুন্দর ফুলগুলিকে পদদলিত করিয়া দিবে। হঠাৎ সে দেখিল একটা ভেড়ার বাচ্চা গোলাপ গাছের তলায় শুইয়া আছে। সে তখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল "বা! কি সুন্দর ভেড়ার বাচ্চা!" সে তাহার নিকট যাইয়া তাহার গলাটী জড়াইয়া ধরিল। ভেড়ার বাচ্চাটী উঠিয়া দাঁড়াইয়া যখন ডাকিতে লাগিল তাহার তখন ভয় হইল। সে বলিল "বাঃ এটা বেঁচে আছে! এ চলতে পারে আবার এ ডাকতেও পারে। আমার কাছে যে কাঠের ভেড়া ছিল সে বোবা, অচল, মরা! কি আশ্চর্য্য! কে ওর মধ্যে প্রাণ দিলেন?" সে ভেড়ার বাচ্চার সঙ্গে কথা বলিতে চেষ্টা করিল। সে তাহাকে কত কি জিজ্ঞাসা করিল বাচ্চাটী ত আর মানুষের মত কথা বলিতে পারে না, সে শুধু ডাকিতেই লাগিল, ইহাতে সে বিরক্ত হইল।

অল্পক্ষণ পরেই একটী সুশ্রী স্বাস্থ্যবান রাখাল সেখানে উপস্থিত হইল। ভেড়ার বাচ্চাটীর সন্ধানে সে ঘুরিতে ঘুরিতে ওখানে আসিল। সে বালকটীর দিকে এক দৃষ্টে কতক্ষণ তাকাইয়া রহিল। কিন্তু বুঝিতে পারিল না এ কে। রাখাল তাহার দিকে ও রকম ভাবে তাকাইয়া আছে দেখিয়া প্রথমে ভয় পাইল কিন্তু যখন রাখাল তাহার সঙ্গে বেশ কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল তখন সে বলিল "ও! তুমি কেমন সুন্দর দেখতে।" সে আকাশ ও পৃথিবী দেখাইয়া বলিল "আচ্ছা, এই যে প্রকাণ্ড গুহা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি তোমার? তোমার ও এই ভেড়ার বাচ্চাটার সঙ্গে কি আমি থাকতে পারি না?"

রাখাল অমরের কথা শুনিয়া মনে করিল বালকটী বুঝি হাবা। রাখাল জিজ্ঞাসা করিল সে এখানে কেমন করিয়া আসিল। যখন অমর বলিল যে সে মাটীর নীচ হইতে আসিয়াছে ও সেই বুড়ি দিদিমা ও ডাকাতদের কথা বলিল তখন রাখাল অবাক হইয়া গেল ও কোথা হইতে অজ্ঞাত ভয় আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিল। সে তখন বালকটীর হাত ধরিয়া ও আর এক বগলে ভেড়ার বাচ্চাটী লইয়া দৌড়িয়া চলিল পাছে বা ডাকাতরা আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়!

৬

পাহাড়ে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাঁহার বয়স ৮০ বছরের বেশী তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মভাবের জন্য সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। রাখাল মনে করিল যে অমরকে সেই সন্ন্যাসীর কাছে লইয়া যাইবে। সন্ন্যাসীর আশ্রম পাহাড়ের পাশে হ্রদের ধারে—স্থানটী স্বর্গতুল্য রমণীয়। কুটীরটীর চারি ধারে ফুলের ও ফলের বাগান। পশ্চাতে একটী ধানের ক্ষেত—পাহাড়ের মধ্যে সমতল ভূমিতে অনেক আম গাছ হ্রদের এক পাশে একটী পাহাড় আসিয়া পড়িয়াছে তাহার উপর একটী শুভ্র সুন্দর মন্দির; পাহাড়ের গায়ে অনেক ধাপ সিঁড়ি পার হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়।

রাখাল যখন আশ্রমের সীমানায় প্রবেশ করিল, দেখিল যে সন্ন্যাসী একটী আম গাছ তলায় বসিয়া আছেন, সে স্থান হইতে হ্রদটী সুন্দর দেখাইতেছে। তাঁহার সম্মুখে একখানি প্রকাণ্ড বই খোলা রহিয়াছে। তাঁহার মাথ চুল ও দাড়ী পাকিয়া গিয়াছে কিন্তু শরীর হৃষ্টপুষ্ট।

তিনি সস্নেহে দুইজনকে তাঁহার নিকটে ডাকিলেন এবং রাখালের বক্তব্য মন দিয়া শুনিলেন। তিনি অমরকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন ও সাদরে কোলে বসাইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে কোন ধনীর ঘর হইতে এই সন্তানটীকে চুরি করিয়া কেহ লইয়া আসিয়াছে।

তিনি রাখালকে বলিলেন "এ বালকটীকে আমার কাছে রেখে যাও। এর সম্বন্ধে সম্প্রতি কারুর কাছে কিছু বলো না। আমি আশা করি এর বাপ মার সন্ধান পাওয়া যাবে। ডাকাতরা আমার বাড়ীর কাছে আসে না কারণ এখানে ত সোনা রূপা নাই, আর সোনা রূপার চেয়েও মূল্যবান ঈশ্বরের কথা ও সদপ্রসঙ্গ তারা ঘৃণা করে; কাজেই বালকটি এখানে নিরাপদে থাকবে।"

তারপর তিমি অমরকে বলিলেন "দেখ, তোমার কোন ভয় নাই। তোমার মা বাবার কাছে যতদিন তোমায় ফিরিয়ে না দিতে পারি, ততদিন আমি তোমার দাদামশায় হলাম। আমাকে দাদামশায় বলে ডেকো।"

সন্ন্যাসী দুইজনকে দুধ, ফল ও চিড়া খাইতে দিলেন। রাখাল রওনা হইল কিন্তু অমরের ইচ্ছা ছিলনা যে সে চলিয়া যায়। সে

উহার কাপড় ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।' রাখাল তখন বলিল যে সে আবার শীঘ্র আসিবে ও তাহাকে সেই ভেড়ার বাচ্চাটি দিল। তখন সে শান্ত হইল ও নতুন উপহারটী পাইয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না।

রাখাল চলিয়া গেলে সন্ন্যাসী বালকটীকে তাঁহার পাশে বসাইয়া তাহার সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন "তুমি কি তোমার মা বাবার সম্বন্ধে কিছুই জাননা?"

অমর বলিল "হাঁ জানি। আমার জামার পকেটে মার সুন্দর ছবি আছে। দেখুন! তাই বুড়ী আমায় বলেছে—আমার ত মাকে মনে নাই।" সে পকেট হইতে ছোট ছবিটি বাহির করিল, সেটি একটী লাল মখমলের বাক্সের মধ্যে ছিল। বেচারা কখনো ঐ ছবিটী সূর্য্যের আলোয় দেখে নহে। সে ওই ছবির সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল—ছবির চারিপাশে যে হীরা মনি মুক্তা ছিল তাহা জলজল করিতে লাগিল।

তখন সে বলিল "এই আলোতে এগুলি কি সুন্দর দেখাচ্ছে? আচ্ছা আমায় বলতে পারেন কে অত উঁচুতে এমন সুন্দর সোনার রংয়ের প্রকাণ্ড বাতিটি জ্বালিয়েছেন? এর আলো এত উজ্জ্বল যে এর দিকে তাকাতে পারিনা। আমি যে গুহার মধ্যে থাকতাম, সেখানকার আলো এত মিটমিটে, অস্পষ্ট, ছিল। কেমন করে এ আলোটা ক্রমে ক্রমে উপরে উঠে? আমি যখন প্রথমে দেখলাম তখন এটা ঐ গাছের পিছনে ছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে এটা এত উঁচুতে উঠে গেছে যে সবচেয়ে প্রকাণ্ড উঁচু গাছের উপর উঠলেও এটা ধরতে পারবনা। এটা কেমন করে ঝুলছে আবার উপরে উঠছে? আমি ত কোন সুতা দেখছিনা! কি করে এটা উপরে ও নীচে চলে বেড়ায়? কে এ বাতিতে তেল ভরে দেয়?"

সন্ন্যাসী বললেন, "এই বড় আলো-টাকে সূর্য্য বলে; আর এ কত হাজার হাজার বছর ধরে নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়ে উঠা নামা করছে ও করবে, তা কে বলতে পারে? আর এটা যে জ্বলছে এতে তেলের দরকার হয় না।

অমর বলিল "আমি এসব বুঝতে পারছি না। আপনার ঘরের কাছে কি সুন্দর সব ফল। আঃ কে এমন সুন্দর করে ফুল কে নানা রংয়ে সাজিয়েছে—লাল, হলদে, নীল! আর পাতা-গুলিকে সমান করে কে কেটেছে? পাতাগুলি কিসের তৈরী?

আপনি কি এই সব ফুল পাতা তৈরী করেছেন? এ সব তৈরী করতে নিশ্চয় আপনার অনেক সময় লেগেছে। কতগুলি ফুলের মধ্যে যে সরু চুলের মত ডাঁটা দেখা যায় ওগুলি কাটবার জন্য প্রখর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শক্তিও চাই। আমি ফল তৈরী করেছি কিন্তু সেগুলিএমন সুন্দর ত নয়।"

সন্ন্যাসী বলিলেন কোন মানুষে এমন ফুল তৈয়ারী করতে পারে না। এসব ফুল মাটীর তলা হইতে নিজেই বাহির হয়েছে।"

অমর বলিল "কিন্তু আমার ইহা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। তা হতে পারেনা। আপনি এগুলি তৈরী করেছেন সেটা বরং বেশী বিশ্বাস যোগ্য।"

তিনি সূর্য্যমুখী ফুলের ভিতরের কাল জিনিষটা বাহির করিয়া তাহা হইতে বিচির মত বাহির করিয়া বলিলেন যে, এই অসংখ্য বীজ হইতে এক একটা আবার মাটীতে পুতিয়া দিলে অসংখ্য গাছ হইবে এবং এই রকম সব

গাছই বীজ হইতে হইয়াছে।" অমর অবাক হইয়া সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর বলিল "তা হলে এই বীজগুলি তৈরী করতে সোনার ঘড়ি তৈরী করার চেয়েও বেশী কষ্ট করতে হয়েছে।"

সন্ন্যাসী বলিলেন "এ কথা সত্য।"

অমর বলিল "কিন্তু কে এসব তৈরী করেছেন? এই ফুল তৈরী করার চেয়ে এই বীজগুলি তৈরী করা বেশী কঠিন।"

অমর আবার ফুলগুলি দেখিতে লাগিল। সমস্ত বাগানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানাফুল দেখিতে লাগিল। এমন সময় তাহার বড় গরম লাগিল, সে বলিল "এ আলোটা এত উঁচুতে তবু এখানে এত গরম লাগে! এ আলোটা কি আশ্চর্য্য জিনিষ!":

সন্ন্যাসী তখন তাহাকে একটা গাছের তলায় ছায়ায় বসাইলেন। অমর তখন সেই প্রকাণ্ড গাছের অসংখ্য পাতার দিকে চাহিয়া বলিল "কিন্তু, কে এসব তৈরী করেছেন?

ক্রমশঃ

সিংহ ও ইঁদুর

বনের রাজা সিংহ ঘুমাচ্ছিল।

শেয়াল আস্তে আস্তে অন্য জন্তুদের সাবধান করে বলল—"আঃ তোমরা সব একটুও শব্দ করো না। ধীরে ধীরে চলাফেরা কর। এমন অসময়ে রাজার ঘুম ভাঙালে শেষে কি কপালে আছে কে জানে।"

বাঁদরী তার বাচ্চাদের সাবধান করে বলল, "দেখ্, যে গাছের তলায় রাজা ঘুমাচ্ছেন সে গাছে কখনও চড়িস্ না। যদি কেউ একটা গাছের পাতা ওঁর গায়ের উপর ফেলিস্, কি গাছের ডাল ওঁর গায়ের উপর নড়াস, তবেই ওঁর ঘুম ভেঙে যাবে। আর যে ঐ কাজটি করবে তাকে আর বাঁচতে হবে না।"

রাজার পায়ের কাছে একটা বাদাম পড়েছিল। বাঁদরের বাচ্চা আবদার করে বলে উঠল—"ওমা, দেখ, রাজার পায়ের কাছে কি সুন্দর বড় বাদামটা পড়ে আছে। রাজা ত আর বাদাম খান না। আমি আস্তে আস্তে গিয়ে পায়ের কাছ থেকে ওই বাদামটা নিয়ে আসি, কেমন! রাজা কিছু টের পাবেন না।"

মা চেঁচিয়ে বলে উঠল—"তুই কি পাগল হয়েছিস? তুই কি বেঁচে থাকতে চাস না, এখনি মরতে চাস? গাছে গাছে বেড়িয়ে বেড়িয়ে হয়রাণ হয়েছিস্? আর তোর ভাইদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে ইচ্ছা করে না? বোকা শিশু ছাড়া আর কে ঘুমন্ত সিংহের কাছে যেতে সাহস করবে? গাছে ত কত বাদাম রয়েছে তা খেলেই ত হয়। তা, না, ওই যে বাদামটা একটা বিপদজ্জনক যায়গায় রয়েছে ওটাই নেওয়া চাই।"

হঠাৎ বাঁদরী তার বুকনি থামিয়ে, পাতা সরিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে নীচের দিকে দেখতে লাগল। সে বলে উঠল—"আঃ দেখছিস্, একটা ইঁদুর ঐ বাদামটা খেতে চায়,

সে সিংহের কাছে আসছে। তার ত মা নেই যে তাকে এখানে মরতে আসতে বারণ করবে! আঃ, এখনি ওটা মরবে দেখছি।"

রাজার খুব কাছে ওই ইঁদুরটা এল। বাঁদরটা চেঁচিয়ে তাকে সাবধান করে দিল, কিন্তু সে তা শুনল না। যেই ইঁদুরটা বাদামটা ধরেছে আর সিংহের ঘুম ভেঙে গেল, সে হাই তুলল আর চোখ খুলল।

বাঁদর-বাচ্চাটা বলল—"ভাই ইঁদুর, শীগ্‌গির পালা, এক দৌড় দে।" সিংহের অত বড় লাল হাঁ দেখে ইঁদুর বেচারা ভয়ে আর এক পা চলতে পারল না, চলবার শক্তি তার চলে গিয়েছিল।

সে ত খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল—"মহারাজ দয়া করে আমায় যেতে দিন। আমি আপনার কোন ক্ষতি করতে আসি নাই।"

ইঁদুরের কথা শুনে সিংহের ভারী আমোদ লাগল। সে গম্ভীর হয়ে বলল—"আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি। তবে তোমার মত এমন মস্ত জানোয়ারকে বনের মধ্যে ছেড়ে দি কি করে? তুমি তা হ'লে না জানি কত হাতিই খেয়ে ফেলবে? আর ক'টা নেকড়ে বাঘই বা শিকার করে এনে নিজের পরিবারদের খাওয়াবে।"

ইঁদুর দেখল যে রাজা দেখছি তার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করছে। তা'তে তার একটু সাহস হ'ল আর একটু বুদ্ধিও যোগাল। সে বলল—"মহারাজ আমায় ছেড়ে দিন। আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি আমার যথাসাধ্য আপনার ঐ দয়ার প্রতিদান নিশ্চয় দেব।"

সিংহ হাই তুলে বলল—"আমার ত মনে হয় না তুমি আবার আমায় সাহায্য করতে পারবে। আমি হলাম রাজা। হাতীরা পর্য্যন্ত আমার কথা শুনে চলে। আমার সাহায্যের দরকার হলে, একবার ডাকলে তখনি সব জন্তুরা যে যেখানে থাকুক, আমার কাজ করতে ছুটে আসবে। যাক্—এবার তোমায় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধান থেকো—যদিও তুমি এত ছোট্ট তবু ত বেঁচে থাকতে চাও,—না?"

বেচারা ইঁদুর আস্তে আস্তে তার গর্ত্তে ফিরে গেল। সিংহ একবার গা মোচড় দিয়ে আবার ভাল করে শুল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখে কি এক জালের মধ্যে সে জড়িয়ে গেছে। সিংহ তখন রাগে গর্জ্জনের পর গর্জ্জনে বনকে কাঁপিয়ে তুলল। জাল থেকে উদ্ধার পাবার জন্য যত চেষ্টা করতে লাগল তত আরও তাতে জড়িয়ে যেতে লাগল। যদিও সে জালে বাঁধা পড়েছিল, তবুও তার বিক্রম দেখে শিকারীরা মনে করল, যদি সে কোনরকমে জাল ছিঁড়ে পালিয়ে যায়। তাই তারা আরও লোকজন ডাকতে গেল।

সিংহ তখন চেঁচিয়ে বলতে লাগল—"হাতী গেল কোথায়? সে এই জালটা ছিঁড়ে দেবে নিশ্চয়। তাকে এখনি ডাক।"

সেই বনের সব জন্তুর কাছে এর মধ্যে সিংহের দুরবস্থার সংবাদ পৌঁছে গেল। সকলেই খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল। "আঃ রাজা বন্দী হয়েছেন? তিনি আর নিজেকে মুক্ত করতে পারছেন না, এ কথা কি সত্যি? তবে ত দেখছি আর কাহাকেও রাজা করতে হবে।"

আকারে ও শক্তিতে হাতী সবার চেয়ে বড় বলে তার অনেক কাল থেকেই মনে মনে ইচ্ছা ছিল যে সে বনের রাজা হবে। সেজন্য সে বলে পাঠাল যে সিংহ যেন তাকে ক্ষমা করেন, সে তাঁকে সাহায্য করতে যেতে পারবে না।

রাজা তখন বললেন—"শেয়াল কোথায়? গায়ের জোরের চেয়ে বুদ্ধি আর কৌশল অনেক সময় বেশী কাজে লাগে। তাকে এখনি আসতে বল।"

এদিকে বনে জন্তুদের এক মস্ত সভা বসেছে। শিয়াল তখন সকলকে বোঝাচ্ছিল যে, তাকে এবার যেন মন্ত্রী করা হয়। সে লোক দিয়ে বলে পাঠাল যে, সে রাজার কোন সাহায্য করতে পারবে না, সেজন্য সে দুঃখিত। আরও বলল যে, রাজা যে সতর্ক হন নাই, এ তাঁর বোকামি ছাড়া আর কিছু না। রাজার যদি একজন বুদ্ধিমান পরামর্শদাতা থাকত, তাহ'লে রাজার আর এমন দশা হত না।

সিংহ জালে বাঁধা পড়ে রইল, কিন্তু মনটা তখনও তার দমে যায় নাই। সে তখন ভাল্লুককে ডেকে বলল—"ভাই ভাল্লুক, তোমার ধারাল শক্ত নখ দিয়ে এ দড়িটা কেটে ফেল। এই দড়ি দিয়ে তোমার রাজাকে বেঁধে ফেলেছে, তোমার রাগ হচ্ছে না?"

ভাল্লুক বলল—"আমি এখন একাজ করতে পারব না। আমি এখনি শুনলাম ওই গাছটায় একটা মস্ত চাক রয়েছে, সেটা মধুতে ভরা, আমি সেখানে যাচ্ছি—সময় নষ্ট করতে পারি না।"

সিংহ তখন শকুনিকে ডেকে বলল "দেখ, তোমার শক্ত নখ দিয়ে এ জালটা ছিঁড়ে দাও।" শকুনি এত উঁচুতে উড়ছিল সে সিংহের কথা গ্রাহ্যও করল না।

তখন নিরাশ হয়ে সিংহ চীৎকার করে বলে উঠল—"আমার এত প্রজা থাকতে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে কেউ সাহায্য করতে আসবে না?"

এমন সময় সেই ছোট্ট ইঁদুরটা এসে বলল—"মহারাজ, আমি আপনার সাহায্যের জন্য এসেছি। যখন শিকারীরা জালটা আপনার উপরে দিল, তখনই বিপদ দেখে, আমার বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে আনতে গিয়েছিলাম। আর কোন ভয় নাই। দেখুন না, এখনি আপনাকে মুক্ত করে দিচ্ছি।"

এই বলেই সব ইঁদুররা মিলে সেই জালটা দাঁত দিয়ে কাটতে লাগল। শেষে জালের দড়ি-গুলা এমন আলগা হয়ে গেল যে, সিংহ অনায়াসেই দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ল। সে তখন ইঁদুরকে বলল—"তোমরা যদিও এত ছোট কিন্তু তোমরা আমার যা উপকার করলে!"

ইঁদুরটি বলল—"না মহারাজ, শুধু আমার ঋণ শোধ করলাম। আমি এত ছোট হয়ে যে আপনার কাজে লাগলাম সেজন্য আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।"

সিংহ বলল—"আচ্ছা, এখন তবে যাই। এ বনের রাজা তোমাকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছে আর আজ থেকে তোমার বন্ধু হ'ল। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। আর এই শিক্ষা দিলে যে, দেহের বল আর চতুরতার চেয়ে কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসা বেশী শক্তিশালী। অসময়ে যে বন্ধুত্ব দেখায় সেই-ই প্রকৃত বন্ধু। বিপদের সময়, শুধু তুমি আমায় ত্যাগ কর নাই। আমি আমার এই ছোট্ট বন্ধুটিকে জীবনে ভুলব না।"

ছোট শিশুর দুইকাঠির মোজা

দুই আউন্স সাদা উল এবং সরু হাড়ের অথবা মাঝারী রকমের ৪টি মোজা বুনিবার কাঁটা লও। উল যদি মোটা অর্থাৎ বার্লিন হয় তবে চিরিয়া লও, শেটল্যাণ্ড হইলে চিরিবার দরকার নাই।

দুই কাঁটা দিয়া ৩৬টি ঘর একটী কাঁটায় তুলিয়া লও। ৬ লাইন রিব অর্থাৎ ২ ঘর সোজা এবং দুই ঘর উল্টা বোন। এখন প্যাটার্ণ আরম্ভ। নানারূপ প্যাটার্ণ দেওয়া যায়, সহজ হইবে বলিয়া ডায়মণ্ড প্যাটার্ণ দেওয়া হইল।

৮ম লাইন সোজা। ৯ম লাইন উল্টা। ১০ম

লাইন—দুইটি একসঙ্গে জোড়া—১১ লাইন একটি সোজা আর পড়া ঘরটি তুলিয়া লও। এইরূপে এই ৪ লাইনের মত ৬ বার বুনিতে হইবে।

এখন ফিতা পরাইবার জন্য প্রথমটি সোজা বুনিয়া, ৩৪টি ঘর সামনে সূতা দুইটি একসঙ্গে জোড়া বুনিয়া লও এবং শেষ ১টি সোজা বুন।

পা আরম্ভ কর—এই ৩৬টি ঘরকে ৩ ভাগে ভাগ করিয়া দুই পাশের ১৩টি করিয়া ঘর দুটি আলাদা কাটায় রাখিয়া দাও, মধ্যে ১০টি ঘর লইয়া পায়ের পাতা আরম্ভ কর—২য় লাইন সোজা, ২য় লাইন উল্টা, ৩য় লাইন ২ইটি একসঙ্গে জোড়া এবং ৪র্থ লাইন—একটি সোজা ও পড়া ঘরটি তুলিয়া লও। এইরূপে ডায়মণ্ড প্যাটার্ণ ৪ বার কর। এখন সোজা এক লাইন। ২য় লাইন উল্টা, ৩য় লাইনে প্রথম ২টি ঘর একসঙ্গে জোড়া বুনিয়া বাকি গুলি সোজা বুনিয়া শেষ ২টি ঘর আবার একসঙ্গে জোড়া বুন। ইহাতে এখন কাঁটায় ৮টি ঘর রহিল। ৪র্থ লাইন উল্টা বুনিয়া উল ছিড়িয়া ফেল।

এখন পায়ের তলার দিক হইবে। ডানপাশে যে কাঁটায় ১৩টি ঘর রাখিয়াছিলে তাহা সোজা বুনিয়া, যে পায়ের পাতা বুনিয়াছিলে তাহার পাশ হইতে ১০টি ঘর তুলিয়া লও এবং মধ্যের কাঁটার ৮টি ঘর হইতে ৪টি এই কাঁটায় তুলিয়া লও অর্থাৎ সর্ব্ব শুদ্ধ এই কাটায় ২৭টি ঘর হইল। এখন মধ্যের কাটায় ৪টি ঘর রহিল, তাহা সোজা বুনিয়া পায়ের পাতার আর এক পাশের দিক হইতে ১০টি ঘর বুনিয়া উঠাইয়া লও এবং বাঁ দিকে কাটায় যে ১৩টি ঘর আছে তাহাও বুনিয়া এই কাটায় উঠাইয়া লও। ইহাতে এই কাটায় ও ২৭টি ঘর হইল, সর্ব্বশুদ্ধ ৫৪টি ঘর হইল। এখন ৩টি কাটায় বুনিতে হইবে।

১ম লাইন সোজা—২৩টি ঘর, ১টি বাড়াও (একটি ঘরের পাশ হইতে আর একটি তুলিয়া) ৮ সোজা, একটি বাড়াও, ২৩টি সোজা।

৩ লাইন সোজা বুন।

৫ম লাইন—২৪ সোজা, ১ বাড়াও, সোজা ৮ ঘর, ১ বাড়াও, ২৪ সোজা—৩ লাইন সোজা বুন।

৯ম লাইন সোজা—২৫, ১ বাড়াও, সোজা ৮ ঘর, ১ বাড়াও, সোজা ২৫ ঘর।

৩ লাইন সোজা বুন।

১১ লাইন সোজা—২৬, বাড়াও ১, সোজা ৮, বাড়াও ১, সোজা ২৬ ঘর।

৩ লাইন সোজা বুন।

১৫ লাইন—১ তুলিয়া সোজা ১, জোড়া ১ (একসঙ্গে ২টি সোজা বোন) সোজা ২৫, জোড়া ১, সোজা ২, জোড়া ১, সোজা ২৪, জোড়া ১, ২ সোজা।

১৬ লাইন—সোজা

১৭ লাইন—১ তুলিয়া সোজা ১, জো ১, সোজা ২১, জো ৪ বার, সো ২২, জো ১, সোজা ২১, জো ১, সোজা ২।

এখন সব ঘর গুলি বন্ধ কর। মোজা উল্টাইয়া লইয়া দুই পাশ সমান করিয়া রাখিয়া, তলার দিক হইতে উপর পর্য্যন্ত সব, ঐ উল ছুঁচে পরাইয়া, জোড়া সেলাই করিয়া দাও। ফিতা পরাইবার জন্য যে এক লাইন ছেঁদা ছেঁদা আছে তাহাতে রিবন পারাইয়া দাও।

শ্রীশৈলজা চক্রবর্ত্তী

বালিকার রচনা

ভালুকে রাজপুত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাজপুত্র বল্‌ল—"লীলা আমাকে দেখে আশ্চর্য্য হয়োনা। আমি এক দিন মৃগয়া করতে এই বনে এসে ডাইনির মন্ত্রে ভালুক হয়েছিলাম। তুমি আজ আমাকে উদ্ধার করলে। আমার মত আরও অনেক রাজপুত্রকে ডাইনি যাদু করে রেখেছে। চল তাদের গায়ে এই জল ছিটিয়ে দিই।" এই বলে রাজপুত্র লীলার হাত ধরে একটি ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল। সেই ঘরে কত রকমের যে জানোয়ার আছে তার ইয়াত্তা নাই। লীলা আর রাজপুত্র যেয়ে তাদের গায়ে জল ছিটিয়ে দিল। জল ছিটান মাত্রই লীলা দেখল যে জানোয়ারগুলির বদলে অনেক রাজপুত্র দাঁড়িয়ে আছে। তারা লীলাকে তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে যে যার দেশে চলে গেল। লীলা আর রাজপুত্র তখন লীলাদের দেশে সদাগরের উদ্দেশে রওনা হোল।'

৫

এদিকে সদাগর লীলার খোঁজে তার ভেলা ভাসিয়ে দিয়েছে। ভেলা ভেসে চলেছে। সদাগর কত দেশেই যে লীলার খোঁজ করল কিন্তু লীলাকে কোথায় খুঁজে পেল না। তখন সে মনের দুঃখে তার দেশে ফিরে এ'ল। ফিরে এসে সে তার বাড়ীতে যেয়ে দেখে লীলা আর একটি রাজপুত্র সেখানে বসে কেমন করে তাকে ফিরে পাবে সেই বিষয়ে কথা বল্‌ছে। আর চ'খের জলে লীলার বুক ভেসে যাচ্ছে। এমন সময় সদাগর সেখানে উপস্থিত হ'ল। লীলা বাবা! বাবা ব'লে সদাগরের কোলে ঝাপিয়ে পড়ল। সদাগরও তাকে বুকে চেপে ধর্‌ল। আনন্দে তিন জনের চোখই জলে ভরে উঠল। তারপর? তার পর আর কি? রাজপুত্রের সঙ্গে লীলার মহা সমারোহে বিয়ে হয়ে গেল। আর তারা সুখে সংসার করতে লাগল।

শ্রীমনিকা দেবী

ফাগুনে

(১)

ফাগুন এলো ফাগুন এলো দ্বারে,
থামল শীতের হাওয়া,
দখিন পবন ধীরে বাতায়নে
করে আসা যাওয়া।

(২)

কুহেলিকার ঘোমটাখানা টেনে,
সবুজ বসন পরে
বাহির হলেন স্বভাব রাণী বনে,
শোভায় জগৎ ভরে।

(৩)

জানলা-পথে ঢুকলো আমার ঘরে,
বললে আমার কানে,
ফুল ফুটেছে সুবাস-ভরা আজি
স্বভাবরাণীর বনে।

(৪)

গন্ধ মধুর শিথিল বকুলফুল
পড়ছে ধরায় ঝড়ে,
স্নিগ্ধ হাওয়া সেই সুষমা বহি,
বেড়ায় দ্বারে দ্বারে।

(৫)

আকাশ গেছে ঘোর নীলিমায় ভরে,
নাইকো মেঘের লেশ,
আকল কে আজ এমন মোহন ছবি
ধরার এমন বেশ!

(৬)

অতিথ এলো স্বভাবরাণীর বনে,
কোন্ সুদূরের পাখী,
'বৌ কথা কও' 'বৌ কথা কও' বলে
কেবল ডাকাডাকি।

(৭)

কুহু কুহু উঠলো কলধ্বনি,
বনের ঝোপে ঝোপে,
রাঙিয়ে দিল কে যে জগত খানি,
আজকে ফাগের ছোপে।

(৮)

ফাগুন দিনে আজকে ফুলের বন,
শোভায় গেছে ভরে
স্বভাবরাণীর প্রিয় লতাপাতা
নেয় গো পরাণ কেড়ে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মিনি

সেদিন বিকেল বেলা ঘুড়ি হাতে বেড়াতে বেড়াতে নদীর ধারে এসে পড়েছিলাম। এ জায়গাটা ভারী সুন্দর! মস্ত নদী, কত নৌকা, ষ্টীমার যাতায়াত কর্‌ছে। ছোট ছোট জেলে ডিঙ্গিগুলি দুল্‌তে দুল্‌তে জলের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে, দেখলে মনে হয় এক্ষুণি বুঝি ডুবে যাবে, কিন্তু ডোবে না, কত জেলেই মাছ ধর্‌ছে! কেমন সুন্দর নৌকার সাদা পালগুলি হাওয়াতে দুল্‌ছে! নদীর উপরকার এই দৃশ্যগুলি আর নদীর পারের জমির কচি কচি সবুজ ঘাস, ধানের ক্ষেত এ সবই দেখ্‌তে আমার খুব সুন্দর লাগে, তাই প্রায়ই এখানে বেড়াতে আসি, কিন্তু অন্য দিন আমার সঙ্গে সঙ্গী থাকে। আজ আমি একলাই বেড়াতে বেড়াতে নদীর পারে চলে এসেছিলাম, ঘুড়ি আকাশে উড়িয়ে দিয়েছিলাম তাই নিবিষ্টমনে দেখ্‌ছি, হঠাৎ শুনি "মিউ"— আমি চম্‌কে চেয়ে দেখলাম আমার পায়ের কাছে ঘাসের উপর একটী সুন্দর সাদা ধবধবে বেড়াল-ছানা বসে আছে! বেড়াল-ছানা আমার বড় প্রিয়! তাই ঘুড়ি নামিয়ে নিয়ে বেড়ালটাকে ধরলাম! স্নেহ করে গায়ে হাত বুলাতে লাগ্‌লাম। বেড়ালছানাটী আমার কোলে চুপ্‌টী করে বসে তার নীল চোখে আমার মুখপানে তাকিয়েছিল। হঠাৎ সে বলে উঠ্‌ল—"তুমি ত খুব ভাল লোক দেখ্‌ছি! মা বলেন মানুষেরা বড় দুষ্টু, আমাদের মারে, খাবার জিনিষ খেতে দেয় না!" আমি বেড়ালের মুখে কথা শুনে চম্‌কে উঠ্‌লাম, বেড়াল কি কখনও কথা বল্‌তে পারে? এটা কি তবে ভূত না কি? কিন্তু এমন সুন্দর বেড়াল-ছানাটীকে ভূত মনে কর্‌তে আমার ইচ্ছা হলো না! তাই হেসে বল্‌লাম—"তোমার মা ঠিকই বলেছেন, তবে মানুষেরা অনেকে বেড়াল খুব ভালও বাসে, যত্ন করে পালন করে!" ছানাটীও হেসে বল্‌লে "যাক্ ওকথা, তোমার নাম কি ভাই?" আমি বল্‌লাম—"আমার নাম অনু, অনেক দূরে ঐ মাঠের ওপারে শহরের ভেতরে আমাদের বাড়ী, নদীর ধারে আমি বেড়াতে এসেছি। এখন তোমার নামটী কি, কোথায় বাড়ী বলত ভাই!" বেড়াল বল্লে—"আমার নাম মিনি, ঐযে ভাঙা বাড়ীগুলো দেখ্‌ছ ওরই একটা আমাদের বাড়ী!" আমি বল্‌লাম—"সর্ব্বনাশ, ওবাড়ীগুলো যে লোকে ভূতের বাড়ী বলে।"

আমার কথার উত্তরে সে একটু বিরক্ত ভাবে বল্লে—"মানুষের কথা—তারা আমাদের কত কি বলে!" আমি বল্‌লাম—"তা নয়, ওগুলো অনেক দিনকার ছাড়া বাড়ী, তাই লোকে ভয়ে ঐ সব বলে।" মিনি এবার আমার কোল থেকে নেমে বল্লে—"চল আমাদের বাড়ী দেখে আসবে"—আমি বল্‌লাম, "মানুষের উপর তোমাদের যেরকম রাগ আবার আমাকে কিছু করবে না তো? মিনি হেসে বল্লে—"না-না, তুমি যে ভাল লোক! তুমি আমার বন্ধু!" আমি বল্‌লাম—আচ্ছা বন্ধু চল, তোমাদের বাড়ী দেখে আসি।" তখন মিনি আগে আগে লাফিয়ে যেতে লাগ্‌লো, আমি তার পেছনে পেছনে চল্‌লাম।

কিছুদূর গিয়ে কয়েকটা ভাঙা পোড়ো বাড়ীর কাছে গিয়ে মিনি থাম্‌লো, বল্লে—"ঐ যে

আমাদের বাড়ী তুমি দাঁড়াও, আমি মাকে বলে আসি।”

আমি দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম কত বেড়াল ছানা খেলা করছে, কত বড় বেড়ালরা ছুটোছুটি করছে, এ যেন বেড়ালের দেশ! মস্ত বড় বড় কয়েকটা বট, অশ্বত্থ গাছ আছে তারই তলায় বেড়াল ছানাদের খেলবার জায়গা, সবই আশ্চর্য্য হয়ে দেখছিলাম, হঠাৎ শুনি মিনি বলছে “মা' এই যে আমার বন্ধু! বড় ভাল লোক!” কথা শুনে আমি অন্যদিক হতে মুখ ফেরালাম, দেখলাম মিনির সঙ্গে মস্ত বড় এক সুন্দর বেড়াল আমার পানে চেয়ে আছে। বেড়াল হলে কি হয়—বর্ষিয়সী, আর বন্ধুর মা, সম্মান করতে হয় মনে করে আমি দু হাত জোড় করে নমস্কার করলাম! মিনির মা হেসে বল্লে—“বেঁচে থাক বাবা! তোমাকে দেখে বড় খুসী হলাম! এস ভেতরে এসে বস।” আমি ধীরে ধীরে ভেতরে গিয়ে বস্‌লাম, দেখলাম বসবার ঘরটী বেশ সুন্দর করে সাজান, ছোট ছোট চেয়ার বেঞ্চি, টেবিলতো আছেই, ইঁদুর প্রভৃতির ছবিও আছে! আমি একখানা চেয়ারে বসে মিনির সঙ্গে আলাপ করতে লাগলাম, “তোমরা এখানে খাবার জিনিষ কোথায় পাও?”

মিনি উত্তর দিলে—“কেন মাঠ ভর্ত্তি কত ইঁদুর আছে, সেগুলো শীকার করি, নদীতে মাছ আছে, বড়রা ছিপ ফেলে মাছ ধরে, আমাদের বাজারও আছে। সেখানে সব পাওয়া যায়, আর একদিন এসে বাজার দেখে যেও।”

আমি বল্‌লাম—“তোমাদের সবই দেখছি মানুষের মত, তোমরা বই পড়তে পার কি?”

মিনি বল্লে—“পারি বৈ কি, আমাদের স্কুল আছে, মাষ্টার হচ্ছেন বাঁদর, খুব ভাল শিক্ষা দেন, আমাদের স্কাউটিংও শেখানো হয়, আমি স্কাউটিং নিয়েছি”—আমি হেসে বললাম—“তোমাদের কি কি শেখানো হয়?” সে বল্লে—ইঁদুর পোকা মাকড় শিকার করা, কুকুর অথবা অন্য শত্রু তাড়া করলে তাড়াতাড়ি গাছে চড়ে আত্মরক্ষা করা—এই সব অনেক কিছু আমাদের শেখানো হয়, তুমি একদিন এসে দেখে যেও।”, আমি বললাম—‘আচ্ছা’ এমন সময় মিনির ছোট বোন এল, সে ভয়ে ভয়ে মিটির মিটির করে আমাকে দেখ্‌তে লাগলো, আমি তাকে বললাম—“এস কাছে এস, কিছু ভয় নেই!”

মিনি ভর্ৎসনার সুরে বল্লে—“আয় না পুসি ভয় কি? এ আমার বন্ধু।” পুসি ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে বসলে! আমি হেসে বললাম—“পুসি তুমি তো খুব লক্ষ্মী মেয়ে, আমার সঙ্গে যাবে?” সে ঘাড় নেড়ে বল্লে—“না, আমার ভয় করে।” মিনি বিজ্ঞের মত উত্তর দিল, “ভয় কি, আমি একদিন যাব।” আমি বললাম, ‘বেশ বেশ! আমরা খুব সুখী হব!’ মিনি হঠাৎ পুসির পানে চেয়ে বল্লে—“জানো বন্ধু, পুসি বেশ কবিতা মুখস্থ বলতে পারে, আমাদের পড়াশুনে শিখেছে।’ আমি বললাম—“তাই না-কি? একটা বলতো পুসিমনি আমি শুনবো।” পুসি লজ্জায় কিছুতেই বলবে না, শেষে মিনির ভর্ৎসনায় ধীরে ধীরে বললে—

“মিউ মিউ মেও,
কেঁদে কেঁদে ফুল্‌ছে আঁখি, মাগো কোলে নেও,
আর যাবনা দূরে দূরে
থাবা আঁচড় শিখবো ঘরে
অনেক ইঁদুর আন্‌ব মেরে এবার মাপ দেও।”

আমি বললাম্—“বাঃ, ভারী সুন্দর বলে তো!” সত্যি তার কচি মুখের মিহি সুরে আবৃত্তি

সুন্দর লাগল! মিনি বল্লে—"পুসি গানও বেশ ভাল করতে পারে।" আমি বললাম—"বাঃ, তবে তো আমাকে গান শোনাতে হবে।"

মিনি বল্লে—"আজ নয়, আর এক দিন এসে শুনো, এখন আমার বল খেলতে যেতে হবে। ঐ দেখ আমার সঙ্গীরা সব ডাক্‌তে আসছে!" তাকিয়ে দেখলাম অনেক বেড়ালছানা এসে দোর গোড়ায় দাড়িয়েছে; কোনটা কালো, কোনটা লাল, হরেক রকম, সবাই আমাকে অবাক হয়ে দেখছে!

আমি তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—"আচ্ছা, তাহলে এখন আমি আসি"—জবাব দিলেন মিনির মা! বল্লেন—"না না, বোস একটু"—আমি চমকে চেয়ে দেখলাম ঘরের ভিতরের দিকের দরজা দিয়ে মিনির মা ঘরে ঢুক্‌ছেন, হাতে তাঁর একখানি রেকাবী! রেকাবীখানা আমার সামনে দিয়ে, হেসে বললেন—"লোকের বাড়ী এলে একটু মিষ্টি মুখ করে যেতে হয়, অমনি কি যেতে আছে?" আমি লজ্জিত হয়ে রেকাবীটা হাতে করে চমকে উঠলাম! এ কি এ যে সব বেড়ালের পক্ষে অখাদ্য অর্থাৎ ইঁদুর ভাজা, টিকটিকির পিঠে ইত্যাদি, কেবল মানুষের খাদ্য এক টুকরা মাছ ভাজা দেখতে পেলাম। কি খাব ইতস্ততঃ করতে লাগলাম! মিনির মা বোধ হয় আমার অবস্থা একটু বুঝতে পারলেন বল্লেন—"ওঃ তুমি খেতে পারছ না দেখচি! মানুষেরা তো এসব ভাল বাসে না, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি একবার স্বাদ গ্রহণ করলে মানুষেরা ইঁদুর আদর করে খাবে, কি চমৎকার নরম মাংস, এমন স্বাদ কোনও জীবের মাংসে নেই, একটু চেখে দেখ বাবা!"

কি সর্ব্বনাশ. এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! এত অনুরোধেও আমি কিন্তু ইঁদুর খেতে পারলাম না, অত্যন্ত ঘৃণার সহিত মাছ ভাজা খানা খেয়ে উঠে পড়লাম, নমস্কার করে বললাম—সন্ধ্যে প্রায় হল এখন আমি যাই, আরেক দিন আসব!" মিনি পুসির গায়ে হাত বুলিয়ে বললাম—"আমাদের বাড়ীতে যেও কিন্তু বেশ খেলা করব।"

তারপর দুদিন চলে গেছে, সেদিন সকাল বেলায় পড়বার ঘরে বসে বই পড়ছি হঠাৎ শুনি—"মিউ"। চেয়ে দেখলাম জানলা দিয়ে আমার বন্ধু সেই মিনি ঘরে ঢুকেছে! আমি ভারী খুসী হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—"এস এস বাড়ী চিনে আসতে পেরেছ?" মিনি সে কথার জবাব না দিয়ে বল্লে—"এটা বুঝি তোমার পড়বার ঘর।" আমি বললাম—"হ্যাঁ"

এমন সময় ভারী একটা গোলমাল লেগে গেল, দাদা আমার ঘরে কি কাজে এসে ঢুকলো, ঢুকেই"ঐরে আবার বেড়াল এসেছে! মার মার্।" দাদা বেড়াল দুচক্ষে দেখতে পারে না, তাই আমাকে ঐ কথা বলে নিজে লাঠির জোগাড় করতে লাগল, মা পাশের ঘরে ছিলেন বেড়াল শুনে তিনিও ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—"বেড়াল মেরে তাড়িয়ে দে। খোকার দুধ খেয়ে ফেললে না-কি?" আমি করুণ স্বরে বলে উঠলাম "না-মা, এ আমার বন্ধু বেড়াল কিছু কোরো না"—কথা বলেই মিনির পানে চেয়ে দেখলাম অপমানে তার মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেছে! এমন সময় দাদা লাঠি নিয়ে তাকে মারতে আসাতে সে টপ করে জানলা থেকে লাফিয়ে দৌড়ে পালালো। আমি বললাম—"হায় হায়! একি করলে দাদা!

আমার বন্ধুকে তাড়িয়ে দিলে, ওরা আমাকে কত যত্ন করেছে।”

দাদা তাচ্ছিল্যের স্বরে হেসে বললে—“ওঃ তোমার বন্ধু নাকি? তোমার তো সবই বন্ধু, ইঁদুর, বেড়াল, সাপ, ব্যাঙ, বাঘ যত কিছু! অত বন্ধু জুটলে আমরা তো মারা যাব।

আমি জলভরা চোখে মার কাছে বন্ধুর বাড়ীর সব বিবরণ বললাম, কিন্তু আশ্চর্য্য হলাম কেউ আমার কথা বিশ্বাস করলে না। বাবা শুনে বললেন—“অনু রাত্রিতে তো বেশ মজার স্বপ্ন দেখে!

হায় কি করে বোঝাবো বন্ধুর বাড়ীর গল্প স্বপ্ন নয়।

সেই থেকে আর নদীর পাড়ে বেড়াতে যাই না, কি করে তাদের আর মুখ দেখাব? তাদের বন্ধুত্বের প্রতিদান আমাদের বাড়ীতে কেমন দেওয়া হোল যখনই সে কথা মনে হয়, লজ্জায় ব্যথায় মন ভার হয়ে ওঠে! কিন্তু কেউই আমার সে ব্যাথা বুঝতে পারে না।

শ্রীবাসন্তী সেন গুপ্তা

বিচিত্র সংবাদ

সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহলমে এই আদেশ প্রচার করা হয়েছে যে প্রত্যেকে বাড়ীর নম্বর বিদ্যুতের আলোকে আলোকিত করতে হবে। বৈদ্যুতিকগণ তাহার বন্দোবস্ত করছেন। রাত্রিকালে বাড়ীর নম্বর খুঁজে বার করা ও পড়া বড়ই মুস্কিল হয়, কাজেই নম্বরগুলি বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হলে, পড়বার পক্ষে খুব সুবিধা হবে।

—

তোমরা শুনে অবাক হবে যে জাপানে একটা গির্জ্জা তৈরী হয়েছে তার কাঠগুলি লোহার শিক ইত্যাদি দিয়ে না বেঁধে মানুষের চুলের দড়ী দিয়ে বাঁধা হয়েছে। জাপানে এক সময়ে এ রকম দস্তুরই ছিল যে মন্দির তৈরী হবার সময়ে লোকেরা ইচ্ছা করে তাদের চুল দান করত। টোকিওতে একটা মন্দির আছে তার কাঠের কড়িকাঠ ও বর্গাগুলি দড়ি দিয়ে না বেঁধে চুলের দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে।

গির্জ্জার কাঠের তৈরী কাঠামটা চুলের মোটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। একদিক থেকে আরম্ভ করে শেষ অবধি মাপলে দেখা যায় যে ৫২৮ ফিট লম্বা চুলের দড়ী দরকার হয়েছে আর দড়িগুলি ৭ ইঞ্চি চওড়া আর ওজন হচ্ছে ৮৮৪৭ পাউণ্ড অর্থাৎ ১১০ মণ।

মুকুলের রচনা-প্রতিযোগিতার ফল

কবিতা বিভাগ

প্রথম পুরস্কার—শ্রীননীলাল দে, রঙ্গপুর (গ্রাহক নং ৩২৩) পাঁচ টাকা।

দ্বিতীয় পুরস্কার—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, বিষ্ণুপুর। (গ্রাহক নং ৩২৬) একটাকা মূল্যের বই।

(অপর কবিতাগুলি পুরস্কারযোগ্য হয় নাই)

ধাঁধা বিভাগ

প্রথম পুরস্কার—শ্রীজগদীন্দ্র ভৌমিক, গিরিধি (গ্রাহক নং ২৯৬) পাঁচ টাকা।

দ্বিতীয় পুরস্কার—কুমারী মীরা চৌধুরী, পাটনা (গ্রাহক নং ৮) এক টাকা মূল্যের বই।

(বাকী ধাঁধা পুরস্কারযোগ্য হয় নাই)

গল্প বিভাগ

প্রথম পুরস্কার—কুমারী কমলা দাস, ডিব্রুগড় (গ্রাহক নং ৪৭) পাঁচ টাকা।

অপর কোন গল্প পুরস্কারযোগ্য হয় নাই।

ভ্রমণকাহিনী বিভাগ

ভ্রমণ কাহিনী—দ্বিতীয় পুরস্কার—শ্রীসনৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনারায়ণপুর হাই স্কুল, নদীয়া (গ্রাহক নং ২৬৬) এক টাকা মূল্যের বই।

তৃতীয় পুরস্কার—শ্রীসত্যব্রত মজুমদার শান্তিনিকেতন বীরভূম, (গ্রাহক নং ২৮৬) এক টাকার বই।

(অপর রচনা পুরস্কারযোগ্য হয় নাই)

জীবনী বিভাগ

দ্বিতীয় পুরস্কার—শ্রীরোহিণীরঞ্জন বড়ুয়া, আকিয়াব, বর্ম্মা (গ্রাহক নং ৩১৩) এক টাকার বই।

শ্রীমান জগদীন্দ্রনাথ ভৌমিকের প্রেরিত গল্পটী পুরস্কারযোগ্য হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধাঁধা বিভাগে প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন। কাজেই মুকুলের প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে তাহাকে আর পুরস্কার দেওয়া হইল না।

—

এবারের প্রতিযোগিতায় অল্পসংখ্যক গ্রাহক গ্রাহিকা যোগ দিয়েছিলেন। আশা করি নূতন বৎসরে বৈশাখ মাসের রচনা প্রতিযোগিতায় আরো বেশী গ্রাহকগ্রাহিকা যোগ দিবেন। তখন 'রৌপ্য মেডেল' দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হবে।

মুকুল কার্য্যাধ্যক্ষ।

কসাইয়ের পুত্র ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী

ফ্রান্সে রাজা নাই দেশের লোকেরা সকলে মিলে রাজ্যশাসন করে। কিন্তু রাজকার্য্য চালাবার জন্য একজন প্রেসিডেণ্ট (সভাপতি) আছেন ও মন্ত্রীসভা আছে। ফরাসী দেশে সাত বৎসর পর পর এক একজন সভাপতি মনোনীত হয়। এ বছরে যিনি প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন, তিনি একজন কসাইয়ের পুত্র। তাঁর নাম মোঁসিয়ো পিরি লাভেল। তাঁর বয়স ৪৭ বৎসর। তিনি যে মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন তাহাতে মোঁসিয়ো ডেনকে উপনিবেশ বিভাগের সহকারী মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেছেন। মোঁসিয়ো ডেন জাতিতে নিগ্রো। এর আগে কোন নিগ্রো ফরাসী দেশে এত উচ্চপদ ও সম্মান লাভ করেন নাই। কসাইয়ের পুত্র হলেও মোঁসিয়ো পিরি লাভেল সুশিক্ষিত ও তাঁর মনটি উদার।

বালকের সাহস

ফরিদপুর জেলার শাইলকাটি কৃষ্ণনগর গ্রামে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মজুমদার নামক এক জন সম্পদশালী ব্যক্তির বাস স্থান। কিয়দ্দিন হইল তাঁহার বাড়ীতে ডাকাইত পড়িয়াছিল। ডাকাইতেরা বাড়ীর সকলকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করে। সতীশ বাবুর ১৫ বছরের পুত্র শচীন্দ্র নাথ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বন্দুক লইয়া ডাকইতদের সম্মুখে যায় এবং গুলি করিতে আরম্ভ করে। এক জন ডাকাইত সে গুলিতে মারা যায়। অন্যান্য ডাকাইতেরা যাহা পাইয়াছিল, তাহা লইয়া পলায়ন করে। এই বালক ডাকাইতের ভয়ে যদি ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকিত, তবে ডাকাইতেরা সে বাড়ীর লোকদিগকে মার ধর করিয়া কত যে যাতনা দিত, তাহা বলা যায় না। এই বালকের সাহস দেখিয়া দুর্দ্দান্ত ডাকাইতের দল পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

ধাঁধা

১। ডাল আছে পাতা নাই
বল দেখি কি ভাই ?
কুমারী বিমলা বালা দে প্রেরিত।

২। জন্ম মোর ছোট্ট গাছে
একটি বোঁটা আমার আছে,
খেতে লাগে বড়ই ভালো,
আমি বড় বেজায় কালো,
শ্রীমান পরিতোষ চন্দ্র গুহ প্রেরিত।

মাঘ মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। থাকে টাকা হবে গোল শান্তি নাহি পাবে,
না থাকিলে সংসারেতে অশান্তি ঘটিবে।
যারে টাকা দিবে ধার, সহজে না দিবে,
না দিলে পরোক্ষে তার দুর্ণাম রটিবে
সংসারেতে সব গোল টাকার কারণ,
তাই ভেবে করোনা ভাই বৈরাগ্য বরণ।
শ্রীবিন্ধ্য বাসিনী দত্ত প্রেরিত।

২। পলিতা

নিম্ন লিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাগণ মাঘ মাসের ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন—

কুমারী কমলা দাস, ডিব্রুগড়, শ্রীমান শিবশঙ্কর দাস, দার্জ্জিলিং, কুমারী বীণাপাণি চৌধুরী, বেলগাছী, শ্রীমান সঞ্জীব কুমার মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌ, কুমারী ইলা সেন, মুঙ্গের, শ্রীমান পরিমল চন্দ্র বসু, কুমারী মীরারাণী ও ইন্দুলেখা বসু, মেদিনীপুর, শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল, বিষ্ণুপুর, রেণুকা, পানু, দুনু, মাখন, মণ্টু, শম্ভু, সুধাংশু, বলাই ও যোগেন বর্ম্মা, কুমারী মণিকা বিশ্বাস, রংপুর, শ্রীমান সনৎকুমার বন্দোপাধ্যায়, নদীয়া।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মুকুল

—চৈত্র, ১৩৩৭—

বালকবালিকাদের সচিত্র মাসিকপত্র

শ্রীবাসন্তী চক্রবর্তী বি এ, কর্তৃক

সম্পাদিত

মুকুলের লেখক-লেখিকাগণ

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু, রায় বাহাদুর জলধর সেন, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র, ডাঃ বনোয়ারীলাল চৌধুরী প্রমুখ।

— বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র —

—ঠিকানা—

২৯৪নং দর্গা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা

বিষয়-সূচী

চৈত্র—১৩৩৭

মুকুলের নিয়মাবলী

১। মুকুল বাংলা মাসের ৭ই তারিখে বাহির হয়। ১৫ই তারিখের মধ্যে কোন গ্রাহক মুকুল না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খবর লইয়া কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র লিখিবেন।

২। মুকুলের বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। ভি-পিতে দুই টাকা চারি আনা। যাণ্মাসিক এক টাকা চারি আনা। প্রতি সংখ্যা তিন আনা। বৎসরের মধ্যে যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু বৈশাখ মাস হইতেই কাগজ লইতে হয়।

৩। মুকুলের গ্রাহকগ্রাহিকা ছেলে মেয়েদের লেখা মুকুলে প্রকাশিত হয়। লেখা মনোনীত না হইলে তাহা ফেরত দেওয়ার জন্য ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। প্রেরিত ধাঁধার সঙ্গে উত্তর লিখিয়া না দিলে তাহা প্রকাশিত হয় না।

৪। মুকুলের নমুনার জন্য এক আনার ডাক ষ্ট্যাম্প পাঠাইতে হয়।

টাকাকড়ি চিঠিপত্র নীচের ঠিকানায় মুকুল আফিসে পাঠাইতে হইবে।

মুকুল কার্য্যাধ্যক্ষ—২৯৪নং দর্গা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা

মহাত্মা গান্ধী

১৩০২ সালে প্রবর্ত্তিত

"ছোট প্রাণে আমাদের দাও ভালবাসা,
ছোট ছোট মুখে দাও স্বরগের ভাষা।"

৩য় বর্ষ] (নবপর্য্যায়) চৈত্র, ১৩৩৭ [১২শ সংখ্যা

খোকার প্রতি খুকীদিদি

দোলের দিনে হলে তুমি—
এমন সুন্দর ছেলে
ছুটে তোমায় দেখতে এলেম,
আবীর-খেলা ফেলে।

দেখলেম তুমি আছ শুয়ে
মায়ের কোলের কাছে,
গালে যেন আবীর খেলার
রঙটি লেগে আছে!

জানতেম না ত কচি ছেলে
এত ছোট্ট হয়,
এমন তুলোর মত নরম—
ছুঁতে লাগে ভয়।

চক্ষু দু'টি বুজে ছিলে,
লম্বা লম্বা পাতা—
এতটুকু হাত পা গুলি,
এতটুকু মাথা!

মাথাখানি ভরে' ছিল
কোঁকড়া কালো চুল,
হাতের মুঠো বন্ধ ছিল,
যেন ছুটো ফুল!

একটু একটু হিংসে হল,
মায়ের কাছে দেখে,
মনে হল,—এটা আবার
এল কোথা থেকে?

একটু একটু মায়া হল,
মনে হ'ল ভাই—
এমন সোণার পুতুলটিত
কভু দেখি নাই !

সেদিন হ'ল নাকো খেলা
থেমে গেল গোল,—
আবার ঘুরে বছর পরে
ফিরে এল দোল।

এখন তুমি হয়েছ বড়,
হয়েছ পুট্-পুটে,
ফোক্‌লা মুখে দুএকটি দাঁত
ক্রমে উঠ্‌ছে ফুটে।

ক্ষিধে পেলে কাঁদো তুমি,
মাথা নাড়লে হাস,
যা-কিছু পাও মুখের মধ্যে
পুরতে ভালবাস।

(ভাই) মুখে দেবার অনেক জিনিষ
ভাল ভাল আছে,
শোন যদি সে-সব কথা
বলি তোমার কাছে।

(ঐ) যা'কে বলে সন্দেশ, সেটা
খেতে বড়ই মিষ্টি,
আর রসগোল্লা ! কি বলব ভাই,
—যেন মধুর বৃষ্টি।

আরো কত খাবার আছে
মায়ের ভাঁড়ার ঘরে,
চুরি করে খেলে কিন্তু
বড্ড অসুখ করে।

ডাক্তার দেয় তিতো ওষুধ,
মা-বাপে দেয় গাল,
আর জোলো বার্লি সাবু খেয়ে
কাটাতে হয় কাল।

তুমি হচ্ছ ছোট খোকা,
আমি বড় বোন,
যা, যা, বলি, সকল কথা
মন দিয়ে ভাই শোন্।

শীগ্‌গিরি শীগ্‌গিরি বেড়ে ওঠ,
খেলব দুই জনে,
দোলের দিনে কত মজা
করব ভাই বোনে॥

শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী

পরিশ্রমের জয়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দৃশ্য

(অলস বালিকা মন্থরা ঘুমাইতেছে। একটু পরে লোভী বালক গণেশ গৃহে প্রবেশ করিল)

লোভী বালক গণেশ। আমার ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে। (অলস বালিকাকে ঠেলিয়া দিয়া) এই কুড়ে মেয়ে, কুম্ভকর্ণের মত কেবল ঘুমাচ্ছে। উঠ, উঠ, শীগগির খাবার দাও

মন্থরা। (চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে) আঃ আমি কি সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন আমি একটি নরম পালকের গদিতে ঘুমাচ্ছি। কি আরাম আর সুখের মধ্যে ছিলাম। তুমি আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে আমার সব আরাম নষ্ট করে দিলে কেন, বলত ?

গণেশ। যাও, যাও, এখনো ঘুমাবার সময় হয় নাই। এখন খাবার সময়। শীগগির খাবার দাও।

মন্থরা। সে কি ? খাবার টাবার আমি দিতে পারবনা। অত কষ্ট আমি করতে পারব না! তুমি জায়গা টায়গা করে খাবার নিয়ে খাওনা। আমাকে বিরক্ত কর কেন ? আমার বড় ঘুম পেয়েছে। আমাকে ঘুমাতে দাও।

গণেশ। (খাবারের আলমারি খোলা দেখিয়া চিৎকার করিয়া বলিল) একি ? আমার খাবারের আলমারি খুলেছে কে ? তুমি নাকি ?

মন্থরা। আমি ? কি বলছ তুমি ? আমিত এতক্ষণ ঘুমাচ্ছিলাম। হাঁ, হাঁ আমার যেন মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে এই ঘরের মধ্যে পায়ের শব্দ শুনেছিলাম। কিন্তু তখন এত আরামে ছিলাম যে কাদের পায়ের শব্দ তা চোখ খুলে দেখতেই ইচ্ছা করে নাই।

গণেশ। (খাবারের আলমারির ভিতর দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল) যাঃ! সেই বড় রুই মাছটা ত নাই। রাত্রে আর কি রান্না হবে ? ভেবেছিলাম সুন্দর রুইমাছটা দিয়ে কালিয়া হবে আর মজা করে খাব, তা আর হোল না। সব গেল, সব গেল।

মন্থরা। তাইত, কি হবে ? বড় মুস্কিল হল দেখছি। মাছটা কে নিল ?—(আবার ঘুমাইতে আরম্ভ করিল)

গণেশ। (পায়চারী করিতে করিতে বিরক্তির স্বরে বলিতে লাগিল) কি লজ্জার কথা! কে মাছটা চুরী করল ? আমি নিশ্চয়ই বের করব। চোর ধরতেই হবে! এমনি করে নিয়ে যাবে আর চুপ করে থাকতে হবে ? কক্ষোনো না। এত আশা করেছিলাম রাত্রে সুন্দর খাবার পাব তা সব মাটি হয়ে গেল। আমার এত ক্ষিদে পেয়েছে। (দৌড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল)।

পরিশ্রমী বালিকা বিজয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল "মন্থরা! আবার ঘুমাচ্ছ! তুমি কি খাবার আসনগুলোও ঠিক করে রাখতে পার নাই ? তোমার দ্বারা কি কোনও কাজ হবে না ? (মন্থরাকে নাড়া দিয়া) মন্থরা, শীগগির ওঠো। (আলমারির ভিতর দেখিয়া) ওমা মাছটা কে

নিল ? রাত্রে কি রান্না করি এখন বলত ? ঘরেত এখন আর কিছু নাই। মাছের কালিয়া আর ভাত ডাল রান্না করব ভেবেছিলাম। এখন শুধু ভাল ভাতই রাঁধা ছাড়া আর উপায় কি ? এই কুড়ে মেয়ে শীগগির ওঠো। গণেশ গেল কোথায় ? সে-ই মাছটা নিয়ে গেল নাকি ?”

মন্থরা। আঃ দিদি, তুমি কেন এত গোলমাল করছ ? আমাকে একটু শান্তিতে ঘুমাতে দিতে কি তুমি পার না ?

পরিশ্রমী বালিকা বিজয়া। রাত্রের রান্নার জন্য যে কিছুই নাই। কে আলমারি থেকে মাছটা চুরী করল ? বলতে পার ?

মন্থরা। বাঃ আমি তার কি জানি ? (হাই তুলিয়া) আমি ত ঘুমোচ্ছিলাম। তবে ঘুমের মধ্যে আমার যেন একবার মনে হয়েছিল কে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি তখন এমন আরামে ছিলাম যে আমার চোখ খুলতেই ইচ্ছা করে নাই।

বিজয়া। চোরকে আমার ধরতেই হবে। (এমন সময়ে দ্বার খুলিয়া গেল। লোভী বালক গণেশ ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে খিটখিটে বালিকা সাগ্নিকা এবং কুৎসাপরায়ণা বালিকা কুৎসাময়ী গৃহে প্রবেশ করিল)।

গণেশ। (বিজয়াকে দেখাইয়া) ঐ দেখ দাঁড়িয়ে রয়েছে। চেয়ে দেখ।

বিজয়া। এর মানে কি ? তোমরা কি চাও ? আমার বাড়ীতে তোমরা কেন ঢুকেছ ?

গণেশ। তোমরা সব শুনছ ত উনি কি বলছেন ? ওঃ ওঁর বাড়ী।

সাগ্নিকা। তোমার বাড়ী বই কি ? আর এরা সব ভেসে এসেছে, না ?

কুৎসাময়ী। ওঃ, কি সত্যবাদী মেয়ে। ওঁর বিষয়ে আমরা যে সব কথা জেনেছি তা যদি সবাইকে বলে দি তবে কেমন উনি ভাল থাকেন তা দেখা যাবে। জগৎশুদ্ধ লোক কেবল ওঁকে ভাল ভাল বলে। তখন সব গুণ বেরিয়ে যাবে।

সকলে। (উচ্চৈঃস্বরে) লোকের কাছে দেখান হয় যেন উনি একটি আদর্শ মেয়ে। ছি! ছি! লজ্জা করেনা ? পরের জিনিষ চুরী করা। বেচারা গণেশ, তোমার জন্য বড় দুঃখ হচ্ছে। তোমার এমন খাওয়াটা মাটি হয়ে গেল। মন্থরার দিকে চেয়ে দেখ, বেচারা খেটে খেটে একেবারে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। উনি এদের খাটীয়ে খাটিয়ে মারেন আর বাইরের লোকদের কাছে দেখান যে উনি কত পরিশ্রমী। দাঁড়াও একবার, তোমার চুরী বিদ্যা যখন ধরা পড়েছে তখন এর বিচার বিচারকই করবে।

বিজয়া। চোর ? আমাকে তোমরা চোর বলছ ? কি লজ্জার কথা। এমন ঘেন্নার কথা কি করে তোমরা আমাকে বলছ ? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনরাত খেটে খেটে টাকা উপার্জ্জন করে কে তোমাদের সুখে রাখবার চিন্তায় এত খাটছে ?

সকলে। শোন, শোন ওঁর কথা। এত অহঙ্কার ? লজ্জা করেনা ?

বিজয়া। আমার আবার কিসের লজ্জা! তোমরা যে আমার প্রতি এ রকম ঘৃণ্য ব্যবহার করছ, এজন্য তেমাদেরই লজ্জিত হওয়া উচিত। আমার নিজের জিনিষ আমি চুরী করব কেন ? এ কথাটাও কি তোমাদের মাথায় আসে না ?

গণেশ। শুধু কি তোমারই নিজের জিনিষ ? আমি কি খাটিনা ?

সকলে। হাঁ, ঠিক বলেছ। তোমরা সব বলত, ও কি খাটেনা ?

বিজয়া। হাঁ, এমন খাটে যে একলাই তিনজনের খাবার খেয়ে ফেলে। আজ ত তুমি আমাকে খেতেই দাও নাই। আমার সব খাবার খেয়ে ফেলেছ। যেমন নাম, তেমনি কাম। "কর্ম্মে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে, বচনে মারেন পুড়িয়ে পুড়িয়ে।"

সকলে। বাঃ বিজয়া, তুমি ত বেশ গল্প বানাতে পার। তুমি আজ না খেয়েই আছ, না?

গণেশ। (মন্থরার দিকে ফিরিয়া) এই কুড়ে মেয়ে বলত, তুমি কি বিজয়াকে মাছটা চুরী করতে দেখ নাই?

মন্থরা। হতে পারে, আমাকে বিরক্ত কর না।

গণেশ। শুনলে ত সবাই মন্থরার কথা। সে বলছে বিজয়ার চুরীর কথা সত্যি। কেমন, এখন কি হবে? এখন তোমার সাধুতার বড়াই কোথায় রইল? আমি উপবাসে রইলাম আর উনি মজা করে মাছটি চুরী করে রেঁধে খেলেন।

সকলে। এস, এস সব চলে এস। বিচারককে নিয়ে আসি। তিনি এসে এর শাস্তি দেবেন।

(তাহারা সকলে বিজয়ার হাত ধরিতে গেল। বিজয়া একটি লাঠি লইয়া তাড়া করিয়া তাহাদের ঘরের বাহির করিয়া দিল)।

ক্রমশঃ

শ্রীকুমুদিনী বসু।

পঞ্চুলাল

৪

রাজকুমারীর ছিল মন-ভরা দেমাক। সামান্য কৃষকের ছেলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হওয়ায় মনে তাঁর রাগের সীমা ছিল না। তাই কি ক'রে সে এ থেকে নিষ্কৃতি পাবে, রাত দিন কেবল তাঁর সেই চিন্তা। মিষ্টি কথায় স্বামীর মন ভুলিয়ে—কি ভাবে স্বামী তাঁর এত সব কাজ করলেন, সেই আশ্চর্য্য খবরটা জেনে নেবার জন্য রাতদিন রাজকুমারীর চেষ্টা—কেবল সেই চেষ্টাই ছিল! একদিন পঞ্চু আদর ক'রে স্ত্রীর কাছে সকল কথা খুলে বল্‌ল।

রাত্রিবেলা পঞ্চু ঘুমিয়ে পড়তেই রাজকুমারী চুপে চুপে পঞ্চুর জামার নীচ থেকে সেই মোহন বাঁশীটি নিয়ে বাইরে এসে বাজাতে সুরু করলো।

অমনি সেই বারোজন দৈত্য এসে সেখানে হাজির; আর মোটাগলায় চেঁচিয়ে তারা বল্‌লে—কি হুকুম রাজকুমারী?

রাজকুমারী ভয়ে ভয়ে বল্‌লে,—এই মুহূর্ত্তে এই স্ফটিক সেতু, সোনার আপেল গাছ আর সকল সাজ সরঞ্জাম-শুদ্ধ প্রাসাদটিকে তুলে তেপান্তরের মাঠ ছাড়িয়ে এক জায়গায় রেখে এস, সেখানে আমি বাস করবো। আর আমার স্বামীকে এই খালি মাঠের মাঝখানে ঘাসের উপর শুয়ে রেখে যাও।

'যো হুকুম' বলে দৈত্যগুলি তখুনি কাজে লেগে গেল। সেই প্রকাণ্ড প্রাসাদটি তুলার বস্তার মতন ঘাড়ে ক'রে বারোজন দৈত্য শূন্য পথে উড়ে চল্‌ল। রাজকুমারী তাঁর সোনার

দোল্‌নাখাটে ব'সে হাস্‌তে লাগ্‌লো। তারপর দৈত্যরা পঞ্চুকে এনে শূন্য মাঠের মাঝখানে ভিজে ঘাসের উপর শুইয়ে রেখে চলে গেল।

পরদিন ভোরবেলা চীন-সম্রাট ভোরে উঠে

চোখ কচ্‌লিয়ে বাইরে চেয়ে দেখেন শূন্য মাঠ পড়ে আছে—তাতে পঞ্চুর সেই প্রাসাদটির চিহ্ন মাত্র নেই।—যেমন সবুজ ঘাসে পূর্ব্বে ঢাকা ছিল—সেই শ্যামলতা ছড়ানো শূন্য মাঠ পড়ে আছে।

"হায়! এ কী হোল? কোথায় গেল সেই প্রাসাদ, কুঞ্জবন, সোণার সেতু, আপেল গাছ? তার চিহ্নও তো দেখা যাচ্ছে না! হায়! হায়! আমার মেয়ে গেল কোথায়? পঞ্চু?—কোথায় গেল সেই হতভাগা—"

চীন সম্রাট—মনের দুঃখে ডুকরে কেঁদে উঠ্‌লেন। ডাক মন্ত্রীকে—পাত্র, মিত্র সেনাপতি সবাইকে এক্ষুণি ডেকে আন।

পাইক বরকন্দাজ চতুর্দ্দিকে ছুটে গেল। সকলে হাঁপাতে হাঁপাতে সম্রাটের কাছে উপস্থিত হ'ল।

'কি মন্ত্রী, কি সেনাপতি, কি দূত খবর কি শীঘ্র বল। নচেৎ কারু ঘাড়ে মাথা রাখ্‌বো না। কোথায় আমার মেয়ে খুঁজে বের কর।

কারু মুখে কথা নেই।

অবশেষে মন্ত্রী বল্‌লে,—হুজুর, আগে পঞ্চুর খোঁজ করা যাক্‌, তারপর সব খবরই পাওয়া যাবে।

চারিদিকে কেবল সাজ সাজ রব। পঞ্চুর খোঁজে ঘোড়ায় চড়ে সিপাহী, গাধায় চড়ে বরকন্দাজ, হাতীর পিঠে সেনাপতি, উটের পিঠে রসদ আর গরু আর মোষের গাড়ী বোঝাই ক'রে নানারূপ হাতীয়ার অস্ত্রশস্ত্র চল্‌লো—পঞ্চুকে এখুনি খুঁজে বের করে রাজদরবারে হাজির করতে হবে।

পঞ্চুর খোঁজে চারিদিকে হাতী ঘোড়া উট গাধার ছড়াছড়ি, কিছুরই দরকার হ'ল না; দেখা গেল পঞ্চু বেচারা মাঠের মাঝখানে শুয়ে দিব্যি নিদ্রা দিচ্ছে।

কে আগে গিয়ে পঞ্চুকে ধরে এনে রাজ-দরবারে হাজির করবে, তা' নিয়ে হাতী, ঘোড়া গাধা উটের সোয়ারে সোয়ারে রীতিমত লড়াই বেধে গেল। পঞ্চুর ঘুম ভাঙ্গতেই দেখে চতুর্দ্দিকে প্রলয়কাণ্ড। যাহোক, অনেক কষ্টে পঞ্চুকে নিয়ে তো রাজদরবারে হাজির করলো।

সম্রাট জোরে চীৎকার ক'রে বল্‌লেন,—শীঘ্র বল রাজকুমারী কোথায়?

পঞ্চু ভ্যাবাচ্যাগা খেয়ে বল্‌ল,—রাজকুমারী?

হাঁ, রাজকুমারী; এখনো তোমার চৈতন্য হয়নি? এক ঘণ্টার মধ্যে রাজকুমারীকে এখানে এনে দেও, নৈলে বুঝতেই তো পাচ্ছ।

পঞ্চু চতুর্দ্দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লো, সম্রাট, মন্ত্রী, সেনাপতি বরকন্দাজ—সকলের মুখেই যেন কামারের হাপরের মতো ফোস্ ফোস্ শব্দ, আর কয়লার আগুনের মতোই লাল হয়ে জ্বলে উঠছে তাদের মুখগুলি

হায়, কি হোল? পঞ্চু জামার আস্তিনের নীচে হাত দিয়ে দেখ্‌লো—সেই মোহন বাঁশী নাই।

তখন সবই সে বুঝ্‌তে পেরে চুপ ক'রে রইলো।

সম্রাট হুকুম দিলেন, পাথরের একটা উচু মিনার তৈরী করে তার মাঝখানে পঞ্চুকে কয়েদ রাখ। বিশ হাত উচুতে একটি মাত্র ফুকুর ছাড়া চারিদিকের দরজাকপাট—ইট দিয়ে গেঁথে ফেল। রাজকুমারী ফিরে না আসা পর্য্যন্ত সেই কুঠ্‌রীতে পঞ্চু কয়েদ থাক্‌বে। এক বাতাস ছাড়া খাওয়া দাওয়ার কোন কিছুই সে পাবে না।

হুকুম মাত্র পঞ্চুকে সেই রকম একটা পাথরের ঘরে চতুর্দ্দিক বন্ধ ক'রে আটক করে রাখলো।

এই ভাবে মানুষ আর ক'দিন বাঁচতে পারে।

কানঝোলা দু'দিন আগে এক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিল, ফিরে এসেই শোনে তার প্রভু অন্নজল ছাড়া আজ ৫ দিন সেই পাথরের ঘরে কয়েদ হয়ে আছে।

তখুনি সে লেজ ফুলোর খোঁজ করতে ছুটলো। এসে দেখে, লেজফুলো নিজের লেজ দুলিয়ে তার কাচ্চা বাচ্চাগুলিকে নিয়ে ভারি আমোদে কাটাচ্ছে।

কাণ ঝোলা ভারি চটে গিয়ে বল্‌লে—খেয়ে দেয়ে খাসা তেল চুক্‌চুকে চেহারা খানা বাগিয়েছ। এদিকে প্রভু যে অনাহারে মারা যাচ্ছে, তার খোঁজ রাখ কি? প্রভু যে একদিন তোমার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন—সে কথাটাও ভুলে গেলে নাকি?

লেজফুলো বল্‌লে—কেন প্রভুর কি হল? তাতো কিছুই জানিনা।

কাণ ঝোলা সকল কথা খুলে বল্‌ল।

লেজফুলো বল্‌লে,—তা হলে কি উপায়

কাণঝোলা বল্‌লে,—সে উপায় আমি ঠিক করে রেখেছি। এই বেলা আমার সঙ্গে চল।

পথে যেতে যেতে কাণঝোলা লেজ ফুলোকে বল্‌লে,—ভাই, একটা উপায় ঠাওরিয়েছি। লোকেরা যখন ময়রার দোকান থেকে ঠোঙ্গায় ভরে মিঠাই মণ্ডা নিয়ে ফিরবে, তুমি গিয়ে তাদের পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিবে, লোকগুলি হুম্‌ড়ে খেয়ে পড়তেই ঠোঙ্গাসুদ্ধ খাবার নিয়ে আমি দৌড় মারবো। তারপর তুমি পাথরের দেয়াল বেয়ে উপরে উঠে ঠোঙ্গা ভরা খাবার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে ঝুপ করে নীচে ফেলে দিও। তাতেই প্রভুর প্রাণ রক্ষা হবে।

যেই কথা সেই কাজ।

লেজফুলো আর কাণ ঝোলা দুজনে মিলে দিনে দশবার নানারকমের মিঠাই মণ্ডার ঠোঙা বাজার থেকে আন্‌তে লাগলো। আর লেজ ফুলো পাথরের দেয়াল আঁচড়ে চট্‌পট্ উপরে উঠে সেই ঠোঙ্গাগুলি কুঠরির ভিতর ফেল্‌তে লাগ্‌লো।

এইভাবে কয়েক দিনের ভিতর রাশিকৃত ঠোঙ্গায় পঞ্চুর কয়েদ ঘর ভরে ফেললো।

এই ভাবে পঞ্চুর প্রায় এক বছরের খোরাক যোগাড় হতেই কাণ ঝোলা লেজফুলোকে ডেকে বললে—ভাই, এইবার মোহন বাশীটি খুঁজে বের করা চাই।

লেজফুলো বললে,—আলবৎ, প্রভুর উদ্ধারের উপায় এইবার করতেই হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন

নবীন জীবন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৮

সন্ন্যাসী একটু পরেই ঘরের মধ্যে যাইয়া ভাত, তরকারী রান্না করিলেন। অমরের জন্য প্রথমে তিনি ভাত, তরকারী আনিলেন, তারপরে দুধ ও কলা আনিলেন কিন্তু নিজের জন্য শুধু ফল আনিলেন। অমর খুব আনন্দে আহার করিল। সে বলিল "আপনি এসব জিনিষ কোথা থেকে পেলেন? আপনিও কি চুরি করতে বার হন?"

তখন সন্ন্যাসী তাহাকে বুঝালেন এ সব তরকারী মাটীতে জন্মায়। তিনি বলিলেন "এই ঘরের পিছনে যাও নাই? সেখানে তরকারীর বাগান। আমি এ সব তরকারী বাগান থেকে তুলে এনেছি। এ সব গাছ থেকে অনেক তরকারী ও ফল পাওয়া যায়।"

অমর গম্ভীর হইয়া বলিল "এ সব কথা কি সত্যি?"

সন্ন্যাসী বালকটীকে কোলে করিয়া ফল ও তরকারী গাছের নিকট লইয়া গিয়া দেখাইলেন যে ফলগুলি গাছ হইতে কেমন ঝুলিতেছে! তিনি বলিলেন "দেখছ, ছোট ছোট ডালে কেমন এগুলি হয়েছে? এখন এ ফল গুলি ছোট আছে কিন্তু পরে বড় হবে। এই দেখ কেমন ছোট্ট বীচি রয়েছে; এই ছোট বীজ থেকে এত বড় গাছ জন্মায় প্রত্যেক বীজই শেষে এত বড় গাছে পরিণত হয়। একটা গাছেই অসংখ্য ফল ধরতে পারে যা মানুষ খেয়ে শেষ করতে পারে না। এই মাঠে এস, দেখ ধানের গাছ রয়েছে। এই খেতে যে ধান হয় তার থেকে চাল হয়; আমরা সে সব খেয়ে বাঁচি। তারপর কেমন করে ধানের গাছ জন্মে তাহার নিকট বর্ণণা করিলেন।" অমর দৌড়িয়া গিয়া কয়েকটা ধানের শীষ লইয়া আসিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন "আমাদের পায়ের তলায় যে ঘাস আছে, আর ওখানে যে গোলাপ ফুটে রয়েছে দেখছ, আর এই যে অসংখ্য ধানের শীষ, এই যে সুন্দর লতা, আর ঐ পাহাড়ের উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ, সবই ছোট্ট বীজ থেকে জন্মেছে। এই যে সব ফল মূল তরি তরকারী, মস্ত বড় তরমুজ, আম কাঁঠাল, আর যে দরজা, জানালা, খাট, পিঁড়ি দেখছ সকলই আমরা ওই ছোট্ট বীজ হ'তে পেয়েছি। একটি আমের আটি যদি এখানে পুতি তাহলে একটা গাছ হবে, আর তাতে শত শত আম ধরবে। একটী ধানের বীজ যদি পুতি ত তাহতে কত শিষ বের হবে, আর তার মধ্যে কত ধান জন্মাবে। এই রকম করে আমি আমার বাড়ীর চারিধারে ফলও তরকারীর বাগান করেছি।

অমর এই সকল জিনিষ দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। আবার তাদের জন্ম বৃত্তান্ত শুনিয়া সে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইল।"

৯

তাহারা যখন কথা বলিতেছিল তখন সূর্য্য ক্রমে ক্রমে হেলিয়া পড়িতেছিল'। বাগানের

ফুল গাছের উপর ছায়া পড়িল। রৌদ্রে কতগুলি ফুল শুকাইয়া উঠিয়াছিল। সন্ন্যাসী আশা করিতে ছিলেন বৃষ্টি হইবে বৃষ্টির সম্ভাবনা না দেখিয়া গাছগুলির গোড়ায় জল দিতে গেলেন। তিনি

একটা কলসী লইয়া ঝরণার ধারে গেলেন, অমরও সঙ্গে গেল।

অমর আনন্দে হাত তালি দিয়া বলিয়া উঠিল "বা' পাহাড়ের মধ্য থেকে কত জল বার হচ্ছে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই মনে করছি জল বুঝি আর পড়বে না। কিন্তু কই জল পড়াও থামছে না। কে উপর থেকে এত জল ঢেলে দিচ্ছে? কলসীটা ভরবার জন্য এত জল কোথা থেকে পাচ্ছেন? আপনি এর মুখটা বন্ধ করে দিন, না হলে শেষে আর জল পাবেন না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন "সূর্য্যের আলো যেমন অফুরন্ত এই জলও তেমনি চিরকাল এমনই অবিশ্রান্ত বয়ে যাবে।" তারপর আবার তাহাকে বলিলেন "ঐ যে হ্রদ রয়েছে (যাকে তুমি একখানি প্রকাণ্ড আয়না মনে করেছ) ইহা শুধু জলে ভরা। এ সকলই অমরের নিকট নূতন জিনিষ মনে হইল।

সন্ন্যাসী কলসী কলসী হইতে জল ঢালিয়া গাছে জল ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন।

অমর বলিল "আপনি কি করছেন? ফুলগুলি যে সব নষ্ট করে ফেলছেন? এগুলির রং ঘুয়ে যাবে।"

সন্ন্যাসী হাঁসিয়া বলিলেন "ফুল, ফল, তরকারি শস্য, গাছ, পালা যেগুলি বেঁচে

আছে, তাদের জলের দরকার হয়, যেমন মানুষদের জল পান করিবার প্রয়োজন হয়।"

অমর বলিল "কিন্তু কে চারিদিকের অসংখ্য গাছ পালাকে এত জল যোগাতে পারে। পাহাড়ের উপরের গাছগুলিতে জল দেয়?

সন্ন্যাসী বলিলেন "তুমি হয়ত এখনই দেখতে পাবে কেমন করে গাছ পালা জল পায়।" এই বলিয়া তিনি আকাশে মেঘের দিকে তাকাইলেন।

কিছুক্ষণ পরে কাল মেঘ পাহাড়ের উপরে আসিল, তাহার পর বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। প্রথমে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল, পরে খুব জোরে পড়িতে লাগিল। অমর এ দৃশ্য দেখে অবাক হইয়া গেল।

অমর বলিল "বা! এত বেশ ভাল বন্দোবস্ত, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। কেমন হাজার হাজার জলের ফোটা পড়ছে, মনে হচ্ছে যেন ছেদা থেকে পড়ছে। কিন্তু কে এই মেঘের বন্দোবস্ত করেছে! কে এত উচুতে জল নিয়ে গেছে? মেঘগুলি উপরে ঝুলছে অথচ পড়ছে না?"

সন্ন্যাসী বলিলেন "তুমি শীঘ্রই এ সম্বন্ধে সব জানতে পারবে।" অমর আকাশের দিকে তাকাইয়াছিল; ক্রমে মেঘগুলি কোথায় অদৃশ্য হইল—আকাশ পরিষ্কার হইল।

নূতন নূতন জিনিষ দেখিতে দেখিতে অমরের দিন কাটিতে লাগিল। যে সমস্ত জিনিষ দেখিয়া কেহ ভাবেও না, সেই সামান্য জিনিষগুলি দেখিয়া অমর অবাক হইয়া গেল। গোলাপফুলের পাতার উপর সবুজ রংয়ের ফড়িং বসেছে, পাতার উপর মুক্তার মত শিশির বিন্দু ঝক্ ঝক্ করিতেছে, চড়াই পাখী এডাল থেকে ওডালে উড়িয়া বেড়াইতেছে, সন্ন্যাসীর ছাগল সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরিয়া আসিল—এ সমস্ত দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল ও তাহার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হইল।

অবশেষে হ্রদের ধারে সূর্য্য অস্ত গেল। অমর ভয় পাইয়া বলিল "যাঃ এখন আকাশের বাতিটা জলের মধ্যে ডুবে গেল! এটা ও নিবে যাবে, তা'হলে আমাদের সব আনন্দও শেষ হ'ল। এখন যদি আমরা একটা বাতি জ্বালাতে পারি তা হ'লে তবু কিছু আলো পাওয়া যাবে।"

সন্ন্যাসী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "ভয় পেও না। আমরা এখন ঘুমাতে যাবো। এখন আমাদের আলোর দরকার নাই। সারা রাত্রি ঘুমাবার পর আবার সকালে হ্রদের অন্য দিকে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সূর্য্য উঠবে। এ সূর্য্য ত এক যায়গায় ঠিক থাকেনা। এ ক্রমাগত চলছে আর পৃথিবীর জিনিষকে আলো ও উত্তাপ দিচ্ছে।"

১০

অমর আবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী তাহার সব প্রশ্নের উত্তর একবারে দিলেন না, যেন তাহার অনুসন্ধিৎসু স্পৃহা বৃদ্ধি পায়।

অমর বলিল" সূর্য্য কেন সব সময়ে ঘুরে? কে এই সব সুন্দর মেঘ তৈরী করেছে, আর আকাশে নীল রং দিয়ে এঁকে দিয়েছে! কে ঐ পাহাড়ের উপরে জল জমা করে রেখে দিয়েছে এবং অবিশ্রান্ত ভাবে জল ছেড়ে দিচ্ছে? এই যে মেঘগুলি আকাশে ঝুলছে, কে এগুলিকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে! কে এই অসংখ্য গাছ পালাকে এই সব ঝকঝকে জল বিন্দু দিয়ে সাজিয়েছে! কে

এই পাখীদের এমন মিষ্টি গান গাইতে শিখিয়েছে! কে এই ছোট্ট ছোট্ট বীজের মধ্যে বড় গাছ ও সুন্দর ফুল লুকিয়ে রেখেছে; যেখানেই যাই সেখানেই এসব দেখি। মনে হয় জমীর উপরে যেন ঘাসের সতরঞ্জি পাতা রয়েছে—কে এত সুন্দর জিনিষগুলি আমাদের দিয়েছে?"

সন্ন্যাসী বলিলেন "তুমি তা হলে সত্যি সত্যিই বিশ্বাস কর যে এমন একজন আছেন যিনি এ সমস্ত সুন্দর জিনিষ সৃষ্টি করেছেন।"

অমর বলিল "নিশ্চয়ই! এ ছাড়া ত হতেই পারেনা। গুহার মধ্যে যারা থাকত, তাদেরত একটা সামান্য জিনিষ তৈরী করতেই কত সময় লাগত। একবার যখন গুহার ছাদের এক যায়গা ধসে গেল, তখন সেটা আবার ঠিক করতে তাদের অনেক কষ্ট হয়েছিল। গুহাতে আমাদের বাতি ত নিজে নিজে জ্বলে উঠত না। আমরা অন্ধকারে যখন বসতে চাইতামনা, তখন বাতিতে তেল ভরে দিতাম,তবে বাতিটা অনেকক্ষণ জ্বলত। আর জলের জালাটায় কেবলই জল ভরে রাখতে হত, তা না হ'লে আমাদের তেষ্টায় মরতে হত। একটা কাগজের ফুল তৈরী করতে যে কত কষ্ট হত আর সেজন্য কেমন ভাল চোখ চাই তা আমি বেশ ভাল করে জানি। কাজেই আমার মনে হচ্ছে, চারিদিকে যে সব জিনিষ দেখতে পাচ্ছি, এ কোন ছোট্ট মানুষের তৈরী হতে পারে না। কিন্তু কে এ সব তৈরী করেছেন? আমি তা খুব জানতে চাই।"

(ক্রমশঃ)

নিত্যানন্দ ও হিরণ্য ডাকাত

তোমরা নিশ্চয়ই ভক্ত গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের নাম শুনিয়াছ। চারশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা বাংলাদেশে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহারা দুজনেই এ রকম ধার্ম্মিক ছিলেন যে, তাঁহাদের কথা স্মরণ করিলেও মন পবিত্র হয়। আজ আমরা শুধু নিত্যানন্দের আর তাহার সঙ্গে এক ডাকাতের গল্পই তোমাদের কাছে বলিব।

নিত্যানন্দ বীরভূম জেলার একচাকা নামক একটী গ্রামের এক ব্রাহ্মণের ছেলে ছিলেন। তাঁহার চেহারা বড়ই সুন্দর ছিল, মুখের পানে চাইলে চোখ জুড়াইয়া যাইত। তাঁহার বাপ মা তাহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। নিত্যানন্দের স্বভাব অতিশয় মিষ্ট ছিল। যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সেই সময়ে এদেশে বিস্তর সাধু-সন্ন্যাসী ছিলেন। গৃহস্থ লোকেরা তাঁহাদের দেবতার মতন ভক্তি করিতেন। একদিন এক সন্ন্যাসী আসিয়া নিত্যানন্দের বাবার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীর লম্বা লম্বা চুল, মুখে দাঁড়ি, পরণে বাঘের চামড়া, হাতে চিমটা, গায়ে ভস্মমাখা। নিত্যানন্দের বাবা ও মা তাহাকে দেখিয়াই প্রনাম করিলেন। তাঁহার যত্ন আদরের আর সীমা রহিল না।

এই সন্ন্যাসী হয় ত নিজের ছেলেমেয়ে ফেলিয়া রাখিয়া, ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু নিত্যানন্দের সুন্দর মুখখানি দেখিষা তিনি মুগ্ধ হইলেন; তাঁহার উপরে

আশ্চর্য্য ভালবাসা জন্মিল। তাই সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে পাইবার জন্য তাঁহার বাবা ও মাকে কহিলেন—"তোমাদের এই ছেলেটির বড় সুলক্ষণ। সন্ন্যাসী হলে নিশ্চয়ই খুব বড় একজন ধার্ম্মিক লোক হয়ে। তাই আমি এই ছেলেটিকে আমার সঙ্গেই নিয়ে যাব। ছেলেটিকে নিয়ে দেশে দেশে বেড়াব, আর ধর্ম্মের কথা শেখাব।"

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া নিত্যানন্দের বাবার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি কহিলেন—"আপনি বলেন কি? এই ছেলেকে না দেখে আমরা থাকব কেমন করে? আমরা বরং প্রাণ ত্যাগ কর্‌তে পারি, তবুও নিত্যানন্দকে ছাড়তে পারি নে।"

তাহা বলিলে কি হয়? ছেলেকে ছাড়তেই হল। সন্ন্যাসীর যখন দৃষ্টি পড়িয়াছে, তখন ছেলেকে ছাড়িতেই হইবে। নইলে আর কি রক্ষা আছে? সন্ন্যাসী ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারে? নিত্যানন্দের পিতা মাতা ভয়ে ভয়ে সন্ন্যাসীর হস্তেই তাহাকে অর্পণ করি লেন। সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে লইয়া হয়ত হরিদ্বার কি জ্বালামুখী ঐ রকম কোন তীর্থে চলিয়া গেলেন। কিন্তু নিত্যানন্দের পিতার অতি শোচনীয় অবস্থা হইল!

যা হোক, নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর শিক্ষায় ঈশ্বরকে পাইবার জন্য দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি শুনিতে পাইলেন, নবদ্বীপে পরম ভক্ত শ্রীচৈতন্য হরি-সঙ্কীর্ত্তনে মানুষগুলিকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। তিনিও সঙ্কীর্ত্তনে মাতিয়া ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দকে দেখিয়া গৌরাঙ্গের মনে হইল, যেন তাঁহার নিজেরই একটি ভাই। দুজনে মিলিয়া অতিশয় ভক্তির সহিত ঈশ্বরের নাম করিতে লাগিলেন!

তাহার পরে গৌরাঙ্গের আর সংসারে মন রহিল না, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া পুরী চলিয়া গেলেন। নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের সঙ্গেই পুরী গিয়াছিলেন। অবশেষে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া এক ব্রাহ্মণের ঘরে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নিত্যানন্দের কাছে কতকগুলি সোণার মোহর ও বিস্তর সোণার গহনা ছিল। হিরণ্য ডাকাত কেমন করিয়া যে মোহর ও গহনার খবর পাইল, তাহা কে বলিবে? ঐ গুলির জন্যই তাহার মাথায় ডাকাতি করিবার খেয়াল চাপিয়া বসিল।

হিরণ্য বামুনের ছেলে, লেখাপড়া শিক্ষা করে নাই; ছেলেবেলা হইতেই খারাপ লোকের সঙ্গে পড়িয়া নানা রকম নেশা করিতে এবং চুরি ও ডাকাতি করিতে শিখিয়াছে। হিরণ্যের দলে বিস্তর লোক। তাহাদের যমদূতের মতন চেহারা; তাহারা অসুরের মত বলবান; গায়ের জোরে ধরাকে সরা জ্ঞান করে; মানুষ ভয়ে তাহাদের নিকট হইতে লক্ষ হাত দূরে সরিয়া যায়। মুসলমান নবাবের সিপাহিরাও এই সকল দুর্দ্দান্ত ডাকাতের নামে ভয় পায়, বরং বনের বাঘ ছুটিয়া আসিলেও মানুষ রক্ষা পাইত, কিন্তু এই ভীষণ প্রকৃতি ডাকাতের দল পেছনে লাগিলে আর রক্ষা পাইবার উপায় থাকিত না।

হিরণ্য ডাকাত নিত্যানন্দকে মারিয়া ফেলিয়া তাঁহার মোহর ও গহণা লুটিয়া লইবার জন্য দলবল লইয়া পরামর্শ করিল।

হিরণ্য ডাকাত আর তার দলের মানুষগুলি ঢাল, তলোয়ার আরো সব অস্ত্র লইয়া অন্ধকার রাত্রে, ডাকাতি করিতে বাহির হইল। মনে মনে

তাহাদের ভারি ফূর্ত্তি। তাহারা ভাবিল নিত্যানন্দের মতন এক সন্ন্যাসীর মাথা কাটিয়া মোহর আর গহনা লুটিয়া লইতে কতক্ষণ? ডাকাতেরা লম্ফ-ঝম্ফ করিতে করিতে বলিতে লাগিল—

প্রথম ডাকাত। আমার ভাগে সোণার হার চাই।

দ্বিতীয় ডাকাত। আমার ভাগে মুক্তারমালা চাই।

তৃতীয়। ডাকাত আমার কিন্তু সোণার মোহর চাই।

কালনেমীর লঙ্কার ভাগের মতন, ডাকাতেরা ডাকাতির আগেই, কে কোন্ জিনিসে ভাগ বসাইবে, তাহা লইয়া কথার কাটাকাটি করিতে লাগিল।

নিত্যানন্দ যে বাড়ীতে আছেন, ডাকাতেরা কোন রকম শব্দ না করিয়া রাত্রির অন্ধকারে গোপনে সেই বাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু নিত্যানন্দ দলবল লইয়া তখনো হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন। ডাকাতেরা ভাবিল "কি মুস্কিল! ব্যাটারা এত রাত্রেও হরি হরি বলে পাগলের মতন নাচছে। তা, একটু সবুর করা যা'ক ; মানুষগুলি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুক, তখনি ঢাল, খাঁড়া নিয়ে তাদের উপরে পড়া যাবে। এখন সবাই জেগে আছে, মানুষ ডাকাডাকি করলেই যত গাঁয়ের লোক এসে একসঙ্গে জুটবে, তা হলে সকলের সঙ্গেই লড়াই করতে গিয়ে, আমাদেরও দু-চারজনের মাথা কাটা যাবে।"

ডাকাতেরা সেই সময় নিত্যানন্দের ঘরে আর প্রবেশ করিল না, অন্ধকারের মধ্যে গাছ-তলায় বসিয়া রহিল। ডাকাতেরা সকলেই মদ, মাংস খাইয়া আসিয়াছিল, তাই প্রথমে তাহারা ঘুমের ঘোরে ঢুলিতে লাগিল, তাহার পরেই গাছতলায় শুইয়া পড়িল। ভয়ানক ঘুমও যেন আজ তাহাদের পাইয়া বসিল। তাহারা সকলেই ঘুমাইতে লাগিল। তাহার পরে যখন ডাকাতদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন পূর্ব্বদিক ফর্শা হইতেছে, ভোরের পাখীর ডাক শুনা যাইতেছে, শীতল বাতাস গায়ে লাগিতেছে। ডাকাতেরা তৎক্ষণাৎ তাহাদের ঢাল, তলোয়ার লইয়া সরিয়া পড়িল। তাহার পরে নিজেদের আড্ডায় গিয়া, এক ডাকাত, আর এক ডাকাতকে গালাগালি দিয়া ঝগড়া করিতে লাগিল। একদল অপরদলকে কহিল—

"তোদের জন্যই ত ডাকাতিটা হাত থেকে ফস্‌কে গেল। তোরা জেগে না থেকে ঘুমিয়ে পড়লি কেন? এখন আয়, তোদের এক একটাকে ধরে ধরে মুণ্ডটা ছিঁড়ে ফেলি।"

গালাগালি খাইয়া অপর দল রুখিয়া দাঁড়াইল তাহারা কহিল—"তোরা কোন্ নবাব পুত্তুর? শুয়ে পড়লি কেন? শুয়ে পড়লি ত ঘুমে অজ্ঞান হয়ে গেলি কেন? এখন আবার আমাদের মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলবি? আয় ত কোন ব্যাটা আমাদের মুণ্ডু ছিঁড়বি, কাছে একবার আয় দেখি ; যমের দক্ষিণ দুয়ারটা কেমন, তা একবার দেখিয়ে দেব না?"

দলপতি হিরণ্য ডাকাত দেখিল, দলের মানুষগুলি খুনাখুনি করে মরিবে, তাই সে কহিল "যা হবার তা হয়েছে, কাল আমরা চণ্ডীর পূজা করিয়া আর একবার ডাকাতি করার জন্য প্রস্তুত হই। হিরণ্য ডাকাত আর এক রাত্রে ডাকাতি করিবার জন্য, বীরের মতন দলবল ও অস্ত্র লইয়া ঘরের বাহির হইল এবং নিত্যানন্দ যে বাড়ীতে

থাকেন, সেই বাড়ীর চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল। আজ ডাকাতদের প্রতিজ্ঞা, যেমন করিয়াই হউক, নিত্যানন্দের মাথা কাটিয়া মোহর ও গহনা লুটিয়া লইতেই হইবে। তাহাতে কোন ডাকাতেরও যদি মাথা যায় ত, যাইবে। আর মাথাই বা যাইবে কেন? এতবড় সাহস কাহার যে, তাহাদের সঙ্গে লড়াই করিবে?

হায়রে হায়! মানুষ ভাবে বা কি, হয় বা কি? ডাকাতেরা ত মহা আস্ফালন করিয়া নিত্যানন্দের বাড়ী ঘিরিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু সেই সময়েই আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া ভয়ঙ্কর ঝড় এবং বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চারিদিকে সারি সারি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব গাছ; ভীষণ শব্দে সেই সকল গাছের বড় বড় ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। ডাকাতেরা আর যায় কোথায়? একখানি ডাল মাথার উপরে পড়িলেই মাথাটি চূর্ণ হইয়া যাইবে। ডাকাতদের মনের ভিতরে কুসংস্কার যে কিছু কম ছিল, তাহাও নহে। হঠাৎ এই ঝড় বৃষ্টি দেখিয়া তাহাদের সকলেরই মনে খুব ভয় হইল। তাহারা ভাবিল, নিত্যানন্দের দেবতা সহায়, সেইজন্যই এই ঝড় আর বৃষ্টি। কাজেই ডাকাতেরা যে যেখানে পারে ছুটিয়া প্রাণরক্ষা করার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হিরণ্য ডাকাতের মন একেবারে বদলাইয়া গেল, সে আপনাকে শতবার ধিক্কার দিয়া অপরাধীর মতন নিত্যানন্দের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। নিত্যানন্দের অপূর্ব্ব মুখশ্রী দেখিয়া এবং তাঁহার উপদেশ শুনিয়া হিরণ্যর পাষাণ প্রাণ গলিয়া গেল। সে নিত্যানন্দের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

হিরণ্য ডাকাত নিত্যানন্দের ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, আর সে কখনই চুরি, ডাকাতি অথবা কোন রকম অন্যায় কাজ করিবে না, সে প্রত্যহ ঈশ্বরের নাম জপ করিবে এবং ধার্ম্মিক লোকের উপদেশ শুনিয়া চলিবে।

হিরণ্যর গায়ের জোর ও মনের বল দুই-ই খুব বেশী ছিল। সে ডাকাতি করিতে গিয়া মস্ত বড় ডাকাতের সর্দ্দার হইয়াছিল, এখন ধর্ম্মেকর্ম্মে মন দিয়া, ভাল কাজ করিয়া যথার্থই একজন মানুষের মতন মানুষ হইল। একদিন যে সকল মানুষ তাহাকে ঘৃণা করিত, এখন তাহারাই তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত

সিংহলী গল্প

(ফরাসী হইতে)

বুদ্ধিহীনা মাতা

সিংহলের একটা বড় গাঁয়ে এক গরীব রমণী বাস করত। তার বুদ্ধি একটু মোটা ছিল। তার সংসারে দশ বারো বছরের ছেলে ছাড়া আর কেহ ছিল না। ছেলেটীও ছিল বোকা। তবে সে মাকে খুব ভাল বাসত ও মার কথা সর্ব্বদাই শুনত। কখনো মার অমতে কোন কাজ করত না। এই স্ত্রীলোকটীর বাড়ীর সঙ্গেই মস্ত বাগান ছিল। তাতে যে সকল ফল ও তরকারী জন্মাত, তা বাজারে বেচে মা ও ছেলের খাওয়া পরা স্বচ্ছন্দে চলে যেতো। গ্রীষ্মকাল, রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। স্ত্রীলোকটী লোহার বাটওয়ালা কাটারি হাতে লয়ে বাগানে গেল। সেখানে শুকনো গাছপালা কেটে, রোদে ঘেমে ক্লান্ত হয়ে, তাড়াতাড়ি নারকেল পাতায় ছাওয়া কুটীরে ফিরে এল। তাড়াতাড়িতে ভুলে কাটারি খানা বাগানের মধ্যে রোদে ফেলে গেল। তারপর ভাত রেঁধে নিজে ও ছেলে দুজনে খেলো। খাওয়াদাওয়ার পর দা খানা ঘরে দেখতে না পেয়ে, কৃষকরমণী বাগানে কাটারির খোঁজ করতে গেল। ভাত রাঁধার জন্য বাগানের মধ্যে যেখানে বসে সে কাঠ কেটেছিল সেখানেই রোদে মাটীতে কাটারি খানা পড়ে ছিল। কাটারি খানা অনেকক্ষণ প্রখর রোদে পড়ে থেকে, আগুনের মত গরম হয়েছিল। স্ত্রীলোকটী যেই হাত দিয়ে কাটারি খানা তুলতে গেল, অমনি গরম লোহায় হাত লেগে, হাতের তলাটা পুড়ে গেল। রমণী তখুনি কাটারি খানা মাটিতে ফেলে দিয়ে, বলল, "আঃ দা খানার যে বিষমজ্বর হয়েছে! কি করা যায়?" সে বিলম্ব না করে গাঁয়ের মাতব্বরের সাথে পরামর্শ করতে গেল।

গাঁয়ের এই প্রধান লোকটী অতিশয় বুদ্ধিমান। সে বুড়ো, তার দাড়ি চুল পেকে গিয়েছে, তার মগজভরা বুদ্ধি ছিল; পাছে হঠাৎ মাথা হতে বুদ্ধি বেরিয়ে যায়, সেই ভয়ে নাকের ছেঁদা দুটীও কাণের গর্ত্ত দুটী তুলো দিয়ে বন্ধ করে রাখত। গাঁয়ের লোকেরা তাকে "বুদ্ধির ঢিপি" বলে ডাকতো। কৃষক রমণীর কাছে কাটারির জ্বরের বিস্তারিত বিবরণ শুনে, "বুদ্ধির ঢিপি" মাথাটাকে বেশ করে দুচারটা ঝাকানি দিয়ে, বুদ্ধিটাকে নেড়ে-চেড়ে নিয়ে বললে,

"বেশ! আমার কথা মন দিয়ে শোন। কলার পাতে কাটারি খানিকে জড়িয়ে ধরে, ঘরে নিয়ে এসো। পরে ঘরের ভিতর এক কোনে একটা গর্ত্ত করে, মাটি চাপা দিয়ে রেখে দাও। একদিন একরাত এই ভাবে রেখে দেবে। পরে মাটি খুঁড়ে ফেলে কাটারি খানাকে গর্ত্ত থেকে তুলবে। তখন দেখবে ওর জ্বর ছেড়ে গিয়েছে।"

স্ত্রীলোকটী মোড়লের পরামর্শ মত কাজ করতে রাজি হয়ে বাড়ীতে ফিরে এল। পরে গরম দা খানিকে ঘরে এনে "বুদ্ধিমানের" পরামর্শ মত, গর্ত্ত করে মাটি চাপা দিয়ে রেখে দিল।

পরদিন অতি সন্তর্পনে কাটারিখানি গর্ত্ত থেকে তুলে স্ত্রীলোকটী কাটারিতে হাত দিয়ে, অবাক

হয়ে, দেখতে পেলো যে কাটারি পাথরের শিলের মত ঠাণ্ডা, জ্বর একেবারে ছেড়ে গিয়েছে। মাতব্বরের পরামর্শে সুফল পাওয়াতে, তখন নিজের বাগান হতে এক কান্দি কলা, গোটা চার ডাব নারকেল, দুই তিনটা আনারস ল'য়ে কৃতজ্ঞ অন্তরে, "বুদ্ধির ঢিপি"কে সে উপহার দিতে গেল। এমন সুস্বাদ উপহারগুলি পেয়ে গাঁয়ের বুদ্ধিমান মোড়ল স্ত্রীলোকটীকে খুব আশীর্ব্বাদ করলো।

এই ঘটনার মাস খানেক পরে একদিন কৃষক রমণীর ছেলেটী বাজারে ফল বেচতে গিয়ে বৃষ্টিতে খুব ভিজে গেল। সেই রাতেই ছেলেটীর কাঁপুনি দিয়ে বিষম জ্বর এলো। গায়ের তাপ যেন ফুটে উঠলো। তখন সরল বুদ্ধি চাষী রমণী ভাবল "বুদ্ধি ঢিপী'র পূর্ব্বের উপদেশ মত কাজ করলেই শীগ্‌গীর ছেলের জ্বর ছেড়ে যাবে। ছেলেও মায়ের কথা মত কাজ করতে রাজি হলো। সেই রাত্রেই ঘরের মেজেতে গর্ত্ত খুঁড়ে রমণী ছেলেকে তার মধ্যে শুইয়ে দিল, পরে তাকে মাটি দিয়ে ঢাকলো। পরদিন সকালে মাটি ঠেলে ফেলে দিয়ে গর্ত্ত থেকে ছেলেকে বের করে, রমণী দেখতে পেল ছেলের গায়ে আর তাপ নাই। জ্বর ছেড়ে গেছে। কিন্তু ডাকলেও ছেলেটী কথা বলছে না, তার দেহ অসাড় হয়ে পড়ে রইল। প্রতিবেশীরা বললে, ছেলে মরে গেছে। তখন মা "হায় হায়, আমি কি করেছি, বলে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো" আর মনের দুঃখে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিল। এইরূপে কয়েকদিন অনাহারে থেকে, ছেলে ছেড়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব মনে করে, মাও মরে গেল। গাঁয়ের লোকেরা তখন মা ও ছেলেকে একসঙ্গে বাগানে কবর দিয়ে রাখলো।

চাষীর বুদ্ধি

(২)

সিংহল দ্বীপে রায়গাম কোরালে নামে একখানি ছোট গ্রাম। এই গাঁয়ের লোকেরা গরীব। কেহই লিখতে পড়তে জানে না, সকলেই ক্ষেত চাষ করে সংসার চালাত

একদিন সন্ধ্যাবেলা তারা দেখতে পেল গায়ের বাঁশ ঝোপের উপর দিয়ে, সারি সারি নারকেল গাছের ভিতর দিয়ে, থালার মত গোল রাঙ্গা চাঁদ উঠছে। সেদিনের চাঁদখানার রং আগুনের মত লাল। অন্য কোন রাতে চাঁদ ত এরূপ লাল হয় না। তখন গ্রামের চাষীরা তর্ক বিতর্ক করে স্থির করলে আজ চাঁদে নিশ্চয়ই আগুন লেগেছে। আর তাদের ভয়ও হলো। এখনি চাঁদের জলন্ত আগুনের কণা তাদের ক্ষেতের পাকাধানের উপর পড়বে, আর ক্ষেতে আগুন লাগবে। সকলে ভয়ে ভয়ে ভাবতে লাগলো এই উপস্থিত বিপদে কি করা যেতে পারে। তাড়াতাড়ি গাঁয়ের বুদ্ধিমান লোকদের বৈঠক বসলো। তারা ঠিক করলো সকলে মিলে চাঁদকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিতে হবে।

তখন গাঁয়ের বুড়োবুড়ী, যুবক-যুবতী, ছেলে-মেয়ে সকলে মিলে চীৎকার করতে করতে গাছের আড়ালে থেকে ঢিল ছুড়তে সুরু করলো। প্রায় আধ ঘণ্টা ঢিল ছোড়ার পর দেখা গেল চাঁদ অনেক দূরে আকাশে পালিয়ে গেছে। আর তার আগের রাঙা রংও বদলে গেছে।

তখন চাষীরা খুসী হ'য়ে বলতে লাগলো "আঃ বাঁচা গেল, চাঁদটা ঢিল খেয়ে পালালো, আর ভয়ে তার মুখের রং-ও বদলে গেল।"

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

তালপত্র সেপাই

এক ছিল সেপাই। তার নাম ছিল তালপত্র অর্থাৎ তালপাতা। নামটি যেমন তালপত্র দেখাতও তেমনি তাকে তালপাতার মত। সেই জন্য তার গ্রামবাসীরা তাকে তালপাতার সেপাই বলে ডাকত। বয়স তার বেশী নয়, বছর ২৫।৩০ এর মধ্যে হবে। কিন্তু এরি মধ্যে তার দাঁতগুলি সব পড়ে গিয়ে মুখটি তুবড়ে গেছে, পান খেতে গেলে পানের রস দু গাল দিয়ে বেয়ে পড়ে। দাড়ী গোঁফ তার একেবারে নিশ্চিহ্ন, মাথার প্রায় সর্ব্বত্র টাক পড়ে গেছে—যে কএক গাছি চুল আছে তাও আধ পাকা গোছের; আর সেই কএক গাছি চুল বিন্যাস করবার যত্ন ও পরিশ্রম দেখে কে। বাইরে বেরোতে গেলে তার একমাত্র সম্বল ছিল একখানি ঢিলে পায়জামা আর ঢিলোঢালা একখানি বহুদিনের পুরাতন শত ছিদ্র জীর্ণ হাটুর নীচে পর্য্যন্ত লম্বা চাপকান। চাপকানের উপর পাকান কোমরবন্ধটি, আর মাথার উপরে পাকান রং বেরং কাপড়ের শামলা গোচের একটা পাগড়ি পরা চাই। দুই কানে দুই সোনার মাকড়ি ঝুলছে। এখন তালপাতার সেপাই দেখতে কেমন ছিল, তার চেহারাই বা কেমন তা' তোমরা সকলেই বুঝতে পারছ।

সেপাইজির মা বাপ ছেলেবেলাতেই ইহলোক ছেড়ে গিয়েছেন। ঠাকুরমার কাছে তিনি মানুষ হয়েছেন। বুড়ী ঠাকুরমার কাছে আর কিছু উপদেশ পাক্ বা নাই পাক্ "রূপ কথা" বা উপকথা শোনবার তার যথেষ্ট অবসর হয়েছিল, সেই সমস্ত উপকথায় পক্ষীরাজ ঘোড়া অনেকটাই স্থান অধিকার করত। পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা শুনে শুনে তার মনে অনেকদিন অবধি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে উড়বার ইচ্ছা জেগে উঠেছিল। ঠাকুরমাকে সেই কথা বল্লে ঠাকুর মা তা হেঁসেই উড়িয়ে দিতেন। দেবতার কৃপায় একদিন কি জানি কেন ঠাকুরমার জীবন লীলা সহসা শেষ হইয়া গেল, সে ধুমধাম করে ঠাকুরমার শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করল।

কিছুকাল পরে তাহার সেই পূর্ব্বের বাসনা—পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে ঐ উড়বার ইচ্ছাটা হঠাৎ প্রবল হয়ে উঠিল। তখন সেই ইচ্ছাতে তাকে বাধা দেবার লোক কেহই ছিল না। মুস্কিল হ'ল পক্ষীরাজ ঘোড়া পাওয়া, সে পক্ষীরাজ ঘোড়ার জন্য একে বলে, ওকে বলে—গ্রামবাসীরা তাকে পাগল বোলেই ঠিক করল। এক জন পাড়া পরসীর একটা ঘিয়ে ভাজা অচল ঘোড়া ছিল, সে সাত লাঠীতেও একপা চলবার নাম করত না। সে মনে মনে ঠিক করল, এই পাগলকে ঘোড়াটা কোন রকমে গতিয়ে দিলে দু পয়সা লাভ ও হবে আর ঘোড়াকে খাওয়ানর দায় থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। সে তখন সেপাইয়ের কাছে গিয়ে বলল যে তার কাছে এক পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে, তার ঠাকুরদাদা আরব দেশ থেকে সেই ঘোড়া অনেক টাকা দিয়ে ও অনেক খরচ করে কিনে এনেছিলেন। কিন্তু এখন সে শুধু সেপাই সাহেবের খাতিরে, এমন বেশী কিছু নয়, মাত্র শত খানেক টাকায় সেই ঘোড়াটাকে বেচতে পারে। সেপাই সাহেবের কাছে, এ একশো

টাকা কিছুই নয়। তার এখন ওড়বার সাধ হয়েছে, কাজেই তার নিজের যা কিছু পুঁজি-পাটা ছিল তা সংগ্রহ করে আর তার উপর কিছু ধার খোর করে একশো টাকা দিয়ে সেই পক্ষীরাজ ঘোড়াটীকে চট করে কিনে ফেললে।

ঘোড়াটাকে আস্তাবল থেকে বের করে সেপাই বাড়ী মুখে নিয়ে চললো। তখন ঘোড়ার মালীকও সে বিষয়ে সাহায্য করলে। ঘোড়া ঠুকুস ঠুকুস করতে করতে খানিক দূর বেশ গেল। হঠাৎ সেপাই সাহেবের মনে ইচ্ছা হল যে ঘোড়ার উপর চড়ে সে বাড়ী ফেরে, যেমন ইচ্ছা, তেমনি কাজ। তালপত্র সেপাই পক্ষীরাজ ঘোড়ার উপর চড়লো।

পক্ষীরাজ আর চলেন না—অচল অটল হয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। সেপাইয়ের হাতে ছিল একটা লোহা বাঁধান লাঠি, যাকে বলে কোঁড়া। সেপাই সেই কোঁড়া দিয়ে ঘোড়ার পায়ে কষে একঘা মারলো, ঘোড়ার পা টী গেল একেবারে খোঁড়া হয়ে।

তখন কি করে—সেপাই ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বাজার থেকে কিছু নুন আনলো—এনে ঘোড়ার গোঁড়া পায়ে লাগিয়ে দিল। দিলে হবে কি—ঘোড়ার নড়া চড়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল তার পা ছোঁড়াও একবারে বন্ধ হয়ে গেল।

সেপাই বাহাদুর তখন তার পা দুটা নিকটবর্ত্তী গাছের গুড়িতে দড়ি দিয়ে বাঁধলো আর তার মুখের গোড়ায় এক ঝোড়া ঘাস দিয়ে রাখলো।

ঘাস দিচ্ছে এমন সময়ে ডোরা-ডোরা গায়ে দাগ এক ঢোড়াসাপ কোত্থেকে বেরিয়ে এল। সেপাই সব ফেলে তারি পিছনে করলো তাড়া। সাপকে ডেকে বলতে লাগলো—দাঁড়া, আমার এই ধড়া চুড়া দেখে তোর প্রাণে কি এতটুকু ভয় হচ্ছে না? এখনই আমি তোর মাথা ফাটিয়ে দেব।

সাপ তো নির্ভয়ে কোন দিকে যে চলে গেল সেপাই বাহাদুর তার খোঁজ পেল না। কিন্তু এ দিকে মহাব্যাপার। সামনে এক পাথর পড়েছিল, দৌড়াতে দৌড়াতে সে তা দেখতে পায় নি। হোঁচট খেয়ে ধপাস করে সে পড়ে গেল। তার পায়ে একটা তালের বড়ার মত পাকা ফোড়া ছিল। যেমন পড়ে গেল অমনি সেটা ফেটে গেল। ব্যাচারী তখন ব্যাথায় মরার মত হয়ে সেই ভাঙ্গা—পায়েই কোন রকমে ফিরে গিয়েই ঘোড়ার উপর উঠলো, ঘোড়ারও তখন ব্যাথাটা একটু কমেছে—সেও আস্তে আস্তে সেপাই সাহেবকে বাড়ীতে নিয়ে এল।

বাড়ীতে ফিরে এসে সেপাই আর করেন কি, ঘোড়া থেকে নেমে প্রথমেই কিছু সোরা সংগ্রহ করে সারা দিন রাত ধরে কাটা ঘায়ে লাগাতে লাগলো। দুচার দিন যেতে যেতে সেই ঘা টা যখন শুকিয়ে গেল, তখন সেপাই বাহাদুর মনে ভাবলো যে যথেষ্ট আক্কেল সেলামী দেওয়া হয়েছে। এই ভেবে সে ঘোড়াটীকে পুরানো মালিকের কাছে ফেরৎ দিতে নিয়ে গেল। সে আর নেবে কেন—বিনা পয়সাতে নিলেও ঘোড়াকে খেতে দেবার ত খরচ লাগবে? তখন সেপাই সাহেব কি করেন—ঘোড়াটীকে ফিরিয়ে এনে নিজের ঘরের কাছে একমাঠ ছিল, সেই মাঠে ছেড়ে দিয়ে নিস্তার পেলে।

ক্ষিতির কথাটি ফুরোল
দাদার প্রানটী জুড়োল।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিচিত্র সংবাদ

১। আফ্রিকার মধ্যে কঙ্গো দেশের লোকেরা হাতীর দাঁতের তৈরী রান্নার জিনিষ পত্তর ব্যবহার করে।

২। বালক জ্যোতির্ব্বিদ—পৃথিবীর একজন সব চেয়ে অল্প বয়স্ক জ্যোতির্বিদ হচ্চেন ফ্রান্সের লুই কুতেনো। তাঁর বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। তিনি "দিজোঁ" কলেজের ছাত্র। এই বুদ্ধিমান বালক একটি ছোট্ট মানচিত্র আর কিছু ছোটখাট জিনিষপত্র দিয়ে একটা যন্ত্র তৈরি করেছেন। তা দিয়ে ঋতুর পরিবর্ত্তন, অয়নান্ত বিন্দু, বছরের যে সময় দিন রাত্তির সমান থাকে—সূর্য্য আর পৃথিবীর মধ্যে সম্বন্ধ—সবই স্পষ্ট দেখা যায়। একটি বিজলি বাতি সূর্য্যের বদলে ব্যবহার করা হয়। আর তা দিয়ে মেরুর দীর্ঘ রাত—অক্ষানুযায়ী দিনের দৈর্ঘ্য—সূর্য্য কেমন করে বিভিন্ন জায়গায় আলো দেয়, সে সমস্ত বোঝা যায়।

কুতেনো এই যন্ত্রটি ফ্রান্সের "অ্যাষ্ট্রোনমিকাল সোসাইটিতে দিয়েচেন। তাঁরা তাঁকে প্রশংসা ক'রে এক চিঠি পাঠিয়েছেন।

৩। সব চেয়ে বড় শামুক—পৃথিবীর বৃহত্তম শামুক হ'ল আফ্রিকায়! নাইজিরিয়ার শামুকগুলি ত বেয়াড়া রকম দেখতে বড়। তারা লম্বায় ৬।৭ ইঞ্চি হয়, আর খেতেও ভারি সুস্বাদু। তাদের ডিম হয় পায়রার ডিমের মতো, আর উপরের খোলা হয় বেজায় শক্ত।

৪। শব্দকারী মৎস্য—আমেরিকার অন্তর্গত কালিফোর্ণিয়ার তীরে এক রকম মাছ দেখা গেছে, তারা চিৎকার করতে পারে। যখন তারা সমুদ্রে বেড়ায় তখন তাদের শরীর হ'তে এক রকম আলো বেরোয়। সাগরের অন্যান্য মাছ এই আলো দেখে তার পথ থেকে ভয়ে সরে যায়।

৫। ভবিষ্যতের আবিষ্কার—

ভবিষ্যতে কত যে নতুন আবিষ্কার হবে কে জানে?

মিঃ রজার ববসন (Mr Roger Bobson) বলেন, যে ভবিষ্যতে সব চেয়ে বেশী সুবিধা হবে আকাশ ভ্রমণের। খরচও এখনকার মত এত বেশী হবে না।

আরো মজা। বাড়ী হবে রবারের। আর তাদের গরম কিংবা ঠাণ্ডা করবার জন্য এক রকম পাউডার ব্যবহার হবে সে পাউডার আসবে সূর্য্যের আলো থেকে, সাগরের জল থেকেও হয় ত বা। পৃথিবীর ভেতরেও এরকম পাউডার পাওয়া যাবে।

কাঠের শাস দিয়ে কাপড় তৈরি হবে। তুলোর আর দরকার হ'বে না।

এখন এমন কাচ বেরিয়েচে যা বাঁকানো যায় অথচ ভাঙেনা। ভবিষ্যতে এর ব্যবহার আরো আরো বেশি হ'বে।

বড়ো বড়ো সহরে দোতালা রাস্তা হবে। উপরে যাবে মটর কার নীচে অন্য গাড়ী সব। কাজেই বোঝা যাচ্চে অনেক কিছু আবিষ্কার ভবিষ্যতে করার আছে।

কুড়ি বছরের পুরান ডিম

কুড়ি বছরের পুরান ডিম খেতে কে চায় বলত! তোমরা শুনে অবাক হবে যে চীন দেশের লোকরা এত বছরের ডিম খেতে খুব ভালবাসে। তারা এরকম ডিমকে পাকা ডিম বলে। ২০ বছর পর্য্যন্ত ডিমকে কি করে ওরা পচন থেকে বাঁচায়, শুনবে? প্রথমে তারা ডিমের চারিধারে কাল মাটির লেপ দেয়। অনেক বছর পরে যখন সেই কাল মাটির লেপ ধুয়ে ফেলে দেয়, তখন দেখা যায় যে ডিমের ভিতরটা সবটাই একেবারে বরফের মত সাদা হয়ে গেছে। চীনে কোন কোন দেশে ডিমের চারি ধারে ধূসর ও সাদা রং মিশ্রিত এক রকম মাটি দিয়ে লেপে দেওয়া হয়, অনেক বছর পরে গায়ের মাটি পরিষ্কার করে ডিম ভেঙ্গে দেখা যায় যে ডিমের সাদা অংশটা চকচকে কাল হয়ে গেছে।

খেয়ালী হ্রদ।

ইটালীর রাজধানী রোমের উত্তরে একটা ছোট্ট হ্রদ আছে, সেখানে অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে দেখা যায়! এ হ্রদটা একটা নিবন্ত আগ্নেয়গিরির গহ্বরের মধ্যে অবস্থিত। কয়েক বৎসর আগে একদিন হঠাৎ এর জল সব শুকিয়ে গেল। কয়েক মাস আগে আবার হ্রদটী জলে পূর্ণ হয়েছে। সম্প্রতি ভিসুভিয়াস (আগ্নেয়গিরি) জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সেজন্য ঐ হ্রদের জল টগ বগ করে ফুটছে, জল থেকে বাষ্প উঠছে আর জলের রং বদলে যাচ্ছে, আর হ্রদের মধ্যে থেকে গুড় গুড় শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সম্প্রতি একদিন সকালে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য লোক ঐ হ্রদটীর অবস্থা দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁদের সামনেই হঠাৎ খুব তাড়াতাড়ি হ্রদের জল কমে গেল আর হ্রদের তলায় যে গুহা ও গর্ত্ত আছে সেগুলি দেখা গেল। তার এক ঘণ্টা পরে আবার হ্রদটী জলে পূর্ণ হল। কাজেই কেহ বলতে পারেন না যে পর মুহূর্ত্তে এই হ্রদটির কি পরিবর্ত্তন হবে।

বৃষ্টির খেয়াল

যখন ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি থেকে আগুন ইত্যাদি উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল তখন একদিন খুব জোরে বৃষ্টি হয়। আর সে বৃষ্টি শুধু কালীর বৃষ্টি। সেই পর্ব্বতের নিকটে যাঁরা বাস করেন তাঁরা বৃষ্টিতে জল না পড়ে শুধু কালীর বর্ষন হচ্ছে দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

দুই এক বছর আগে স্পেন দেশে এক যায়-গায় খুব আমোদ ও খেলা হচ্ছিল। সে আমোদ ও খেলা দেখতে অনেক লোক সমাগম হয়েছিল। হঠাৎ সে সময়ে ভীষণ ঝড় এল আর দেখা গেল যে দর্শকদের পোষাক কালো রঙে রঞ্জিত হয়ে গেছে।

একবার আয়ারল্যাণ্ডে এক পাড়াগাঁয়ে রক্তের মত লাল রঙের বৃষ্টি হয়েছিল। গাঁয়ের লোকেরা তা দেখে খুব ভয় পেল যে হয়ত তাদের শীঘ্রই কোন রকম বিপদ হবে তারই সূচনা।

তাদের কত রকমে বোঝাতে চেষ্টা করা গেল কিন্তু তারা কিছুতেই বুঝতে পারল না যে ওগুলি জলের বীজাণু বাতাসের সঙ্গে উড়ে এসেছিল, আর সেগুলি বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে আবার পড়ে গেল।

কয়েক বছর আগে স্কটল্যাণ্ডের উত্তর তীরের লোকরা অবাক হয়ে দেখল, যে বৃষ্টির সঙ্গে জীবন্ত মাছ আকাশ থেকে পড়ছে।

ধাঁধা

১। তিন বন্ধু মিলে মোর গৌবব বাড়ায়,
গন্ধ দ্রব্য সঙ্গে মিলে মান বেড়ে যায়।
করে করে চালাইয়া মুখে তুলে দেয়,
সৈন্যগণে যুদ্ধ করে অন্দরে পাঠায়।
ফল নাই ফুল নাই, বার মাস ধরি,
কিবা আমি জান যদি বল ঠিক করি।
শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী দত্ত প্রেরিত।

২। গাছ পালায় ভরা এমন একটা যায়গার
নাম কর, যার পেট কাটলে পানীয় হয়।

ফাল্গুন মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। বাড়ীর সীমান্তে থাকি নাম মোর সেজা,
কোন দেশে বলে থাকে নাম নেড়া সেজা,
কণ্টক আবৃত দেহ পাতা নাহি মোর
দুগ্ধপ্রায় রস ধরি দেহের ভিতর।
—মনসা—সেজা—
শ্রীবিন্ধ্যাবাসিনী দত্ত।

২। বেগুন।

নিম্নলিখিত গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন—

শ্রীমতী উমারাণী দেবী, বর্ম্মা, শ্রীবলাই, কানাই, বীণা, কালিদাস, রাণী, নারু, বিবি, অঞ্জু, রেণু, বেনু, যোগেন, বর্ম্মা, কুমারী কমলা দাস, ডিব্রুগড়, কুমারী রেণুকা মিত্র, নিমতা, শ্রীমান গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল বিষ্ণুপুর। রেণুকা, দুলু, পানু, দাশু, মাখন, যতীশ, গীতা মণ্টু, শম্ভু। বর্ম্মা। শ্রীসঞ্জীব মুখার্জ্জি, লক্ষ্ণৌ।

গ্রাহক গ্রাহিকাগণের প্রেরিত অনেক ধাঁধাতে উত্তর থাকে না। কাজেই সেগুলি ছাপান হয় না। মাসের ২৫শে তারিখের মধ্যে ধাঁধার উত্তর না পাইলে, তাহা ছাপাইতে অসুবিধা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী বৈশাখ মাসে "মুকুলের চতুর্থ বৎসর (নব পর্য্যায়ে) আরম্ভ হইবে। বাঙ্গলা দেশে মুকুলই ছেলেমেয়েদের প্রাচীনতম মাসিক, ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এই কাগজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

নূতন বৎসরে সুন্দর সুন্দর চিত্রসহ গল্প ও প্রবন্ধ লেখার বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী প্রতিমাসে একটী ধারাবাহিক নূতন গল্প লিখিবেন। প্রতিমাসেই ছেলেমেয়েদের উপযোগী বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ থাকিবে। অনেক প্রসিদ্ধ নূতন লেখক ও লেখিকা আগামী বৎসরের মুকুলে লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

আরো কথা, আগামী বৎসরে গ্রাহক গ্রাহিকাদের লিখিত গল্প ও কবিতা প্রভৃতি নিয়মিতরূপে প্রতি মাসেই প্রকাশিত হইবে। এবৎসর স্থানাভাবে বালক বালিকা-গণের লেখা দেওয়ার সুবিধা হয় নাই। আশা করি, পুরাতন ও নূতন গ্রাহক গ্রাহিকাগণ আগামী বৎসরে আরো বেশী লেখা পাঠাইবেন ও বন্ধু বান্ধবদিগকে লিখিতে উৎসাহিত করিবেন।

মুকুলের গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১৩৩৮ সনের মুকুলের বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মনিঅর্ডার যোগে চৈত্রমাস মধ্যেই নীচের ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ভিপিতে মুকুলের মূল্য দুই টাকা চারি আনা লাগিবে। কাজেই মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইলে গ্রাহকের খরচ কম পড়িবে।

আগামী ৭ই বৈশাখ তারিখের মধ্যে যে সকল গ্রাহক গ্রাহিকার প্রেরিত মূল্য আমাদের হাতে না পহুঁছিবে তাহাদের নামে বৈশাখের "মুকুল" ভিপিতে পাঠান হইবে। যাঁহারা আগামী বৎসরে "মুকুল" রাখিতে চাহেন না তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক চৈত্রমাস মধ্যেই আমাদিগকে পত্র লিখিয়া জানাইবেন। নতুবা পরে ভি পি ফেরত দিয়া আমাদিগকে বৃথা ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। ৭ই বৈশাখের মধ্যে নিষেধ সূচক পত্র কিম্বা মুকুলের বার্ষিক মূল্য না পাইলে, আমরা বৈশাখের "মুকুল" ভিপি ডাকে পাঠাইব।

টাকা ও পত্রাদি নীচের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

মুকুল কার্য্যাধ্যক্ষ
২৯৪ দর্গারোড
পার্ক সার্কাস পোঃ, কলিকাতা।

প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।